
বিশ্ববাণীর নিয়মাবলী

গ্রাহকগণের জন্য :—

১। "বিশ্ববাণীর" ফাল্গুনে বর্ষারম্ভ হয়। বৎসরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

২। বিশ্ববাণীর বার্ষিক মূল্য ২॥০ ; ছয় মাসের জন্য ১।০, প্রতি সংখ্যা ।০, চার আনার ডাকটিকিট পাঠাইলে নমুনা সংখ্যা পাঠান হইয়া থাকে। ব্রহ্মদেশে বার্ষিক মূল্য ২৸০, ষাণ্মাসিক ১।৶০, প্রতি সংখ্যা ।১০।

৩। গ্রাহকগণের ঠিকানা অল্পদিনের জন্য পরিবর্ত্তিত হইলে স্থানীয় ডাকঘরে নির্দ্দেশ দিবেন, বেশী দিনের জন্য হইলে বাঙ্গালা মাসের ১০ তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে।

৪। কোন কিছু জানিতে হইলে গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া সর্ব্বদা রিপ্লাই কার্ডে অথবা টিকিটসহ পত্র দিতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের হার পত্র লিখিয়া জানিতে পারেন। টাকাকড়ি চিঠি-পত্র ও প্রবন্ধাদি

বিশ্ববাণী, কার্য্যাধ্যক্ষের নামে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ—**স্বামী শঙ্করানন্দ** ১নং বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশ্ববাণী

৩য় বর্ষ } ফাল্গুন ১৩৪১ { ১ম সংখ্যা

প্রারম্ভে

অন্তরের নিগূঢ় প্রেরণায় নিখিল বিশ্বের ব্যথা ও গ্লানিকে সমবেদনার স্নিগ্ধালো বরণ করার সাধনা যাঁদের সফলতার শুভ্রালোকে ভাস্বর, আজ বিশ্ববাণীর তৃতীয় বর্ষের পুণ্যাহে, সকল দেশের, সকল যুগের সেই মহামানবদের পুণ্যস্মৃতি আমরা শ্রদ্ধার তীর্থবারিতে অভিষিক্ত করি। আজ আমাদের বন্দনা করুক স্পর্শ তাঁদের অন্তর, যাঁদের মহামিলনের আহ্বানে সুপরিস্ফুট মিলন ও মৈত্রীর পথ।

ক্ষুদ্রতার সীমারেখার পারে বৃহৎ পরিব্যাপ্তির মাঝে আপনাকে সম্যকভাবে জানাই ভারতের উচ্চতম আধ্যাত্মিক আদর্শ। অপার সাগরের তীর হতে অজানা সাগরের পারে তীর্থযাত্রার বহুল বিচিত্র অবদানই পরিয়েছে তার ললাটে দীপ্তোজ্জ্বল রাজটীকা, দিয়েছে তাকে আকুল প্রেরণা শাশ্বতের সন্ধানে পথচারী হবার, জাগিয়েছে তার অন্তরের অন্তরে অনন্ত জ্যোতির আদি নির্ঝর। তাই সে কাতর, অকারণ করুণায় নিখিল বিশ্বের বেদনায়।

এই বেদনায় সে হয়ে আছে চির উদাসীন। কত সাম্রাজ্যের উত্থান হলো, কত সাম্রাজ্য গেল বিস্মৃতির অতলে, ভারতের বাণী যুগে যুগে কালে কালে নটরাজের নূপুর তালে তালে চলেছে বেজে। কবে কোন ছায়াময় অতীতে রবিকরোজ্জ্বল এক প্রভাতে বা ধূসর সন্ধ্যায় মন্ত্রদ্রষ্টা উচ্চারিত 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি' আজও তার দ্যোতনায় অসীম এককের এই বারতা, যা মনকে আকুল করে, নিয়ে যায় সকল চিন্তার পারে, - দেশে দেশে ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত প্রাগৈতিহাসিক যুগ হতে আজ অবধি। এ বাণীর বাহন ছিলেন যাঁরা, ক্ষুদ্রকে মহানে, বদ্ধকে বিমুক্তে, স্বার্থকে পরার্থে পরিণত করার প্রয়াসে ব্রতী ছিল তাঁদের সমুজ্জ্বল।

আজ হতে শতবর্ষ পরে সমসাময়িক ঐতিহাসিকের লেখনীমুখে মুক্ত যে দিন হবে

স্মৃতিব ভারতীয় সন্ন্যাসীদের পাশ্চাত্য অভিযান, তখন হয়ত সে দিনের মানব নির্দ্ধারণ করবে তাঁদের যোগ্য আসন। আজ যেমন আমরা রচনা করি সেই সব বৌদ্ধ শ্রমণদের আসন, যাঁরা বহন করেছিলেন শ্রীবুদ্ধের বাণী অপরান্তে, যবনবিষয়ে, সুবর্ণভূমিতে তাম্রপর্ণীতে। আজ আমরা উৎসুক তথ্য সংগ্রহে যবন ধর্ম্মরক্ষিত স্থবিরের, মহারক্ষিত স্থবিরের, মধ্যম স্থবিরের, শোন ও উত্তর স্থবিরের, মহেন্দ্র স্থবিরের। এমনই একদিন আসবে ভবিষ্যৎ যুগ—যেদিন ব্যাকুল আগ্রহে জানতে চাইবে শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাস্থল কোথায়, বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ কেমন ক'রে নীত করেছিলেন প্রাচীর অধ্যাত্ম সম্পদ কোন দেশে, কোন সময়ে।

যাঁর অলৌকিক প্রজ্ঞা, অমিত তেজ, সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি, গভীর দেশপ্রেম, উদার আত্মীয়তা, তাঁর সমস্ত প্রচার প্রচেষ্টাকে দিয়েছে এক কল্যাণময় রূপ, যাঁর সমগ্র রচনার মাঝে পাওয়া যায় অসীম সংযম, বিরাট সংস্কৃতি, অতলস্পর্শী অন্তর্দৃষ্টি—আজ হারিয়েছে ভারত, শ্রীরামকৃষ্ণের উদাত্ত বাণীর আবাহনে প্রবুদ্ধ-আত্ম-প্রত্যয় ভারত, তার প্রীতি, তার শান্তি, তার সংস্কৃতি তার ধর্ম্ম, তার কর্ম্ম; তার দর্শন, তার অপার অনুভূতির সেই মহান প্রতিনিধিকে সেই বরেণ্য আচার্য্য অভেদানন্দকে। যাঁর আশীসের আলোকে হয়েছিল আলোকময় বিশ্ববাণীর পুনর্যাত্রা। যাঁর "মনিবে দেবত্বের' আশার বাণী, 'আত্মজ্ঞানের' সুনিবিড় রহস্য, 'অনুভূতি পথের' বিচিত্র বারতা, পুনর্জ্জন্মবাদের বৈজ্ঞানিক কাহিনী চিন্তারাজ্যের অভিনব সম্পদ, এ সম্পদের অধিকারী তাঁর দেশবাসী সকলেই। কোন সম্প্রদায় বিশেষে তা আবদ্ধ নয়। বিশ্ববাণীর প্রধান ও প্রথম উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক অনুভূতি সমুজ্জ্বল এই অসাম্প্রদায়িক ও সার্ব্বজনীন বাণী দ্বারে দ্বারে বহন করা। বিশ্ববাণীর চরম লক্ষ্যের পরম সার্থকতা এইখানেই। আজ দেশবাসীকে আমাদের সশ্রদ্ধ নিবেদন :—

"সমাশ্চ : সব্রতা ভূত্বা বাচং বদতু ভদ্রয়া।"

আর ডেকার্ট

শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম্ এ, বি এল

সূচনা

আর ডেকার্ট আধুনিক ইয়োরোপীয় দর্শনের জন্মদাতা, অনেকের মতে তিনি আধুনিক ইয়োরোপীয় অঙ্কশাস্ত্রেরও জন্মদান করেন, এবং মনীষী নিউটনের প্রাথমিক জীবনে তাঁহার রচিত জ্যামিতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এতদ্ভিন্ন পদার্থ বিজ্ঞানেও তাঁহার দান নিতান্ত সামান্য নহে।

১৫৯৬ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে তারিখে তিনি টুরেইনের অন্তর্গত লাহায়ে নামক স্থানে ১৬০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬১২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি আঞ্জুর জেস্যুইটদিগের বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। তৎপরে তিনি প্যারিসে অঙ্কশাস্ত্রের গবেষণায় কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিলেন। ১৬১৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি স্বেচ্ছাসৈনিকরূপে কার্য করেন। এই সময় তিনি বোহেমিয়ার রাজার বিরুদ্ধে প্রাগের যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদলের মধ্যে ছিলেন। পরবর্তী কয়েক বৎসর তিনি ভ্রমণে নিরত থাকেন, ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি পূর্ববর্তী প্রতিজ্ঞারক্ষার্থ লরেটো গমন করেন। ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি লা রোশের অবরোধে যোগদান করেন, ১৬২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ২০ বৎসর তিনি তাঁহার দার্শনিক মতবাদের বিবৃতি সাধন ও স্বীয় পুস্তকাবলী রচনা লইয়া নেদারল্যাণ্ডে বাস করেন। শেষ বয়সে তিনি সুইডেনের রাণীর আহ্বানে ষ্টকহলম্ যাত্রা করেন। সেখানে তিনি রাণীকে শিক্ষাদান করিতেন এবং একটি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার জন্য অনুরুদ্ধ হন। কিন্তু উক্ত স্থানের জলবায়ু তাঁহার শরীরে ঠিক সহ্য হইল না, ফলে ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী সর্বতোমুখী প্রতিভার আধার মহামতি ডেকার্ট পরলোক গমন করেন।

অঙ্কশাস্ত্রে কৃতিত্ব

অঙ্কশাস্ত্রে ডেকার্টের প্রধান কৃতিত্ব বিশ্লেষাত্মক জ্যামিতির প্রতিষ্ঠায়, ইহা নির্দিষ্ট রেখা হইতে প্রত্যেক বিন্দুর দূরত্ব নির্ণয় করিয়া তাহাদের গাণিতিক বিকাশে স্থানীয় সম্পর্ক হ্রাস করে। এতদ্ভিন্ন তিনি বীজগণিতের সমীকরণ দ্বারা জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞা পূরণ করেন।

পদার্থ বিদ্যায় অবদান

পদার্থবিদ্যায় ডেকার্টের অবদান—রামধনুর বর্ণচ্ছটার ব্যাখ্যা, আলোক বিকিরণ ও বাতাসের ওজন নির্ণয়- বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। তাঁহার ধারণা যে জড় পদার্থ চাপের দ্বারা পরিচালিত হয়—পরন্তু অভ্যন্তরীণ শক্তি প্রভাবে নহে—নিউটনের মধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কারে ভ্রমাত্মক বলিয়া পরিগণিত হয়। অথচ তাঁহার আলোক ও গ্রহগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধীয় মতবাদে অনেক সত্যের আভাস পাওয়া যায়, যাহা নিউটন এবং তাঁহার শিষ্যবর্গ প্রকৃতপক্ষে উপেক্ষা করিয়াছেন।

দার্শনিক মতবাদ

ডেকার্টের দার্শনিক মতবাদ আলোচনার পূর্বে, তিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন; সেই কাল সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন। ডেকার্টের আবির্ভাবের পূর্বে দর্শন

মধ্যযুগের ধর্মগুরুগণের মতবাদ ও অ্যারেষ্টটলের 'মতবাদের' উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিত; ধর্মগুরুর বিরুদ্ধে কোনরূপ ধারণা পোষণ করা বা স্বাধীনভাবে চিন্তার আশ্রয়-গ্রহণ করতঃ কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সাহস কাহারো হইত না; প্রকৃতপক্ষে ডেকার্টের মতবাদ ধর্মগুরুভয় ও অ্যারেষ্টটলের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দর্শনকে সম্পূর্ণ নূতন ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে।

ডেকার্টের পূর্বেও দুই একজন মনীষী অনুরূপ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে লর্ড বেকনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তিনি প্রথম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনকে পৃথক করিবার চেষ্টা করেন। তিনি বলিলেন—"ধর্মসম্বন্ধীয় মতবিরোধ বিশেষ অনিষ্টকর, ধর্মকে কেহ স্পর্শ করিবে না; সঙ্গে সঙ্গে ধর্মও যেন ইহার সহিত মিশ্রিত না থাকে; বিজ্ঞানের সহিত ধর্মের মিশ্রণই অবিশ্বাসজনক। সম্পূর্ণরূপে সংস্কারমুক্ত হইবে, যাহাতে মানসিক মুকুরে বস্তুনিচয়ের প্রকৃতস্বরূপ বিম্বিত হয়, অভিজ্ঞতা হইতেই তাহার উৎপত্তি, নানা জ্ঞানরাজ্য জয়ে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারাই পরিচালিত হইবে, তথা হইতে আরোহণ প্রণালীর সমবায়ে বিস্তৃত উচ্চতর সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে।" এইরূপে কেবল অভিজ্ঞতাবাদের বীজ বপন করেন। পরবর্তীকালে অনেক মনীষী অভিজ্ঞতাবাদের বিস্তৃতি সাধন করেন, তাঁহাদের মতবাদ পরে আলোচিত হইবে।

অন্য একদল দার্শনিক মনে করেন যে, দার্শনিক সিদ্ধান্ত সমূহকে অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা চলে না, মানুষের মন চিন্তাপ্রভাবে অভিজ্ঞতার অতীত তীরে বিচরণ করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও মানবাত্মার অমরত্ব সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ, অথচ তাহা অভিজ্ঞতার অভ্যন্তর প্রদেশে কোনদিনই মিলেনা। মহামতি ডেকার্ট এই মতেরই প্রধান পৃষ্ঠপোষক, তবে তিনি স্বীয় দার্শনিক মতবাদের প্রাথমিক অবস্থায় সংশয়বাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সংশয়বাদ প্রধানতঃ বিশ্বব্যাপী অবিশ্বাসের ছায়া প্রসারিত করে। সংশয়বাদী মনে করেন, অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যাহার স্থিতি, তাহার সম্পর্কে সন্দেহ বা সংশয় পোষণ করাই সমীচীন, ডেকার্টও প্রথমে এই মতবাদের প্রয়োগ করেন।

ডেকার্ট অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বিধায় দর্শনেও অঙ্কশাস্ত্রের বিধি প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হন। ইহাতে তিনি দেখিলেন, বিভিন্ন জাতির ধর্ম সম্বন্ধীয় ধারণা ও আচার ব্যবহারের তুলনা করিলে অঙ্কশাস্ত্রের নিশ্চয়তা কোথাও মেলে না, অথচ তাঁহার বিশ্বাস হইল, দর্শনে অঙ্কশাস্ত্রের মত নিশ্চয়তা লাভ করিতে না পারিলে প্রকৃত সত্য বলিয়া কিছুকেই গ্রহণ করা চলে না। সুতরাং তিনি পূর্ববর্তী সমস্ত সিদ্ধান্তকেই সন্দেহ করিতে থাকেন এবং স্বীয় অবিমিশ্র চিন্তার সাহায্যে সত্যতত্ত্ব নির্ণয়ে আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—এমন একটা কিছু চাই যে, বিশ্বসংসারকে সন্দেহ করিলেও যাহাকে সন্দেহ করা চলে না, তাহা কি? তিনি ভাবিলেন—

তাহা সন্দেহ নিজে? সমগ্র জগতের অস্তিত্ব সন্দেহ করা চলে, কিন্তু সন্দেহকে সন্দেহ করা চলে না; কিন্তু সন্দেহ করে কে?—মানুষের চিন্তা. চিন্তা করে কে?—আমি। সুতরাং যেহেতু আমি চিন্তা করি, সেই হেতু আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে না—আমার অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ। ইহাই ডেকার্টের প্রধান উক্তি—Cogito, ergo sum? এই ভাবে তিনি সংশয়বাদের মধ্যে নিঃসংশয়বাদের ভিত্তি স্থাপন করেন।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার যুক্তি নিম্নরূপ :—"আমার মধ্যে ঈশ্বরের ধারণা বর্তমান, কিন্তু এই ধারণার কর্তা আমি নিজে নহি, যেহেতু ইহাতে যে পরিমাণ সাধারণের প্রয়োজন, আমার মধ্যে তাহা নাই; সুতরাং ইহাই সিদ্ধান্ত যে, ঈশ্বর নিজেই ইহার কর্তা, তিনিও নিজেই এই ধারণা আমার মনের মধ্যে নিহিত করিয়াছেন। শিল্পী যেমন স্বীয় বস্তুর উপর স্বকীয় চিহ্ন অঙ্কিত করে, তিনিও ধারণা দ্বারা আমার মনে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন।

"কিন্তু, ঈশ্বরের ধারণাই ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ। কারণ ঈশ্বরের স্বরূপটা নিত্য সত্তা। তাঁহার গুণ সম্বন্ধে বলা চলে যে, তিনি সত্যস্বরূপ, সুতরাং তিনি আমাকে প্রতারিত করিতে পারেন না; ফলে আমি নিজেও যাহা স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করি, তাহাও নিশ্চয় সত্য। মিথ্যার উৎপত্তি আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার অপব্যবহারেই ঘটে। কারণ আমরা স্পষ্টরূপে ধারণা করিতে পারি না, তাহার সম্বন্ধেও সিদ্ধান্ত করিয়া বসি। আমাদের অকাল-বিচার দ্বারাই মিথ্যার আবরণ বিস্তৃতি লাভ করে।"

শরীর ও মন—এই দুইটি তাঁহার মতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু। একটির সহিত অন্যটির কোন সম্বন্ধ নাই, শরীরের গুণ বিস্তৃতি; মনের গুণ চিন্তা। বাস্তবতঃ চিন্তার সঙ্গে বিস্তৃতির কোনরূপ আদান প্রদান থাকা সম্ভব নহে! চিন্তা ও বিস্তৃতি উভয়েই সত্য। তিনি বলেন "আমি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি—আমার আত্মা চিন্তাশীল, পক্ষান্তরে উহাকে বিস্তৃত বলিয়া বুঝিবার কোন প্রয়োজন হয় না. চিন্তার সঙ্গে "বিস্তৃতি" গুণ সংশ্লিষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। পক্ষান্তরে প্রত্যেক বস্তুই দেশ বা স্থানের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে অঙ্কশাস্ত্রের সহায়তায় উহা পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যায়। দ্বিতীয়তঃ অনুভূতি দ্বারাও বহির্জগতের বস্তুনিচয়ের জ্ঞান লাভ হয় এবং অনুভূতি বহির্জগতের বস্তুনিচয়ের উপর নির্ভর করে। আকার, গতি প্রভৃতি বিস্তৃতির বিভিন্ন রূপ, এবং তাহারা বহির্জগতের বস্তুনিচয় মধ্যে গুণরূপে বিদ্যমান, কিন্তু বর্ণ, স্পর্শ, উত্তাপ প্রভৃতি চিন্তা প্রায় আত্মাতেই বিদ্যমান, বহির্জগতে উহাদের অস্তিত্ব নাই। কিন্তু আত্মা ও শরীর তাহাতে সংশ্লিষ্ট তিনি অন্যের উপর ক্রিয়াশীল। শারীরিক ক্রিয়া চিন্তার জনক এবং চিন্তা শারীরিক শক্তি উৎপন্ন করে।" ইহা কিরূপ সম্ভব? এই সম্বন্ধে ডেকার্ট

বলিতেছেন—"মস্তিষ্কে Pineal gland নামক পদার্থের ভিতরে পরস্পর সংশ্লিষ্ট; এইখানে ঈশ্বরের মধ্যস্থতায় শারীরিক ক্রিয়া বিস্তার হয় চিন্তা সাধারণ গতিতে রূপান্তর লাভ করে।

অবশ্য ডেকার্টের এই মতবাদ ঠিক সমর্থন করা চলে না; কারণ উহাতে ঈশ্বরের প্রকাব শক্তি সামান্য আকার ধারণ করে। ডেকার্টের প্রধান দোষ—তিনি আত্মা ও শরীরকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই হেতু ঈশ্বরের সহায়তা গ্রহণ অবশ্যম্ভাবী রূপে প্রতীত হইয়াছে।

ডেকার্টের শিষ্য গেলেংকস্ (Geulinx) সাময়িকবাদের প্রবর্তন করিয়া বলেন যে, ঈশ্বরের আবির্ভাব সব সময় হয় না। যখন কোন চিন্তাকে শারীরিক ক্রিয়ায় পরিবর্তিত করা দরকার অথবা শারীরিক ক্রিয়াকে বিস্তারে রূপান্তরিত করা প্রয়োজন, তখন ঈশ্বর তাহা সংসাধিত করেন।

অন্যতম শিষ্য 'মালব্রাঞ্চ' রহস্যবাদের আশ্রয় গ্রহণ করতঃ বলেন যে, আমরা যাহা কিছু দেখি সবই ঈশ্বরের মধ্যে সংসাধিত হয়; সুতরাং Pineal gland এ ঈশ্বরের আবির্ভাবের কোন প্রয়োজন নাই। এইরূপে বলা যায়; ডেকার্টের দ্বৈতবাদ মালব্রাঞ্চের হাতে অদ্বৈতবাদের দিকে অগ্রগতি লাভ করিল।

ডেকার্টের মতবাদের অন্য একটি দোষ এই যে, তিনি সুস্পষ্ট জ্ঞানকে সত্যের স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে তিনি সন্দেহবাদকে আমল দেন নাই। যে নির্মল নীলবর্ণ আকাশকে আমরা খালি চোখে দেখিয়া যে সুস্পষ্ট জ্ঞানলাভ করি, তাহা যে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ধারণ করিয়া ভ্রান্ত ধারণায় পর্যবসিত করিতে পারে সেইরূপে চিন্তার কাঠামও অনুরূপভাবে সীমাবদ্ধ।

তারপর তিনি ঈশ্বরের সত্যস্বরূপের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নির্ণয় করিয়াছেন, ইহাও দোষাবহ; যেমন যদি ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ এমন জ্ঞানের উপর নির্ভর করে, যে জ্ঞান ঈশ্বরের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল তবে এই যুক্তির অন্তহীন চক্রাকারে পরিভ্রমণ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

দার্শনিক প্রণালী

ডেকার্ট দার্শনিক গবেষণায় কিভাবে অগ্রসর হইতে হইবে তাহার একটা প্রণালী নির্ণয় করিয়াছেন, তিনি বলেন—(১) কোন বিষয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে সন্দেহহীন জ্ঞানলাভ করিবার পূর্বে তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে না। (২) প্রত্যেক কঠিন সমস্যাকে যথাসময়ে প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত করিয়া চিন্তায় প্রবৃত্ত হইবে। (৩) চিন্তাধারাকে ক্রমশঃ সরল হইতে জটিলের দিকে পরিচালিত করিবে এবং যেখানে বিষয়টির আলোচনায়

স্বাভাবিক শৃঙ্খলা নাই, সেখানেও নির্দ্দিষ্টরূপ ও শৃঙ্খলা বিরাজমান বলিয়া অনুমান করিবে। (৪) আলোচনা এবং গণনায় পূর্ণতার আশ্রয় গ্রহণ করিবে, যাহাতে কোন বিষয়ে কোনরূপে ত্রুটি না থাকে।

তাঁহার মতে উপরিলিখিত চারিটি প্রণালী অ্যারিষ্টটলের ন্যায়শাস্ত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। তাই প্রণালী চতুষ্টয়ের সহায়তায় সুস্পষ্ট দার্শনিক জ্ঞান অধিগত করা সহজসাধ্য হইয়া উঠে।

ডেকার্টের পুস্তকাবলী

ডেকার্টের রচিত পুস্তকাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি দার্শনিক আলোচনার জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

(১) Discours de la Methode.

(২) Meditationes de Prima Philosophia.

(৩) Principia Philosophiae.

(৪) Passiones Animae.

ডেকার্টের নৈতিক আলোচনা

ডেকার্ট নৈতিক বিষয়ে আলোচনা খুব কম করিয়াছেন। তথাপি যাহা তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে পাওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপে নিম্নরূপ :—

মানবের প্রাথমিক মনোবৃত্তি ছয়টি—বিস্ময়, প্রেম, ঘৃণা, বাসনা, হর্ষ ও বিষাদ। মনোজগতের অন্যান্য যে সমস্ত মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার সমস্তই এই প্রাথমিক বৃত্তি হইতে উদ্ভূত। মনোবৃত্তির মধ্যে পূর্ণতম—ঈশ্বরের প্রতি জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি (Intellectual love to God)। এই বিষয়টি ডেকার্টের অন্যতম ভক্ত স্পিনোজার দার্শনিক মতবাদে একটি নবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। সময়ান্তরে তাহা আলোচিত হইবে। এই পর্য্যন্ত তিনি অ্যারিষ্টটলের সহিত একমত।

ডেকার্টের মতে পূর্ণতাই সুখ। যখনই আমরা সুখ অনুভব করি, তখনই কোনরূপে অপূর্ণতাজনিত অভাবের হ্রাস হয়। জ্ঞানের দ্বারা মনোবৃত্তির দমনই পুণ্য। তাঁহার মতে জ্ঞানলব্ধ আনন্দ জাগতিক বস্তু হইতে লব্ধ আনন্দ অপেক্ষা উচ্চতর এবং কাম্য।

অনন্তরাম দত্তের "ক্রিয়াযোগসার"

অধ্যাপক শ্রীসুবোধরঞ্জন রায়, এম-এ,

মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ মহাশয় অনন্তরাম রচিত "ক্রিয়াযোগসারের" দুই-খানি অসম্পূর্ণ পুঁথির সন্ধান দিয়াছেন। (প্রাচীন পুঁথির বিবরণ ; ১ম খণ্ড—১ম ও ২য় সংখ্যা) ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনও অনুরূপ দুইখানি পুঁথির কথা জানাইয়াছেন, একটি রামেশ্বর নন্দীর অপরটি অনন্তরামের। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৩১৬ ও ৪২৮ পৃষ্ঠা)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা পুঁথিশালায়ও দুইটি "ক্রিয়াযোগ সার" পুঁথি আছে, একটি রামসুন্দরের, অপরটি প্রাণনারায়ণের। সম্প্রতি আমরা চট্টগ্রাম হইতে অনন্তরাম রচিত আর একটি উক্ত পুঁথির সন্ধান লাভ করিয়াছি। এই পুঁথিসমূহ ব্যাসকৃত সংস্কৃত পদ্মপুরাণের একাংশের অনুবাদ। পদ্মপুরাণ ছয়খণ্ডে বিভক্ত, যথা—সৃষ্টিখণ্ড, ভূমিখণ্ড, স্বর্গখণ্ড, পাতালখণ্ড, উত্তরখণ্ড ও ক্রিয়াযোগ সার। পদ্মপুরাণ একটি উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণবগ্রন্থ।

আমাদের পুথিখানি চট্টগ্রাম কলেজ রোডস্থিত শ্রীযুক্ত চিদানন্দ গুপ্ত মহাশয়ের নিকট সংরক্ষিত আছে। পুঁথির পত্রসংখ্যা—১২৫, ১৬শ অধ্যায়ে ইহার আখ্যানভাগ বিভক্ত, পুঁথি নকল সমাপ্তির তারিখ—"১২০০ মঘি, ৬ আশ্বিন, রোজ শুক্রবার।" ১২০০ মঘি—১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ তারিখে মঘিসনের উল্লেখে মনে হয়, পুঁথিখানি চট্টগ্রামেই লিখিত হইয়াছে, কেননা এই মঘি সন অন্য কোথাও প্রচলিত নাই। কিন্তু পুঁথিখানাতে চট্টগ্রামের কথাভাষার রীতিসিদ্ধ প্রয়োগের নিদর্শন কোথাও পাওয়া গেল না। ক্রিয়ার ব্যবহারে ও প্রাদেশিকত্বের কোন সন্ধান মিলে না। অর্বাচীন রচনা হইলেও আরবী-ফারসী শব্দের প্রয়োগ ইহাতে বিশেষ লক্ষিত হইল না।

কবির পরিচয় জ্ঞাপক দীর্ঘ শ্লোক হইতে আমরা তাঁহার বংশপরিচয় এইভাবে উদ্ধার করিতে পারি। তীর্থরাজের (?) সন্নিহিত উত্তর সাধাপুর কবির নিবাস। এই সাধাপুরকে আমরা সাহাপুরের বিকৃত উচ্চারণ এবং উভয়কে বস্তুতঃ অভিন্ন বলিয়াই মনে করি। "তির্থরাজ" নদী, পর্বত কি স্থানের নাম তাহা বুঝা যাইতেছে না, কোথাও ইহা ছিল কিনা জানা যায় না। ইহার সন্নিহিত সাহাপুরকে দীনেশবাবু ব্রহ্মপুত্রের নিকটবর্তী মেঘনানদীর পশ্চিম পারে বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কবির পিতামহের নাম এই পুঁথিতে অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য। দীনেশবাবু ও সাহিত্য বিশারদ মহাশয় কবির পিতামহের নাম যথাক্রমে কবি দুর্লভ ও বৈবদন্ত বলিয়াছেন। ইহার তিনপুত্রের নাম আমরা 'রামচন্দ্র, রাঘবেন্দ্র ও রঘুনাথ' পাইয়াছি বলিয়া কবি অনন্তরাম

রঘুনাথের পুত্র, তাঁহার মাতামহের নাম রামদাস এবং অগ্রজের নাম রামকৃষ্ণ রায়। দুই সহোদরের বিভিন্ন উপাধি—একটু আশ্চর্যের বিষয় বলিয়াই, মনে হয়। কিন্তু চট্টগ্রামে এখনও একই পরিবারে পিতার 'ভট্টাচার্য্য' পুত্রের 'মুখোপাধ্যায়' বা পিতার 'দাশগুপ্ত' পুত্রের 'চৌধুরী' প্রভৃতি পদবী দেখা যায়। সুতরাং এই ক্ষেত্রে 'রায়' সমৃদ্ধি ও মর্য্যাদা-সূচক অথবা রাজদত্ত খেতাব বলিয়া গ্রহণ করিলে অন্যায় হইবে না। পুঁথির মূল রচনার বা কবির আবির্ভাবের কোন সন তারিখ পুঁথিটিতে নাই।

পুঁথিটি পয়ার এবং ত্রিপদী ছন্দে রচিত। সর্বত্রই এই দুইটি সাধারণ ভণিতা দেখা যায়:—

"কহেন অনন্ত দত্তে সেজে রঘুনাথ সুতে
রামকৃষ্ণ রায়ের অনুজ,
সেজে রঘুনাথ সুতে রামদাস সুতাসুতে
স্মরিয়া গঙ্গার পদাম্বুজ॥"

এবং-

"পরাশর সুত ব্যাস বিষ্ণু অবতার।
শ্লোকবন্দে রচিলেক ক্রিয়াযুগসার॥
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদবন্দে।
রচিল অনন্ত রাম হরিগুণানন্দে॥"

বিশারদ উপাধি বিশিষ্ট কোন মহাজনের শরণ লইয়া কবি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

বিশারদ পদে সেই রেণু অভিপ্রায়ে।
পদবন্দে রচিলেক চতুর্থ অধ্যায়ে॥

বিশারদ কী কবির দীক্ষাগুরু অথবা পূর্বসূরী?

পূর্বেই বলিয়াছি, এই গ্রন্থখানি পদ্মপুরাণের "ক্রিয়াযোগ সার" অংশের অনুবাদ। ধর্মকর্ম হেতু বারমাসে পালনীয় বিধির সুদীর্ঘ বিবরণ ইহাতে পাওয়া যায়। "ক্রিয়াযোগসার" নাম হইতেই প্রতীয়মান হয়, ইহাতে নিত্যনৈমিত্তিক আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি পালনীকেই মোক্ষলাভের চরম উপায় বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। মূল ক্রিয়াযোগসারের বিষয় সম্বন্ধে এই অনুবাদে অনেকস্থানে সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে, কিন্তু অনুবাদ মূলানুগামী হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়, পুঁথির সর্বত্রই কবিত্ব প্রায় সাধারণ শ্রেণীর; কেন না মূল পদ্মপুরাণটিই বর্ণনা-প্রধান এবং স্থলবিশেষে সুন্দর বর্ণনা প্রভৃতি থাকিলেও, তাহার অধিকাংশই অনন্তরাম বাদ দিয়াছেন। বাহুল্যভীতিই সম্ভবতঃ ইহার কারণ।

গ্রন্থের কয়েকটি পত্র ব্যাপিয়া বৈষ্ণব-লক্ষণ, বৈষ্ণব-সেবক প্রভৃতির বর্ণনা করা হইয়াছে, বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য বর্ণনায় কবি অতি চরমে উঠিয়াছেন—

"বৈষ্ণবের পদধূলি জেই ধরে সিরে।
কোটী কোটী জন্ম তার নরক উদ্ধারে॥"

আর এক স্থানে দেখিয়াছি, ভগবান এবং ভক্তের মধ্যে সখাভাব স্থাপিত হইয়াছে। স্বয়ং নারায়ণ—

করেন গেণ্ডুয়া খেলা ভদ্রতনু সম।

এইরূপ বৈষ্ণব প্রবণতার বহু নিদর্শন গ্রন্থমধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, দীনেশবাবু এই পুঁথিটি বৈষ্ণবদিগের নিত্যনৈমিত্তিক পাঠ গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কবি অনন্তরাম সম্ভবতঃ বৈষ্ণব ছিলেন, ভণিতায় আছে—

"কহেন অনন্ত দত্তে সেজে রঘুনাথ সুতে
হরিপদে ভক্তিযুক্ত মন।"

অথবা—

রচিল অনন্তরাম হরিগুণানন্দে!

সাহিত্য বিশারদ মহাশয় তাঁহার দ্বিতীয় পুঁথিতে মাধব ও সুলোচনার যে কাহিনীর অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা মূল পদ্মপুরাণেরই অন্তর্ভুক্ত, আমাদের পুঁথি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিতেও আমরা উহা পাইয়াছি, ইহাতে মাধব গন্ধিনী নাম্নী মালিনীর মধ্যস্থতায় সুলোচনার সহিত পরিচিত হইয়াছে এবং ইহার পরে সুলোচনা হরণ প্রভৃতি ব্যাপার দ্বারা গল্পটি বেশ জটিল ও কৌতূহলপূর্ণ হইয়াছে, নায়ক-নায়িকার গোপন মিলনে এই মালিনীর মধ্যস্থতা বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানেরও বৈশিষ্ট্য। আলোচ্য গ্রন্থের গন্ধিনী মালিনীকে আমাদের কবি, কিন্তু ভারতচন্দ্রের মত—

আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥—

রূপে চিত্রিত করেন নাই, সে সচ্চরিত্রা ও সহানুভূতিসম্পন্না।

আর একটি কৌতূহলপূর্ণ গল্প সবিস্তারে বর্ণনা করিতে হয়—প্রনিধি নামে এক বৈশ্য ধনোপার্জনের জন্য স্থানান্তরে গমন করিয়াছিল, তাহার সাধ্বী পত্নী পদ্মাবতী, সখিগণসহ একদিন স্নান করিতে গেলে ধর্মধ্বজ নামক এক কামাচারী চণ্ডালের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। চণ্ডাল তাহার নিকট প্রেম নিবেদন করিলে, সে ও সখিগণ তাহাকে কঠোর-

ভাবে ভর্ৎসনা করিল ও গঙ্গায় ডুবিয়া মরিতে বলিল। ইহাতে ক্ষোভে সেই চণ্ডাল গঙ্গায় ডুবিয়া আত্মহত্যা করিল এবং পরক্ষণেই সুন্দর পুরুষমূর্তি ধারণ করিয়া প্রনিদির অনুরূপ আকৃতি ধারণ করিয়া পদ্মাবতীর স্থানে উপস্থিত হইল। ঠিক সেইদিনই প্রনিদিও বাণিজ্য হইতে প্রত্যাবর্তন করিল এবং পদ্মাবতী কোন স্বামীকে সেবা করিবে স্থির করিতে না পারিয়া নারায়ণের স্মরণাপন্ন হইল এবং নারায়ণ তাহাকে যুগ্ম-স্বামী সেবার উপদেশ দিলেন। পদ্মাবতী উত্তরে বলিলেন—

সর্বলোকে হাসিব মোরে দেখি কুলক্ষণ।

নারায়ণ তাহাকে যুক্তি দিলেন —

ভোক্তুং তে যৌবনং সাধ্বি সোঽভবৎ দ্বিবিধঃ স্বয়ং।
অনন্তরূপিণা লক্ষ্মীপতে ক্রীড়েনায়াসেন॥ (সংস্কৃত ক্রিয়াযোগসার)
আমার অনন্ত জ্ঞান জথাতথা।
তবে কেনে সেবি আমি হেমন্ত দুই জনা॥ (অনন্তরাম)

পদ্মাবতী তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য করিল।

এই স্কন্ধের পুরুষোত্তম ব্রাহ্মণ ও সুমধ্যা বেশ্যার কাহিনীটির সহিত বিল্বমঙ্গল চিন্তামণি উপাখ্যানের অতি সুন্দর সাদৃশ্য আছে। পুরুষোত্তম বহুদিন বেশ্যাসক্ত ও দুষ্ক্রিয়ারত থাকিয়া শেষে সুমধ্যা বেশ্যারই উপদেশে পাপপথ হইতে প্রত্যাবর্তন করিল এবং অনুতাপ ও আরাধনা করিয়া শ্রীহরির কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছিল।

এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনী ইহাতে আছে। এই সমস্তই মূল পদ্মপুরাণের অন্তর্ভুক্ত। এই গল্পগুলির অবতারণার একটিমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, ইহাদের সমস্ত নায়ক নায়িকাই,—তাহারা পাপাত্মা হোক আর পুণ্যাত্মাই হোক, শেষে গঙ্গার পূতজলে স্বাভাবিক অথবা অস্বাভাবিক উপায়ে নিমজ্জিত হইয়াছে, এবং গঙ্গার মাহাত্ম্যগুণে তাহাদের সমস্ত পাপ স্খলিত হইয়া গিয়াছে, তাহারা মোক্ষধাম লাভ করিয়াছে কিম্বা বিষ্ণুর চরণতলে স্থানলাভ করিয়াছে। সুতরাং উপপাদ্য বিষয়ের সহিত এই গল্পসমূহ সম্পর্কান্বিত।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই পর্যন্ত সাতখানি "ক্রিয়াযোগসার" পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং সর্বদিক বিবেচনা করিয়া মনে হয় আমাদের আবিষ্কৃত পুঁথিটিই সম্পূর্ণতম, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের বহু অনুবাদের ন্যায় এই ক্রিয়াযোগসারের অনুবাদ ও বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুবাদ শাখাপুষ্ট করিয়াছে। সুতরাং ইহারও সম্যক্ আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বঙ্গসাহিত্যে অক্ষয়কুমার

ডক্টর শ্রীমনোমোহন ঘোষ, এম-এ, পি-এইচ-ডি

ঈশ্বরগুপ্ত যখন বাঙলা সাহিত্যের মধ্যগগনে সূর্য্যের মত বিরাজিত ছিলেন এবং তাঁহার সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়া দৈনিক পত্রে পরিণত হইয়াছিল তখন (১৮৩৯) আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের অতি অপরিণত অবস্থা। নানা দিক দিয়া নানাভাবে গদ্য রচনার চর্চ্চা চলিতে থাকিলেও তখন পর্য্যন্ত যথার্থ সাহিত্য পদ-বাচ্য রচনার সূত্রপাত হয় নাই। সত্য বটে তখন সংবাদ প্রভাকরের মত কাগজ গুপ্ত কবির প্রতিভাপ্রভা বিকীর্ণ করিতেছিল কিন্তু এই প্রভা যে পরিমাণে তাপ দিত সে পরিমাণে আলোকদান করিত না। কারণ বাঙলা সাহিত্য তখন সবেমাত্র পল্লীসাহিত্যের উপরের ধাপে উত্তীর্ণ হইয়াছিল তাহার রুচি সম্পূর্ণ শুচি হইয়া উঠে নাই এবং লেখার মধ্যে মধ্যযুগীয় রীতির ঝাঁঝ তখনো বর্ত্তমান। স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে যে বিদ্যালয়-পাঠ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছিল সেই সকলে আধুনিকত্ব সঞ্চারের প্রয়াস থাকিলেও নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদে রচিত বলিয়া উহারা সাহিত্য হইয়া উঠে নাই। এই কারণে তৎকালীন সাময়িক পত্রিকা ও গ্রন্থাদিতে যে গদ্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা আধুনিক সাহিত্যের শৈশবাবস্থার নিদর্শন হইয়া রহিয়াছে। 'অমৃতং বাল ভাষিতং' কেবল এই কথা মনে করিলেই তখনকার রচনাসমূহকে নিঃসঙ্কোচে সাহিত্য বলা যায় নচেৎ এই সময়কার অসংযত ও গাম্ভীর্য্যহীন রচনায় পূর্ণ সাময়িক পত্রাদির এবং অনুবাদ বা অনুকৃতিমূলক পাঠ্য পুস্তকের প্রবন্ধসমূহকে সাহিত্য বলিতে প্রত্যেক সমালোচকই বোধ হয় কুণ্ঠাবোধ করিবেন। "রসরাজ", 'যেমন কর্ম্ম তেমন ফল' ইত্যাদি অশ্লীল ভাষী কাগজের কথা ছাড়িয়া দিলেও 'প্রভাকর', 'ভাস্করে'র ন্যায় ভদ্র সমাজের জন্য লিখিত পত্র সকলেও এমন সব ব্রীড়াজনক বিষয় বাহির হইত যাহা [কেহ] ভদ্রলোকের নিকট পাঠ করিতে পারিত না।

কেবল অশ্লীল ভাষার জন্য নহে, আলোচ্য বিষয়ের লঘুত্ব এবং রচনারীতির নিকৃষ্টত্বের জন্যও এই সকল রচনা সেকালকার ইংরেজীশিক্ষিত ও নব্যরুচিবিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট উপেক্ষিত ছিল। তাঁহারা, না এসকল কাগজের জন্য প্রবন্ধ রচনা করিতেন, না এ সকল পাঠ করিতেন। কিন্তু নব শিক্ষায় শিক্ষিত এবং নব ভাবের ভাবুক এই সকল ব্যক্তিই ছিলেন নবীন বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি বিধানে সমর্থ; কারণ তাঁহাদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ধারার অবসান হইয়াছিল এবং সেই হেতু প্রাচীনপন্থীদের দ্বারা

বাংলা সাহিত্যের উন্নতির আশা তখন সুদূর পরাহত। এরূপ অবস্থায় নব্য সম্প্রদায় নব প্রবর্তিত বাংলা সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট না হইলে ইহার শৈশব আর কতকাল ধরিয়া চলিত তাহা কে বলিতে পারে? নব্য সম্প্রদায়কে বাংলা সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট করিল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩)। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) সত্যধর্ম প্রচারের জন্য যে তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৩৯) তাহারই মুখপত্র স্বরূপে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বিবিধ বিষয়ে সুলিখিত প্রবন্ধ পরিপূর্ণ এই পত্রিকা বাংলা গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক অপূর্ব পরিবর্তনের সূচনা করিল। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬)। কেবল সুন্দর গদ্য রচনার ক্ষমতা নহে তাঁহার জ্ঞানার্জনের এবং জ্ঞান বিতরণের স্পৃহাও ছিল অদম্য। এরূপ একজন শক্তিশালী পুরুষের সহযোগিতার ফলে দেবেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হওয়া মাত্রই দেশের শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধা অর্জনে সমর্থ হইল। ক্রমে ক্রমে শিক্ষিত নব্য যুবকগণ বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে মন দিলেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠার পর হইতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যে স্বাস্থ্যকর অভিনবত্বের সঞ্চার হইল তাহার ফলে এ সাহিত্য শৈশব ছাড়িয়া যৌবনে পদার্পণ করিল। সমাজের শিক্ষিত এবং নেতৃস্থানীয়গণ ইহাকে বন্ধুর মত গ্রহণ করিলেন। তখন হইতে বাংলা সাহিত্যের উন্নতির গতি যে দ্রুততর হইল তাহা কেবল অক্ষয় কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভাগুণেই সম্ভবপর হইয়াছে। এই উভয়ের সঙ্গে ইহাদেরই মত আর এক জন প্রতিভাশালী মহাত্মার নাম প্রশংসার সহিত স্মরণীয়। তিনি হইতেছেন সুবিখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)। অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথ একদিকে সাহিত্যকে যেমন প্রাঞ্জলতা, গাম্ভীর্য্য ও মহিমা দিলেন বিদ্যাসাগরও তেমনি অপরদিকে ইহাতে রীতি, পারিপাট্য, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য সঞ্চার করিলেন। তত্ত্ববোধিনীর প্রতিষ্ঠাকাল হইতে মাইকেল-বঙ্কিম যুগের আরম্ভ সময় পর্যান্ত সময়ের মধ্যে অচির প্রবর্তিত বাংলা গদ্যের যে একটি সর্বজনগ্রাহ্য সুন্দর আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার কৃতিত্ব এই তিন জন মহাপুরুষের। এই সময়কার সাহিত্যের ইতিহাস মুখ্যতঃ ইহাদের তিনজনেরই শিল্পকুশলতার কাহিনী।

বিদেশী লেখকগণই সর্বাগ্রে আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা বাংলা ভাষায় প্রচার করিয়া ছিলেন বটে কিন্তু একটি ভিন্নদেশীয় ভাষায় দেশের অপরিচিত বা অল্প পরিচিত বিষয় সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া তাঁহাদের অনুবাদাত্মক রচনাগুলি তেমন সহজবোধ্য বা হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। ইহার ফলে পাঠক সমাজে ঐ সকল বৈজ্ঞানিক রচনার প্রচার অতি বিরল ছিল। এই সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ হিতসাধন করিয়াছেন অক্ষয়কুমার দত্ত। তাঁহার বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার পশ্চাতে ছিল তাঁহার বিজ্ঞানতত্ত্ব-

পিপাসু মনের স্বাভাবিক প্রেরণা। ইহারই ফলে তাঁহার রচিত প্রবন্ধ নিচয়ে দুর্বোধ্যতা কিছুমাত্র থাকিত না। কিন্তু কেবল বৈজ্ঞানিক বিষয়ের রচনা নহে ধর্ম, দর্শন, পুরাতত্ত্ব আদি বিষয়েও তিনি যে সকল নিবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন সে সকলও তাঁহার অকৃত্রিম জ্ঞাননিষ্ঠার অঙ্গীভূত হওয়ায় পাঠকবর্গকে এক স্বাভাবিক জ্ঞানের রসে অভিষিক্ত করে। বস্তুতঃ, রচনার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে লেখকের সুস্পষ্ট ধারণা এবং উহার সঙ্গে প্রাণের যোগ না থাকিলে তাহা লেখার ভিতর দিয়া সুখবোধ্য রূপ ধারণ করে না। অক্ষয়কুমার দত্তের মত সহজাত জ্ঞানতৃষ্ণা অতি অল্পসংখ্যক লোকেরই দেখা যায়। তাহার ফলে, যে কিছু বিষয় তিনি শিখিতেন তাহা ভাল করিয়াই শিখিতেন এবং যে বিদ্যা তিনি লাভ করিতেন তাহার সহিত তদীয় প্রাণের যোগ থাকিত। বিদ্যাকে এমন ঘনিষ্ঠভাবে মনের অঙ্গীভূত করিয়া লইতেন বলিয়া তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ অনায়াসে এক অনায়াস-বোধ্য মূর্তি পরিগ্রহ করিত। এই গুণেই তাঁহার গদ্য রচনা বিষয়ের গুরুত্ব সত্ত্বেও পাঠক সাধারণের নিকট সমাদর লাভ করিয়াছে এবং তিনি আধুনিক বাঙলা গদ্যের এক জন কৃতী সংস্কারক বলিয়া গণ্য হইয়াছেন।

অক্ষয়কুমার দত্ত ১৮২০ অব্দে নবদ্বীপের সমীপবর্তী চুপী নামক গ্রামে এক বঙ্গজ কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে অত্যন্ত শান্ত ও নির্বিরোধী ছিলেন কিন্তু এই শান্ত গম্ভীর বালকের কৌতূহলের সীমা ছিল না। পাঠশালার গুরুমহাশয়ের নিকট কাঠাকালির অঙ্ক কষিতে কষিতে, পৃথিবীর পরিমাণ কত কাঠা ইহা জানিতে তাঁহার কৌতূহল হইয়াছিল। এই কৌতূহলই নানা বাধা বিপত্তির মধ্যে আমরণ তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা সজীব রাখিয়াছিল। কয়েক বৎসর পল্লীর পাঠশালে কাটাইয়া দশবৎসর বয়সে অক্ষয়কুমার খিদিরপুরে নিজ পিতার নিকট আসিলেন। পিতা পীতাম্বর দত্ত খিদিরপুরে গঙ্গার ঘাটে স্বল্প বেতনে শুল্ক আদায়ের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। অক্ষয়কুমার এইখানে আসিলে 'স্কুলবুক সোসাইটির" প্রকাশিত প্রাকৃতিক ভূগোলের এক বঙ্গানুবাদ তাঁহার হাতে পড়ে। উহা পড়িয়া তিনি বুঝিলেন যে বিদ্যুৎ বৃষ্টি প্রভৃতি নৈসর্গিক ব্যাপারের কারণ সম্বন্ধে প্রচলিত বিশ্বাস ও ধারণাসমূহ একান্ত ভ্রমাত্মক। পাঠশালায় পড়িবার কালে তিনি চাণক্য শ্লোক হইতে জানিয়াছিলেন যে বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজা লাভ করে। তাই সর্ব্বস্থানে পূজ্য হইবার মানসে দশ বৎসর বয়সেই তিনি নানা জ্ঞানের আকর ইংরাজী শিখিতে সঙ্কল্প করিলেন। কিছুদিন তিনি এক ব্যক্তির নিকট ঘরোয়াভাবে পাঠ লইলেন। কিন্তু এই শিক্ষকের ইংরাজী জ্ঞানের স্বল্পতা অনুভব করিয়া অক্ষয়কুমার তাঁহার কোন আত্মীয়ের নিকট এবিষয়ে অনুযোগ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও অভিভাবকেরা তাঁহার ইংরাজী শিক্ষায় যত্ন লইতেছেন না দেখিয়া তিনি নিজে চেষ্টা করিয়া স্থানীয় মিশনারী স্কুলে প্রবেশ করিলেন। তখনকার দিনে গোঁড়া হিন্দুরা

খৃষ্টানের বিদ্যালয়ে ছেলে পাঠান বিপজ্জনক মনে করিতেন। তাঁহাদের ভয় হইত পাছে ছেলে খ্রীষ্টধর্ম আশ্রয় করে। তাই অভিভাবকগণ অচিরে তাঁহাকে মিশনারী স্কুল ছাড়াইয়া কলিকাতায় ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে, ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। অক্ষয়কুমার তাঁহার কোন আত্মীয়ের বাসায় থাকিয়া তথায় পড়িতে লাগিলেন। এই সময়ে প্রায় ষোল বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। অক্ষয়কুমার ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। এইখানেই তাঁহার রীতিমত ইংরাজী শিক্ষার আরম্ভ। পরের বৎসর পরীক্ষার ফল আশাতীতরূপে উত্তম হওয়ায় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ তাঁহাকে পঞ্চম শ্রেণী হইতে তৃতীয় শ্রেণীতে উঠাইয়া দিলেন। ইহার কিছুকালের মধ্যে পিতার মৃত্যু হইলে সংসারের ভার তাঁহার উপর পড়িল। তিনি তখন অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়ে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতে ছিলেন।

বিদ্যালয় ছাড়িবার কিছুদিন পরেই অক্ষয়কুমারের সহিত ঈশ্বর গুপ্তের পরিচয় ঘটে। গুপ্ত কবির সহিত দেখা করিবার জন্য একদিন তিনি 'প্রভাকর' কার্য্যালয়ে যান। ঘটনাক্রমে সেদিন ঈশ্বরগুপ্তের সহকারী মহাশয় অনুপস্থিত ছিলেন। পত্রিকার জন্য ইংরেজী খবরের কাগজ হইতে কোন কোন স্থান অনুবাদ করিয়া দেওয়া উক্ত সহকারীর কাজ ছিল। তাঁহার অভাবে গুপ্ত কবি অক্ষয়কুমারকে ঐ কাজটি করিতে অনুরোধ করিলে তিনি উত্তরে জানাইলেন যে তাঁহার দ্বারা ঐ কাজ সম্ভব নয়, কারণ তিনি ইতিপূর্ব্বে কখনো গদ্য লেখেন নাই। পরবর্ত্তী কালে বাঙলা গদ্যের সংস্কারকরূপে যিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন গোড়াতে আত্মক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁহার এই অজ্ঞতা বিশেষ কৌতুকজনক। সে যাহাই হৌক গুপ্ত কবি সহজে ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে অক্ষয়কুমারকে অনুবাদে হাত দিতে হইল। লেখা সমাপ্ত হইলে তাহা পড়িয়া ঈশ্বরচন্দ্র বলিলেন, "যিনি বহুদিন অবধি এই কর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন, তিনিও এমন সুন্দর লিখিতে পারেন না।" ইহাই অক্ষয়কুমারের গদ্য রচনার সূত্রপাত। এখন হইতে তিনি প্রভাকরের জন্য প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। এই সকল ব্যাপারের পূর্ব্বে তিনি 'আনন্দমোহন' নামে একখানি ক্ষুদ্র পদ্য পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।

কিন্তু সাহিত্যচর্চ্চা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ হয় না; সেইহেতু অক্ষয়কুমারকে উপার্জ্জনের জন্য চেষ্টা করিতে হইল। এবিষয়ে বন্ধুগণ তাঁহাকে নানা উপদেশ দিলেন। একজন তাঁহাকে দারোগা হইতে প্ররোচনা দিলে তিনি ঐ পদপ্রার্থী হইবার জন্য পুলিশের কার্য্যবিধি পড়িতে লাগিলেন কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে এই পাঠে বিরক্ত হইয়া তিনি উহা ছাড়িয়া দিলেন। পরে অন্য কোন বন্ধু তাঁহাকে আইন পড়ায় পরামর্শ দিলে ইহাও তাঁহার মনঃপূত হইল না। তিনি বলিলেন, আইন দিন দিন বদল হয় উহা পড়িয়া কি লাভ; যে আইন (নিয়ম) দ্বারা

জগৎ পরিচালিত হয় আমি সেই স্থির ও অচঞ্চল আইন লিখিতে চাই।" এইরূপে সময় গত হইলে একদিন অকস্মাৎ অক্ষয়কুমার নিজ জীবনের কর্ত্তব্য পথ আবিষ্কার করিলেন।

বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেও অক্ষয়কুমার বিদ্যাচর্চ্চা ছাড়িয়া দেন নাই।' তখন তিনি নিজের চেষ্টায় কিয়ৎ পরিমাণে উচ্চাঙ্গের গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থ-বিজ্ঞান এবং জার্ম্মাণ ভাষা শিক্ষা করেন। এইরূপ জ্ঞান-পিপাসু অক্ষয়কুমারের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল ঘটনা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই উভয়ের পরিচয় সংঘটন করেন। (১৮৩৯) কারণ তিনি ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভার অন্যতম সভ্য। অক্ষয়কুমারও এই সভায় সভ্যপদ গ্রহণ করিলেন। ১৮৪০ সালে উক্ত সভার যত্নে 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' প্রতিষ্ঠিত হইলে অক্ষয়কুমার সামান্য বেতনে ঐ বিদ্যালয়ে ভূগোল ও পদার্থবিদ্যার শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। ইহার পর বৎসর (১৮৪১) তত্ত্ববোধিনী সভার ব্যয়ে অক্ষয়কুমারের রচিত 'ভূগোল' প্রকাশিত হয়।

এই 'ভূগোল' পুস্তকের ভূমিকায় অক্ষকুমার যে গদ্যের ব্যবহার করিয়াছেন তাহা তদীয় পূর্ব্বগামী লেখকগণের গদ্য অপেক্ষা বহুগুণে সুমার্জ্জিত ও সরল। ঠিক এই সময়েই তত্ত্ববোধিনী সভার বার্ষিক উৎসবে তিনি যে বক্তৃতা করেন তাহা এতদপেক্ষাও উৎকৃষ্ট।

বর্ত্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ গদ্য রচনার সঙ্গে এই রচনাদ্বয়ের যতখানি প্রভেদ তদপেক্ষা এদের অনতি পূর্ব্বে প্রকাশিত যে কোনও গদ্য গ্রন্থের ভাষাগত প্রভেদ অনেক বেশী। ভাষা দিব্য অনায়াস গতিলাভ করিয়াছে, জড়তা একেবারে নাই বলিলেও চলে; অথচ এ সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন গ্রন্থই রচিত বা প্রচারিত হয় নাই।' রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে অক্ষয় কুমারের এই প্রথম রচনা বিদ্যাসাগরেরও পূর্ব্বে "গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্ব্বরতার" হস্ত হইতে আপনাকে নির্ম্মুক্ত করিয়াছিল।

ভূগোল প্রকাশের পর বৎসর (১৮৪২) অক্ষয়কুমার 'বিদ্যাদর্শন' নামে এক মাসিকপত্র প্রকাশ করেন কিন্তু ছয় সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর এই কাগজখানি বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৪৩ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্ররূপে 'তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা' প্রকাশের সঙ্কল্প করিলেন। এই পত্রিকার সম্পাদক নির্ব্বাচনের জন্য অনেক সভ্যের রচনা পরীক্ষা করিয়া তিনি দেখিলেন যে অক্ষয় কুমারের রচনা "অতিশয় মধুর ও হৃদয়গ্রাহী।" তাহার ফলে অক্ষয় কুমারই উক্ত পত্রিকার সম্পাদক পদে বৃত হইলেন। তাঁহার সহিত সর্ব্ববিষয়ে অক্ষয় কুমারের মতের মিল না থাকিলেও দেবেন্দ্র নাথের গুণগ্রাহিতা ও ঔদার্য্যের ফলে পত্রিকা সম্পাদন কার্য্যে উভয়ের সহযোগিতা বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলপ্রদ হইয়াছিল। তত্ত্ববোধিনী সম্পাদন করিতে করিতে অক্ষয় কুমার অতিরিক্ত ছাত্ররূপে মেডিক্যাল কলেজে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন,

উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিজ্ঞান অনুশীলন করিলেন। এই রূপে বিবিধ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি তত্ত্ববোধিনীর পাতায় বাঙলা ভাষার ভিক্ষা দিয়া এই সকল বিজ্ঞানের তত্ত্ব, ইতিহাস এবং পুরাবৃত্তের তথ্যাদি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে দেখিতে দেখিতে বাঙলা ভাষা সকল রকম ভাব প্রকাশের উপযোগী হইয়া উঠিল। তাহা ছাড়া আর একটি বড় লাভ হইল এই যে, বাঙলা গদ্যের ভাষা বেশ সুশৃঙ্খলিত ও সুবিন্যস্ত হইয়া উঠিল। বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিতে গেলে কোন ভাবকে অস্পষ্ট রাখা চলে না এবং একটি সুবিহিত চিন্তাপ্রণালী অনুসারে মনোভাবগুলিকে বাঁধিয়া তুলিতে হয়। কাজেই অক্ষয় কুমারের রচনার ফলে বাঙলা গদ্যের প্রাঞ্জলতা ও প্রকাশ ক্ষমতা প্রচুর বর্দ্ধিত হইল। তাঁহার সম্পাদিত তত্ত্ব বোধিনীর সাফল্য দর্শন করিয়া পরবর্ত্তীকালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন, "আমি তাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি। অমন রচনার সৌষ্ঠব তৎকালে অল্প লোকেরই দেখিতাম। তখন কেবল কয়েকখানা সংবাদপত্র ছিল; তাহাতে লোক হিতকর জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশ হইত না। বঙ্গদেশে তত্ত্ববোধিনীই সর্ব্বপ্রথমে সেই অভাব পূরণ করে।"

প্রবন্ধ গৌরবে ও বিষয় বৈচিত্র্যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা অল্প দিনের মধ্যেই দেশব্যাপী খ্যাতিলাভ করিল। ইহার গ্রাহক সংখ্যা সাতশত হইয়া দাঁড়াইল। পত্রিকায় প্রকাশিত ধর্ম্ম বিষয়ক, নৈতিক ও শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ নিচয় এই বৃহৎ পাঠক সমাজ কর্ত্তৃক কিরূপ আগ্রহের সহিত পঠিত হইত বর্ত্তমানকালে বিবিধ সাময়িক পত্রিকার ছড়াছড়ির দিনে তাহার পরিমাণ উপলব্ধি করা কঠিন হইবে। রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন যে সারা বাঙলা দেশের লোক উৎসুক ভাবে এই পত্রিকার প্রতিসংখ্যার জন্য অপেক্ষা করিত। দীর্ঘকাল ধরিয়া তত্ত্ববোধিনী বাঙলা দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের চিন্তা ও মতের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বিবিধ বিজ্ঞান, নৈতিক উপদেশ, নানা জাতি ও সম্প্রদায়ের বিবরণ, সচেতন ও অচেতন বহু পদার্থের কাহিনী লইয়া রচিত অক্ষয় কুমারের প্রবন্ধ নিচয় তত্ত্ববোধিনীর প্রকাশিত হইয়া বাঙালীর ক্রমবর্দ্ধমান বুদ্ধি-বৃত্তিকে উজ্জ্বলতর করিয়াছে এবং তাহাদের অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার নাশের সহায়তা করিয়াছে। এই সময়ে ঈশ্বরগুপ্তের দিপি চাতুর্য্যে সম্পাদিত 'প্রভাকর' প্রাচীন পন্থীদের প্রিয় ছিল, কিন্তু নূতন পদ্ধতিতে পরিচালিত 'তত্ত্ববোধিনী' নবীন বাঙালীর হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করিল। এই পত্রিকা দেশবাসীর জ্ঞান তৃষ্ণা বর্দ্ধিত করিল এবং তাঁহাদের নৈতিক উন্নতির সাহায্য করিল এবং ইহার প্রভাবে নব্য যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে নীতি এবং ধর্ম্ম-সম্পর্কিত তীব্র আগ্রহের সঞ্চার হইল এক কথায় বলিতে গেলে রামমোহন রায় দেশ মধ্যে যে সংস্কার ও প্রগতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা যত প্রকারে সম্ভব তাহার পোষকতা করিল।

বিশেষ যোগ্যতার সহিত তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদন করিতে থাকিলেও অক্ষয় কুমার মাসিক

৩০৲ বেতন পাইতেন। এই হেতু বন্ধুবৎসল বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করিলেন। তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদন কার্য্যের উপলক্ষেই উক্ত মহাত্মার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। বিদ্যাসাগর অক্ষয় কুমারকে মাসিক ১৫০৲ টাকা বেতনে শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি ইনস্পেক্টারের কার্য্যে নিয়োগের সমস্ত ঠিকঠাক্ করিয়া দিলেন কিন্তু অক্ষয় কুমার এই আর্থিক লাভ দ্বারা প্রলুব্ধ হইলেন না। তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদনায় নিযুক্ত থাকিলে তিনি দেশে বিদ্যা বিস্তারের সাহায্য করিতে পারিবেন শুধু এই চিন্তার আনন্দেই স্বল্প বেতনের কর্ম্মে সন্তুষ্ট রহিলেন এবং এই পত্রিকার উন্নতি বিধানের জন্ম কঠোর পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। আহার নিদ্রার প্রতি উদাসীন হইয়া বিবিধ গ্রন্থ অধ্যয়ন এবং নানা বিষয়ে প্রচুর প্রবন্ধ রচনার ফলে ক্রমশঃ তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। বারো বছর যাবৎ তত্ত্ববোধিনী সম্পাদন করিয়া তাঁহাকে অবশেষে ঐ কাজ ছাড়িয়া দিতে হইল। ইহার পরে কিয়ৎ পরিমাণে স্বাস্থ্যলাভ করিলে পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পীড়া-পীড়িতে অক্ষয় কুমার মাসিক ২০০৲ বেতনে কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিলেন কিন্তু পীড়া বৃদ্ধির জন্ম একাজও তাঁহাকে অচিরে ছাড়িতে হইল। এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে ও প্রস্তাবে তত্ত্ববোধিনী সভা তাঁহার কিছু মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিল। ইহাতে তাঁহার আর্থিক অনটন কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইল। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী সভার এই বিশেষ বৃত্তি অক্ষয় কুমার অধিকদিন গ্রহণ করেন নাই। স্বরচিত গ্রন্থের আয় হইতে যেমনি তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের অসুবিধা দূর হইল তখনি তিনি উক্ত বৃত্তি পরিগ্রহ হইতে বিরত হইলেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াই তিনি "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" নামক গ্রন্থের প্রথমখণ্ড প্রকাশ করেন (১৮৫১)। আর ইহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় পরবর্ত্তী বৎসরে (১৮৫২)। এই পুস্তকের দুই ভাগই জর্জ কুম্ব প্রণীত Constitution of Man নামক গ্রন্থে প্রচারিত তত্ত্বের ভিত্তিতে রচিত। কিন্তু ইহতে মৌলিক চিন্তা এবং গবেষণার পরিচয় ও আছে প্রচুর। ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় জীবন যাত্রা প্রণালীর তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া প্রকৃত পন্থা নির্দ্দেশের চেষ্টাও ইহাতে পরিলক্ষিত হয়। প্রথম ভাগ আমিষ ভোজনের বিরুদ্ধে এবং দ্বিতীয়ভাগ সুরাপান নিবারণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত হয়; এই গ্রন্থ প্রচারের ফল খুব সন্তোষজনক হইয়াছিল। ইহার প্রেরণায় তৎকালীন ব্যক্তি বর্গের মধ্যে অনেক মহাশয়—বর্দ্ধমানের মহারাজা পর্য্যন্ত মাছ মাংস ছাড়িয়া দেন এবং ভদ্র সমাজে মদ্যের প্রচলন এবং প্রভাব বহুল পরিমাণে হ্রাস পায়।

শিক্ষা, সদাচার, ভূগোল, প্রাকৃতিক ভূগোল, ভূতত্ত্ব, জ্যোতিষ, উদ্ভিদ বিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ব, শরীর বিধান প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া তত্ত্ববোধিনীতে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন মুখ্যতঃ তাহারই কয়েকটি সংশোধিত ও একত্রিত করিয়া ১৮৫২ সালে তিনি

চারুপাঠ প্রথমভাগ নামে এক বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করিলেন। চারু পাঠের প্রথম ভাগে অনুসৃত পদ্ধতিতে ১৮৫৪ সালে উহার দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। বলা বাহুল্য যে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ এই উভয় পুস্তকের সমাদর করিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য ভঙ্গের জন্য তিনি ১৮৫৯ অব্দের পূর্ব্বে চারু পাঠের তৃতীয় ভাগ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এই পুস্তকে 'স্বপ্ন দর্শন' নামে যে তিনটি নিবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে তাহা অক্ষয় কুমারের ভাষার মাধুর্য্য প্রাঞ্জলতা ও ওজস্বিতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই নিবন্ধত্রয়ে অক্ষয় কুমার ঔপন্যাসিক সুলভ কল্পনাশক্তি এবং রচনাভঙ্গী প্রদর্শন করিয়াছেন অথচ ভাব-গাম্ভীর্য্যে ইহা তাঁহার অন্য যে কোন রচনা হইতে ন্যূন নহে।

হৃদয়-মনস্থির, সাধুবৃত্তি সমূহের সম্যক উদ্বোধন এবং বাহ্য জগতের সহিত মানবমনের পরিচয় সাধন, এবং বিজ্ঞান বিষয়ক কৌতূহল উদ্দীপন ইহা ছিল তিন ভাগ চারুপাঠের উদ্দেশ্য। বিজ্ঞান ও সুনীতি সম্পর্কিত জ্ঞান আপাততঃ একান্ত নীরস এবং আকর্ষণহীন মনে হইলেও বিজ্ঞানপ্রেমিকের অনুরাগ বারিতে সিঞ্চিত হইলে যে কতদূর মনোরম হইতে পারে বাঙ্গলা ভাষায় তাহার সর্ব্ব প্রথম দৃষ্টান্ত চারুপাঠ।

অক্ষয় কুমারের 'ধর্ম্মনীতি' ও 'পদার্থবিদ্যা' যথাক্রমে ১৮৫৫ এবং ১৮৫৬ অব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুস্তকদ্বয় মূলতঃ তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ-রাজীর সমবায়ে রচিত। এই উভয়ের মধ্যে 'ধর্ম্মনীতি' বিষয়বস্তু এবং রচনা প্রণালীর জন্য বাঙ্গলা ভাষার একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইয়া রহিয়াছে। গৃহী মনুষ্যের কর্ত্তব্যবিষয়ে এইরূপ সুচিন্তিত পুস্তক আধুনিক-কালেও বিরল। আর ইহার রচনারীতি একান্ত সরল ও সুখবোধ্য। নিতান্ত উপদেশ মূলক রচনা হইলেও ইহার কোন অংশ নীরস নহে। বর্ত্তমানকালেও যদি কেহ এই গ্রন্থ পাঠ করেন তবে তাহার সময়ের একান্ত সদ্ব্যবহারই করা হইবে। বিজ্ঞানশাস্ত্রের পুস্তক 'পদার্থ বিদ্যা' প্রচারিত তত্ত্বের দিক দিয়া সেকেলে হইয়া পড়িয়াছে সত্য কিন্তু রচনাগুণে উহা সুপাঠ্য রহিয়াছে।

অক্ষয়কুমারের রচিত 'ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়' নামক মহাগ্রন্থের ১ম ও ২য় ভাগ যথাক্রমে ১৮৭০ ও ১৮৮২ অব্দে প্রকাশিত হয়। ইহা উইলসন সাহেবের Religious Sects of the Hindus নামক পুস্তকের আদর্শে লিখিত হইলেও এগ্রন্থে অক্ষয়কুমার অনেক নূতন তথ্য এবং মতামত সন্নিবেশ করিয়াছেন। বেদ, বেদান্ত, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র আদি শাস্ত্র আলোচনা করিয়া ভারতীয় আর্য্যগণের ধর্ম্মকর্ম্মাদির যে বৃহৎ ও উপাদেয় বিবরণ তিনি ঐ গ্রন্থের উপক্রমণিকারূপে রচনা করিয়াছেন তাহা তাঁহার শ্রমশীলতা এবং প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মূল গ্রন্থখানি তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ নিচয় হইতে সঙ্কলিত ও পুনর্লিখিত। উপক্রমণিকা রচনার সময় তিনি নিদারুণ শিরোরোগ-গ্রস্ত হইয়া শয্যাগত

ছিলেন। ইহা সত্ত্বেও তাঁহার পুস্তক প্রকাশিত হইবামাত্র সমসাময়িক পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট সাধুবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুবিখ্যাত ম্যাক্সমূলারও অক্ষয়কুমারের এই গ্রন্থের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

'উপাসক সম্প্রদায়' প্রকাশিত হইবার পরে তিনি 'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার' নামে এক গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন কিন্তু গ্রন্থ সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ১৮৮৬ অব্দের মে (১২৯৩ বাঙ্গলা সনের ১৭ই জ্যৈষ্ঠ) তাঁহার আত্মা অমরধামে প্রস্থান করে। পরে এই পুস্তক তাঁহার মৃত্যুর পরে তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র ৺রজনীনাথ দত্ত মহাশয়ের সম্পাদকতায় সমাপ্ত ও প্রকাশিত হয়।

অক্ষয়কুমারের প্রবর্ত্তিত গদ্যরীতির প্রধানগুণ ইহার আন্তরিকতা এবং সমুন্নত ওজস্বিতা। কোন লেখকের রীতি হইতে তাঁহার স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। অক্ষয়কুমারের রচনাবলী পাঠ করিলে মানস চক্ষের সম্মুখে এক অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেমী এবং পরমোৎসাহী সংস্কারকের মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় এই যে অক্ষয়কুমারের জীবদ্দশাতেই দেশবাসী তাঁহার সমাদর করিয়াছিল। তাঁহার পুস্তকাবলীর এত বহুল প্রচার হইয়াছিল যে তিনি সেই সকলের আয় হইতে জীবনের শেষ কুড়ি পঁচিশ বছর বিশেষ সমৃদ্ধি ভোগ করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু এই অর্থ তিনি আত্মসুখ বিধানে ব্যয় করেন নাই। নিজে তালি দেওয়া জুতা জামা প্রভৃতি ব্যবহার করিতেন অথচ দুঃখীর দুঃখ দূর করিতে এবং সর্ব্ব-বিধ সদনুষ্ঠানের জন্ত প্রার্থীর প্রার্থনার অতিরিক্ত চাঁদা দিতে অক্ষয়কুমার সর্ব্বদা মুক্ত হস্ত ছিলেন। এবং তিনি উপার্জ্জিত অর্থের প্রায় একচতুর্থাংশ দরিদ্র-সেবায় ও সাধারণ হিতার্থে দান করিয়া গিয়াছেন।

বালিগ্রামে শোভনোদ্যান' নামক বাগান বাড়ীতে অক্ষয়কুমার শেষজীবন অতিবাহিত করেন। ইহা ক্ষুদ্র হইলেও সেকালে ছোট বোটানিক গার্ডেন নামে খ্যাত ছিল। নানাদেশ হইতে আনীত এত বিচিত্র গাছগাছড়ার সংগ্রহ আর কোন ব্যক্তির বাগানে ছিল না। এই সকলই ছিল অক্ষয়কুমারের বিলাসিতার উপকরণ। উঁহার গৃহসজ্জা ছিল প্রস্তরীভূত জীব জন্তু ও শঙ্খ শম্বুক এবং চিত্ত বিনোদনের উপায় ছিল রাসায়নিক ও আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা। বাল্য-কালের অভ্যাসমত তিনি বৃদ্ধবয়সে কতিপয় কাককে নিজ আহার্য্যের অংশ দান করিয়া আনন্দলাভ করিতেন। ছাত্রাবস্থায় মহাকবি হোমার রচিত ইলিয়াড কাব্যের ইংরেজী অনু-বাদ পড়িয়া অক্ষয়কুমার জানিতে পারেন যে গ্রীসও এক সময়ে ভারতবর্ষের মত বহু দেবমূর্ত্তির পূজা করিত। শিক্ষকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, গ্রীস এখন একেশ্বরবাদী এবং এক সময়ে গ্রীসবাসিগণ যে সকল দেবতার ভয়ে সশঙ্ক ছিল সেই দেবতারা এখন যাদুঘরে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন। তখন হইতে অক্ষয়কুমার প্রতিমা পূজায় বিশ্বাস হারাইয়া-

ছিলেন। এই ঘটনার কয়েকবৎসর পরে 'তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্পর্শে আসিয়া তিনি ব্রাহ্ম মত গ্রহণ করেন। ইহার পরে পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ব পাঠ এবং কঠোর বিচার বুদ্ধির পরিচালনার ফলে তত্ত্বান্বেষী অক্ষয়কুমার কতকটা অজ্ঞেয়বাদী (agnostic) হইয়া পড়েন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার জীবনের উপর দেবেন্দ্রনাথ পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজের যে প্রভাব পড়িয়াছিল তাহা হয়ত শেষ পর্যন্ত মুছিয়া যায় নাই এ প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার অকৃত্রিম গুণগ্রাহী ও উৎসাহদাতা ছিলেন এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার ফলেই অক্ষয় কুমারের অসামান্য সাহিত্যিক প্রতিভা লোক চক্ষুর গোচরীভূত হইয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের উপরেও অক্ষয়কুমারের প্রভাব সামান্য নহে। দেবেন্দ্রনাথ যে শেষ পর্যন্ত বেদের অভ্রান্তত্ব বিষয়ে বিশ্বাস পরিত্যাগ করেন তাহার প্রধান প্রেরণা আসিয়াছিল অক্ষয়কুমার হইতে। ইহাই অক্ষয়কুমারের মনীষার এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে সমাজতত্ত্বিক অনুসন্ধান

ডাঃ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

(সংস্কার যুগে রাষ্ট্রতত্ত্ব)

এক্ষণে আমাদের অনুসন্ধানের বস্তু হচ্ছে যে তখনকার কালের (সংস্কার যুগে) রাষ্ট্রতত্ত্ব। হালের ভারতবাসী জনসাধারণের কাছে বহুকালের যথেচ্ছাচার শাসন ও পরাধীনতার ফলে এই ধারণাই হয়ে গেছে যে ভারতবাসীরা চিরকালই খামখেয়ালী, স্বেচ্ছাচারী শাসনের অধীনে বাস করে এসেছে। এই জন্যই আমাদের গল্পে ও গানে প্রভৃতিতে খেয়ালী রাজা বা মন্ত্রী, সহর কোটালদের (নগরপাল) রাজার হুকুম অনুযায়ী হাতীর পায়ের তলায় মানুষকে দলাবার গল্প পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে (সংস্কৃত সাহিত্য) এই সব তথ্য এখন আবিষ্কৃত হচ্ছে যে প্রাচীন আর্য্য কৌম (tribes) গুলি democratic republic (সাম্যবাদীয় গণতন্ত্র) রাষ্ট্রের অধীনে বাস করতো। কুরু-পাঞ্চাল, যদু প্রভৃতি কৌমগুলি এইপ্রকারের oligarchical republicএর [মুষ্টিমেয় ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত সাধারণতন্ত্রের) অধীনে ছিল। কুরুদের ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু প্রভৃতি tribal সর্দার ছিলেন।, যাদবদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ,

উগ্রসেন, উদ্ধব প্রভৃতি এই প্রকার tribal head (কৌমনায়ক) ছিলেন। ইহাদের "লোকেশ্বর" বলা হতো (১)। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ৮১ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে, শ্রীকৃষ্ণকে যাদব সঙ্ঘের একজন সঙ্ঘমুখ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার যে রাষ্ট্রে রাজা থাকতো সেখানে তিনি জনসাধারণের দ্বারা নির্ব্বাচিত হতেন (২)। জয়সোয়াল বলেন, হিন্দুরাজত্বের শেষ সময় পর্য্যন্ত রাজারা 'Constitutionally' (আইনতঃ) যথেচ্ছাচারী ছিল না। যে রাষ্ট্রে রাজপদ বিবর্ত্তিত হয়েছিল জনসাধারণের নেতৃত্বে অভিষেক ক্রিয়া অনুষ্ঠান দ্বারা রাজা অভিষিক্ত হলে জনসাধারণের সমিতি, সঙ্ঘ প্রভৃতি দ্বারা রাজার রাজশক্তি পরিচালনা গণ্ডীভূত হতো। The king thus became a constitutional monarch only exercising authority limited by the law.") আবার ব্রাহ্মণ, পুরাণ প্রভৃতি পুস্তকে এবং রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্যে পুরোহিতদের দ্বারা অনেক স্বেচ্ছাচারী রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করাবার কথা আছে। অপরদিকে প্রাচ্যে একরাষ্ট্রের (৩) (monarchyর) উদ্ভব হয়। মগধে আমরা প্রথম সাম্রাজ্যের বীজ বপন হ'তে দেখি। ব্রাহ্মণ সমূহে প্রাচ্যের সম্রাটদের কথা উল্লেখ আছে। আবার মিথিলার রাষ্ট্রপরিচালক বা রাজা প্রজাদের পিতা রূপে বিবেচিত হতেন। এই জন্যে তাঁদের 'জনক' উপাধি দেওয়া হতো (৪) আবার বুদ্ধের সময়ে আমরা দেখি হিমালয়ের সানুদেশে ক্ষত্রিয় কৌমগুলি সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে tribal oligarchy প্রতিষ্ঠিত করেছে; কপিলাবস্তুতে ইক্ষাকুবংশীয় শাক্যেরা তাহাদের মধ্যে অন্যতম। উত্তর বিহারের লিচ্ছবি, বিদেহ, প্রভৃতি ক্ষত্রিয় কৌমগুলি (জন) সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে Vajjian Confideracy (ভজ্জীয়দের সঙ্ঘ) প্রভৃতির প্রতিষ্ঠিত করার সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা ছাড়া আমরা মল্ল, কলীয় এই ভজ্জীয়ের ও সংবাদ পাই যাহারা আটটি কুলের (clan) সমবায়ে গঠিত। এদের মধ্যে মিথিলার বিদেহরাই ছিল প্রধান। এই অঞ্চলে এই বিদেহ ছাড়াও অন্যান্য কুলরাষ্ট্র ছিল—যেমন, ভগগ, বুলি, কলম, কোলিয়, শাক্য (কপিলাবস্তু) এবং পিপ্পলিবনের মরীয়রা। এই কুলরাষ্ট্রীয় ক্ষত্রিয়দের মধ্যে শাক্য কুলে ধর্মসংস্থাপক গৌতমবুদ্ধের এবং জ্ঞাত্রিক বংশে মহাবীরের জন্ম হয়।

এই কৌমগুলির মধ্যে লিচ্ছবি, মল্ল প্রভৃতিকে পরের যুগে মনু "ব্রাত্য" বলেন (মনু—

(১) Dr. Narayan Bandopadhyaya Development of Hindu Polity and Political Theories. Part I, p. 198.

(২) Jaysawal, Hindu Polity—and Dr, Naran Bandopadhya's—Development of Hindu Polity and Political Theories, Part II,

(৩) Ibid, Part I p. 161 (৪) Ibid, p. 162.

(৫) Buddhist Suttas, Sacred Book of the East, Vol XI p. 31.

অধ্যায় ১০। ২২ শ্লোক)। তিনি বলছেন, ক্ষত্রিয়বর্ণের ব্রাত্য থেকে ঝল্ল, মল্ল, লিচ্ছবি, নট, করণ, খস এবং দ্রাবিড় প্রভৃতি জাতির উৎপত্তি হয়েছে (মনু ১০।২০)। পুনরায় তিনি বলছেন, যে সব সবর্ণাস্ত্রীতে উৎপন্ন দ্বিজদের সন্তানগণ সাবিত্রী (দ্বিজত্ব প্রাপ্তির দীক্ষা) গ্রহণ করেনি তারাই ব্রাত্য। এই ব্রাত্যদের নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণেরা ঘৃণা করতো। তাদের সংবাদ এই যে কপিলাবস্তু থেকে উত্তরবঙ্গ পর্য্যন্ত ব্রাত্য ক্ষত্রিয়দের গণরাষ্ট্র ছিল। এই ব্রাত্যদের মধ্যে লিচ্ছবিদের নাম ইতিহাস প্রসিদ্ধ হয়। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে লিচ্ছবিদের নাম পাওয়া যায়। সমুদ্র গুপ্ত যখন সসাগরা ভারতের সম্রাট হন তখন তিনি গর্ব্ব করে "লিচ্ছবি তনয়া সুত", ব'লে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন। বুদ্ধের জীবন চরিতের মধ্যে লিচ্ছবিদের কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। মহাপরিনির্ব্বাণ সুত্তে উল্লেখিত আছে যে বুদ্ধ যখন তাঁহার জীবনকালের শেষদিকে বৈশালীতে আসেন এবং অম্বাকালী প্রদত্ত "আম্রকাননে" অবস্থান করছিলেন তখন লিচ্ছবী প্রধানেরা এই সংবাদ পেয়ে বুদ্ধদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। এই পুস্তকে এই কথা বর্ণনা আছে যে তাহার উত্তম রথে আরোহণ করে বৈশালীতে (বেশালী) আসেন। তাদের মধ্যে কাহারও কাহারও গায়ের রং নীল (দীঘনিকায়, ২য় খণ্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা)। রিজ ডেভিস এই 'নীল' শব্দের ভাষান্তর করেছেন "dark", তাদের পোষাক এবং গাড়ীর রং ছিল নীল। তাদের গাত্রবর্ণ মলিন (dark), পোষাক ও অলঙ্কারও মলিনবর্ণের (dark), কতকগুলির গায়ের রঙ ফরসা (fair) এবং উজ্জ্বল বর্ণের পোষাক ও অলঙ্কার পরিধান করেছিল। কতকগুলির গায়ের রঙ ছিল লাল এবং লাল পোষাক ও অলঙ্কার পরেছিল। কতকগুলির গায়ের রঙ ছিল শ্বেত এবং তারা সাদা পোষাক ও অলঙ্কার পরেছিল।

লিচ্ছবিদের এই বিভিন্ন রকমের গায়ের রঙ ও পোষাক দেখে Senart ও ডাঃ লাহা প্রভৃতি মনে করেন যে লিচ্ছবিরা সম্ভবতঃ বিভিন্ন কুলে বিভক্ত ছিল এবং এই বিভিন্ন রঙের পোষাকের দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে পৃথকীকৃত হতো। (৫) এই প্রকারে পৃথিবীর অনেক স্থলেই একই জাতির মধ্যে বিভিন্ন কুল, বিভিন্ন বেশের দ্বারা নিজেদের পৃথক পৃথক ভাবে চিহ্নিত করতো। যথা স্কটল্যাণ্ডে পুরাকালের হাইল্যাণ্ডারদের মধ্যে প্রত্যেক কুলই (Clan) মাথারটুপি (cap) ও পরিধেয় বস্ত্র (tartan) বিভিন্নতার দ্বারা পরস্পরের মধ্যে পৃথকীকৃত হতো। আর আমরা পূর্ব্বে দেখিয়েছি যে, বৈদিকযুগে ব্রাহ্মণ কুলগুলি শিখা ও পরিধেয় বস্ত্রের রঙের দ্বারা পৃথকীকৃত হতো। লিচ্ছবিদের বিষয়ে আর একটু বলবার আছে—ভিনসেণ্ট স্মিথ বলেছেন লিচ্ছবিদের মধ্যে সে সময়ে মৃতদেহকে বর্বা অন্ধ

(৫) Dr. Bimala Charan Law, Kshatriya Clans in Buddhist India p, 64,65.

জন্তু দ্বারা আহার করার প্রথা এবং তাহাদের আইন তিব্বতীদের সঙ্গে মেলে এইজন্য Vincent Simth (৫'ক) তাদের 'তিব্বতী' জাতীয় বলে নির্দেশ করেছেন।

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (৫খ) স্মিথের প্রত্যুত্তরে বলেন লিচ্ছবীরা পারস্যদেশের নিসিবি থেকে ভারতে ও তিব্বতে এসেছিল। এইজন্য তাহারা পারসীদের মত মৃতদেহকে জন্তুদ্বারা আহার করাতো। তিনি আরও বলেন ১০০ খৃঃ অঃ বাঙ্গলার বরেন্দ্র দেশে সিংহ নামে একটি লিচ্ছবী রাজা রাজত্ব করতেন। কিন্তু আমরা দেখি যে শবকে সমাহিত করার প্রথা বেদেই উল্লিখিত আছে।

প্রাচীনকালের আর্য্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারে শবকে সংকারের প্রথা প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে একটি প্রথা ছিল যে মৃতদেহকে লোষ্ট্র প্রস্তরের মত দূরে কোনস্থানে নিক্ষেপ করে পশু পাখীদের দিয়ে খাওয়ান হতো। (অথর্ব্ববেদ ১৮।২।৩৪ দ্রষ্টব্য) (৫গ)। এই সব কারণবশতঃ আমাদের মনে হয় যে লিচ্ছবিরা ভারতীয় কৌমের লোক ছিল এবং তাহারা ভারতীয় ক্ষত্রিয়বর্ণেরই লোক ছিল। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাহাদের যে সব অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান দেখে বিদেশীয় পণ্ডিতেরা তাহাদের অভারতীয় বোদ্ধের লোক বলে মনে করেন, অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে এই সব অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান ভারতীয় আর্য্যভাষী বৈদিকধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং কোন কোন প্রতিষ্ঠান (বহুস্বামিত্ব) এখনও হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত আছে। এই জন্যে লিচ্ছবিদের এই প্রকার রীতিনীতি দেখে আশ্চর্য্য হয়ে তাহাদের অভারতীয় বলে মন্তব্য প্রকাশ করা ভুল।

বুদ্ধ ও মহাবীর বর্দ্ধমান যখন মগধে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়কার জৈন ও বৌদ্ধ বৃত্তান্ততে আমরা এই সংবাদ পাই যে শৈশুনাগ রাজবংশ মগধের রাজধানী রাজগৃহে রাজত্ব করছিলেন। তখন গিরিব্রজপুর পরিত্যক্ত হয়ে কিঞ্চিৎ নিম্নে সমতল ভূমিতে রাজগৃহ নামক স্থানে রাজধানী স্থাপিত হয়েছে। এই সময় মগধ প্রতাপশালী হয়ে আশপাশের রাষ্ট্রগুলি বিধ্বংস করে সাম্রাজ্য স্থাপনের পথে অগ্রসর হতেছিল। এই যুগেতে মগধ অঙ্গকে গ্রাস করেছে এবং উপনিষদের অজাতশত্রু ও জাতকমালার ব্রহ্মদত্তদের রাষ্ট্র কাশী কোশলের

---

৫ (ক) Vincent Smith—"Tibetan affinities of the Lichchavis" in Indian Antiquary—1903 No,—30 : 233—235.

৫ (খ) Satish Ch. Vidyabhusan—"Pansian origin of the Lichchavis." Indian Antiquary March 1908

৫ (গ) অথর্ব্ববেদ (১৮।২।৩৪)—টীকাকারের মতে যেখানে 'পরাস্তা' অর্থ হচ্ছে—দূরদেশে কাষ্ঠবৎ পরিত্যক্ত। একথায় শবকে দূরে নিক্ষেপ করা বুঝায়। আবার এই বিষয়ে বৃহদারণ্যক উপনিষদ (৩ অধ্যায়, ব্রাহ্মণ ৯।২৮) দ্রষ্টব্য।

অন্তর্গত হয়েছে এবং পরে ইহা মগধের বিম্বিসারের অধীনে আসে। বুদ্ধ পরলোক গমনের কিঞ্চিৎ পরেই কোশলের রাজা বীডুড় শাক্যদের নির্ম্মূল করে, আর মগধ লিচ্ছবি রাষ্ট্র করায়ত্ত করে। ক্রমশঃ কোশল ও অবন্তি মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়। ভারতের ইতিহাসে আমরা এই দেখি যে ভারতে পূর্ব্ব দেশেই একরাটত্ব অর্থাৎ সার্ব্বভৌমিক সাম্রাজ্য স্থাপন আরম্ভ হয়। শৈশুনাগদের পতনের পর যখন নন্দবংশ মগধে রাজত্ব করছিল তখন শেষ নন্দের সময়েই আলেকজাণ্ডারের অভিযান হয়।* এই সময় কুসুমপুর অর্থাৎ পাটলীপুত্রে মগধের রাজধানী স্থাপিত ছিল। বুদ্ধের সময়েতেই এই নগর স্থাপিত হয়। ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন যে উত্তরে লিচ্ছবি প্রভৃতি প্রবল কৌমদের আটক করিবার জন্যই মগধরাজ পাটলীপুত্র নির্ম্মাণ করেন। বৌদ্ধপুস্তকে লিখিত আছে যে বুদ্ধ নাকি এই সহরের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণী করে বলে গিয়েছিলেন যে এই স্থান হতেই তাঁর ধর্ম্ম চারিদিকে প্রচারিত হবে। আলেকজাণ্ডার যখন পাঞ্জাব অভিযান করেন সেই সময়কার বিবরণীতে আমরা এই সংবাদ পাই যে মগধের রাজা নন্দ তখনকার অতি প্রতাপশালী ভারতীয় রাজা। তার রাজত্ব পশ্চিমে পাঞ্জাবের জলন্ধর হতে আরম্ভ করে পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। গ্রীক লেখকগণ তাহাকে প্রাচ্য (Prassii) ও গঙ্গাড়ীদের (Gangaride) দেশের রাজা বলে বর্ণনা করেছেন। এই সময়ই নন্দবংশজাত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যনামে এক জারজপুত্র আলেকজাণ্ডারের শিবিরে উপস্থিত হন। তিনি নন্দের বিপক্ষে আলেকজাণ্ডারের সাহায্যপ্রার্থী ছিলেন। শশীগুপ্ত (৬) নামে একজন মধ্য এশিয়ার হিন্দু কৌমের লোক আলেকজাণ্ডারের সৈন্যদলে ঢুকে মধ্য এশিয়ায় তাহার তরফে লড়াই করছিলেন। তৎপর তক্ষশীলার রাজা অম্ভীও আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে যোগদান করেন, আবার পুরুরাজ পরাজিত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করেন। শেষে পলাতক চন্দ্রগুপ্ত যে যাঁ বিদেশী বিজয়ীর শরণাগত হন, ইহার কাছথেকে এবং অন্যান্য সংবাদ সংগ্রহ করে আলেকজাণ্ডার বুঝিলেন যে নন্দ অতি প্রতাপশালী রাজা, তাহার ছয় লক্ষ পদাতিক ও বহু সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য প্রভৃতি আছে ; চন্দ্রগুপ্ত বিজেতাকে বলেন যে রাজা নন্দ আসলে জারজ এবং নাপিতপুত্র, সেই জন্য জনসাধারণের প্রিয় নহেন। পুরাণের মতে নন্দবংশের স্থাপয়িতা মহাপদ্ম শেষ শৈশুনাগ রাজার ঔরসে এক শূদ্রাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিল। মহাবোধি বংশানুসারে ইহার নাম ছিল উগ্রসেন, আবার জৈন জনশ্রুতি অনুসারে ইনি একজন নাপিত ছিলেন এবং রাণীর প্রিয়পাত্র হয়ে রাজাকে হত্যা

(৬) গ্রন্থকার প্রণীত—"ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের দুপ কথা।" Academy of History হইতে প্রকাশিত। এই নামটী গ্রীকদের দ্বারা হয়েছিল বলেই তাহার পাঠোদ্ধার এতদিন হয় নাই। ইনি যোধকর হিন্দুকুশ পর্ব্বত মালার উপরিস্থিত কোন হিন্দুকৌমের লোক ছিলেন।

করে সিংহাসনে বসেন। কিন্তু মুদ্রারাক্ষস নাটকে নন্দদের উচ্চবংশ বলেই বলা হয়েছে। যাহা হউক পুরাণ অনুসারে নন্দরা একরাট এবং একচ্ছত্র ছিলেন। কোন প্রাচীন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক বলে গেছেন, আলেকজাণ্ডারের ভারত ত্যাগের মূলে হচ্ছে নন্দের পরাক্রম শ্রবণে তাহার মনে ভয়ের সঞ্চার। পুরুরাজের লড়াইয়ের বহর দেখে এবং তৎপর নন্দের মহাপরাক্রম শ্রবণ করে প্রবীন মেসিডোনীয় সৈন্যেরা ভড়কে গিয়েছিলেন। সেইজন্য তাহারা আর অগ্রসর হতে অস্বীকার করে। আমাদের মতে ভারতের উষ্ণ ঋতুর প্রকোপ সহ্য করতে না পেরে তারা প্রত্যাবর্ত্তন করেছিল এ একটা বাজে গুজব মাত্র। ইজিপ্ট, ব্যাবিলন ও দক্ষিণ পারস্যের গরম ভারত অপেক্ষা বেশী হতে পারে কিন্তু কম নয়। অধ্যাপক মহাফী বলে "পারস্য সম্রাটের পশ্চিম এশিয়ার লোক থেকে সংগৃহীত সৈন্যদের পরাজয় যত সহজ লভ্য হয়েছিল, পূর্ব্ব ইরাণ এবং ভারতের আর্য্যজাতীয় যোদ্ধাদের জয় করা আলেকজাণ্ডারের তত সহজ হয়নি," আবার অধ্যাপক গ্রোট (৮) বলেন, "পুরুরাজকে বন্দী করাই আলেকজাণ্ডারের প্রথম সফলতা" (অবশ্য পুরুরাজ স্বেচ্ছায় আলেকজাণ্ডারের শিবিরে এসেছিলেন)।

এখন আমাদের বুদ্ধের যুগে প্রত্যাগমন করা যাক। * বৌদ্ধ পুস্তকে লিখিত আছে যে অজাতশত্রু পিতৃহন্তা ছিলেন এবং তাহার বংশে চার পুরুষ পিতৃহন্তারকেরা সিংহাসন পেয়েছিল। + বৌদ্ধ পুস্তকে একটা গল্প আছে যে একবার রাজগৃহে কাষ্ঠনির্ম্মিত রাজপ্রাসাদে ধুপধাপ আওয়াজ হতে থাকে, দৈবজ্ঞেরা রাজাকে বলেন যে তাহার পিতৃপুরুষের প্রেতেরা পিণ্ডের জন্য এইসব উৎপাত করছে। এই গল্পেতে আমরা এই সংবাদ পাই যে রাজপ্রাসাদও কাষ্ঠনির্ম্মিত হত, আবার মেগাস্থিনিশও বলে গেছেন যে পাটলীপুত্রে চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদও কাষ্ঠনির্ম্মিত ছিল (এই প্রাসাদের ভিত্তি এখন ভূগর্ভ খনন করে আবিষ্কৃত হয়েছে)। এই ভিত্তির নিদর্শন স্বরূপ শালকাষ্ঠ এখনও দেখতে পাওয়া যায়, এই জন্যই ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন, যে আলেকজাণ্ডারের অভিযানের পূর্ব্বে ভারতীয়েরা প্রস্তর বা ইষ্টকের বাড়ী নির্ম্মাণ করতে জানত না (কিন্তু সিন্ধুদেশে মোহেনজোদাড়ো ও পাঞ্জাবের হারাপ্পাতে আবিষ্কৃত ইষ্টকনির্ম্মিত সহর ইউরোপীয়দের উক্তিকে মিথ্যা প্রমাণিত করছে) আশ্চর্য্যের কথা এই যে বুদ্ধের সময়েই উত্তর ভারতের পূর্ব্বভাগে প্রথম ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের সূচনা হয়। তাহার প্রায় দুশো বৎসর পরেই নিখিলভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। ইহার উত্তর পশ্চিম সীমা ছিল পারস্যের পূর্ব্বপ্রান্ত। আমরা বৈদিক যুগ থেকে বুদ্ধের যুগ পর্য্যন্ত ভারতে গণরাষ্ট্রের (Republic)

(৮) Grote History of Greece.

* 'সুমঙ্গলবিলাসিনী' ১ম খণ্ড ১৩৪—১৩৭ পৃঃ;

+ "মহাবংশ" ৪র্থ অধ্যায়

সংবাদ পেয়েছি। কিন্তু 'একচ্ছত্র' সাম্রাজ্যের বিবর্ত্তন পূর্ব্ব ভারতেই হয়েছে। এই অনুষ্ঠান নিয়ে পণ্ডিতের মধ্যে অনেক গবেষণা আছে। পাঞ্জাবের (১) অথবা কুরু বা পাঞ্চালের বৈদিক বা আর্য্য কৌমদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানটার অভিব্যক্তি না হয়ে পূর্ব্বের পতিত ব্রাত্যদের মধ্যে হ'তে কেন ইহার বিবর্ত্তন হল, তাহাই ঐতিহাসিকদের গবেষণার বস্তু হয়েছে। আবার বুদ্ধ সাম্যবাদই প্রচার করে গিয়েছিলেন! তাহার রাজনৈতিক আদর্শ তাহার স্বজাতীয়দের আদর্শের বাইরে যায় নাই অর্থাৎ গণ সাম্য ছিল। অথচ বৌদ্ধ ও জৈনদের প্রচার কেন্দ্রের স্থলেই এবং পতিত 'ব্রহ্মবন্ধু' ও 'ক্ষত্রিয়বন্ধু'দের দেশেই প্রথম সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। প্রথম নিখিল ভারতীয় সাম্রাট ছিলেন একজন শূদ্র ইহাই আশ্চর্য্যের কথা!

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দের চিঠি

১১, ইডেন হসপিটাল রোড
জুন ৬ই ১৯২৫—কলিকাতা

স্নেহের—

বহুদিন পরে তোমার পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম! তোমরা ভাল আছ শুনিয়া সুখী হইলাম। তুমি লিখিয়াছ যে দিন দিন সংসারে জড়াইতেছ এবং জপ ইত্যাদি করিবার সময় পাও না। তুমি হাতে কাজ করিবে এবং মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করিবে। এবং জানিবে যে এই সংসার তোমার নয় ভগবানেরই সংসার। তাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। তোমার ছেলের সেবা করিবার সময় নারায়ন বুদ্ধি করিয়া সেবা করিবে। রাত্রে শুইবার সময় সমস্ত দিনের কর্ম্মফল ভগবানের পাদপদ্মে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবে এবং সর্ব্বদাই তাহার নিকট ভক্তি বিশ্বাসের জন্য প্রার্থনা করিবে। এইরূপ সংসারে থাকিলে শান্তি ও আনন্দ পাইবে। নচেৎ সংসার দুঃখ কষ্ট ও শোকে পরিপূর্ণ। ইহাতে মানুষ যে সুখ পায় তাহা অত্যন্ত অল্পক্ষণ স্থায়ী। মানুষ যাহা চায় তাহাই পায়। তুমি যাহা চাহিয়াছিলে তাহাই পাইয়াছ। আবার যখন ঠিক ঠিক ভাবে ভগবানকে চাহিবে তখন তিনি সংসারের সব জিনিষ উল্টে পাল্টে দিয়া তোমাকে দেখা দিবেন। কিন্তু তোমার মায়া মমতা যতদিন

(১) হরপ্রসাদ গ্রন্থমালা প্রথম ভাগ ও N. C. Banerjee Hindu polity and Political Theories.

প্রবল আছে ততদিন তুমি ভগবান্‌কে প্রাণের সহিত ঠিক ঠিক চাহিতে পারিবে কি? ভগবান সকলের বাঞ্ছাকল্পতরু, তিনি যে যাহা চায় তাহাকে তাহাই দেন। তুমি খোকা চাহিয়াছিলে—খোকা পাইয়াছ এক্ষণে তাহা লইয়া সন্তুষ্ট থাক।

তোমরা সকলে আমার শুভাশীর্ব্বাদ লও। ইতি— আশী:

অভেদানন্দ

সঙ্ঘবার্ত্তা

সরস্বতী পূজা—গত ১৯শে মাঘ ১লা ফেব্রুয়ারী অবৈতনিক উচ্চপ্রাইমারী বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবীর অর্চনা করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, অঞ্জলিপ্রদান ও প্রসাদ বিতরণ হইয়াছিল।

অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত বঙ্কিম বিহারী দাসের ছাত্র বৃন্দ লাঠি, ছোরা ও যুযুৎসু ও শ্রীযুক্ত রাজেন গুহঠাকুরতার ছাত্র শ্যামসুন্দর চট্টোপাধ্যায়, রবীন চট্টোপাধ্যায়, নানাপ্রকার শারীরিক ব্যায়াম, ভারোত্তলন, পেশী সঞ্চালন প্রদর্শন করিয়া সমবেত দর্শক ও ছাত্রগণকে আনন্দ দান করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উৎসব—গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৬ই ফাল্গুন শুক্রবার ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ষড়ধিকশততম জন্মতিথি উৎসব, কলিকাতাস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

এই উৎসব উপলক্ষে কাশীপুর শ্মশানে শ্রীমৎস্বামী অভেদানন্দজীর সমাধি মন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন হইয়াছে। ঐদিন কাশীপুর শ্মশানে বিশেষ পূজা ও কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের প্রেসিডেণ্ট শ্রীমৎ স্বামী চিৎস্বরূপানন্দজী ভিত্তি স্থাপন করেন।

মঠে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় বিশেষ পূজা হোমাদি হইয়াছিল। প্রায় দুই-সহস্র ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। ১০টায় সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণলীলা কথকতা করেন। অপরাহ্নে সলিসিটার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র নাথ মিত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী আলোচিত হয়। রাত্রে কীর্ত্তন কলানিধি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র চন্দ্র বসু মহাশয় তাহার সুললিত কণ্ঠে মাথুর কীর্ত্তন করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন।

দার্জ্জিলিং—গত ১৬ই ফাল্গুন শুক্রবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শুভ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এবার অন্যান্য বৎসরের চেয়ে অনেক অধিক লোক উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রায় ১৫০০ লোক প্রসাদ পাইয়াছেন। নানাস্থান হইতে অপ্রত্যাশিত ভাবে সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ মৌলিক মহাশয় উৎসব উপলক্ষে অর্থ দিয়া ও অন্যান্য নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

LIFE OF MAHAMMAD

Swami Abhedanada

Nearly six hundred years after the advent of the glorious son of Man, the Divine powers of the Lord were again manifested in the world through the great prophet of Arabia, the founder of Islam.

He was born in Mecca, the capital of Arabia in the sixth century A. D. Arabia is a peninsula about 400 miles long, washed by the Red Sea and the Gulf of Suez on the west, the Indian Ocean on the south, the Persian Gulf and the Gulf of Oman on the east, and bounded on the north by a portion of Syria. It is a country covered by a vast sandy desert execpting the sea coasts, where green valleys with high mountains and scanty vegetation were at first inhabited by nomadic Arab tribes. Very little of Arabia was known to the civilized world before the time of Mahammed. The Arab themselves knew of nothing beyond their own desert. These tribes claimed their descent from the family of Abraham, lived in small villages along the coasts, roame over the peninsula from place to place upon camels, carrying on a caravan trade among different tribes and speaking the same language; but each tribe enjoyed independence under a crude patriarchal government by its chief. The Arabs were impetuous, restless, lawless, and warlike in their nature.

Pliny says "The Arabian tribes are equally addicted

to theft and to merchandise: the caravans that traverse the desert are ransomed or pillaged; and their neighbours, since the remote time of Job and Sesostries, have been the victims of their rapacious spirit. A single robber, or a few associates, are branded with their genuine name; but the exploits of a numerous band assume the character of lawful and honourable war. The temper of a people, thus armed against mankind, was doubly inflamed by the domestic license of rapine, murder, and revenge. Each Arab, with impunity and renown, might point his javelin against the life of his countryman. "The Arabs were addicted to drinking, adultery and gambling. They had neither social nor religious restrictions to marrage or divorce."

A man used to marry an orphan for her money and leave or illtreat her as soon as he had secured it. A divorced woman was not allowed to remarry, as it was considered a slur upon her husband. Revengeful women would not be remained satisfied until blood was shed. Slaves were treated as beasts of burden. Human sacrifices prevailed in the temples, parents dragged their own sons to the alter and buried the female children to propitiate their bloodthirsty idols.

Well has it been said by Gibbon the historian, "In this primitive and abject state, which ill deserves the name of society, the human brute, without arts or laws, almost without sense or language, is poorly distinguished from the rest of the animal creation."

They had no religion higher than gross idolatry of which the chief seat was Kaaba in Mecca or ancient Macoraba, the capital of Macoraba, (The Greeks gave the name Macoraba). The ancient legend of the Arabs tells us that this Kaaba was the most sacred temple in the

country for it was originally built by Abraham. The story runs thus :—Hager, Abraham's wife, wandering through the desert with her little boy in arms, reached at length the valley of Mecca. She, being extremely thirsty left her son Ishmail crying on the ground and began to search to and fro for water. Ishmail kicked around him in childish passion, and lo ! beneath his feet the spot bubled forth into astream of clear sweet water. This was the famous well Zam-Zam. Amelkites and Arab tribes from Yemen attracted by this fountain settled by there. Ishmail grew up among them and married the daughter of their chief. On a subsequent visit the patriarch Abraham, assisted by his son Ishmail, erected the temple where it now stands and established the ancient rites of pilgrimage.

The direct descendants of Ishmail were known as Korish and they were at first the gaurdians of this temple and of the well. Cossai, a Korish chief, became the priest of Kaaba in the fifth century A. D., held the key of the temple and gave food and drink from the sacred well to the pilgrims who gathered there every year. The pilgrims used to visit the Kaaba to kiss the mysterious stone imbedded in the eastern corner and to make seven circuits round the sacred temple. There were many idols in the Kaaba, the chief of which was Hobal (Hebal). Each tribe had its own idol in the Kaaba, numbering about 360, some were shaped like human beings, others like angels, lions and so on. They were called by different names such as Rahel, Al-Lat, Al-Uzza.

Thus the religion of Mecca at the time of Mahammad's birth was a mixture of idol-worship, stone-worship, and sabeanism or the worship of heavenly bodies. The people were extremely superstitious. They recognized Abraham

as the friend of God, whose name in Arabic was Alla-Tala, the most high God, to whom, gods and idols were subordinate.

The worship of Kaaba satisfied the Arab minds, for it was founded upon the patriarchal traditions common at once to Christianity and Judaism. About this time both the Jews and Arabs were expecting a great prophet among their people. Under such conditions the messenger of Lord Alla-Tala appeared in Mecca to establish true religion and destroy the gross idolatry and superstitions of the Arab tribes.

The prophet of Arabia, was descended from the family of Cossai, the priest of Kaaba and the chief of the Korish tribe of Mecca. His father's name was Abdulla or the servant of God and his mother's name Amina. At the age of 25 Abdulla married Amina, and after staying with her for three days left his wife and went on a merchantile expedition to Gaza in the south of Syria: on his return he suddenly died at Medina bequeathing to his widow five Camels, a flock of goats and a slave girl. This little property and the house where Abdulla dwelt were the inheritance which the prophet of Arabia recieved at his birth.

On the 20th of August, in the year 570 A. D. Amina gave birth to a child who was named Mahammad by his grand-father Ab-dul Mutalib. The meaning of the Arabic word Mahammad is "The praised." According to the Arabic custom, a child of better class was never nursed by its mother. So the infant Mahammad at his birth was made over to a nurse Theuba, the slave girl of his uncle. But After few days another nurse, Halima of the Beni-Sad tribe, took charge of the orphan child.

and nursed him until he was five years old. During this period Mahammad had several attacks of ecstatic trances which created great alarm in the mind of the nurse, but otherwise he was healthy and robust; and learned to speak the purest Arabic of Beni-Sad tribe. In after years Mahammad never forgot the kindness of Halima his nurse; and he often used to say to his people "Verily I am the most perfect Arab among you; my descent is from the Korish and my tongue is the tongue of Beni-Sad."

Mahammad spent the sixth year of his life with his mother at Mecca. Then he accompained her to Medina to see some of her relatives. He stayed with his mother for a month in the house where his father died, saw his grave and then started for Mecca, but on the way his mother fell sick and died and he returned with his nurse to Mecca. This visit left an indelible impression upon the memory of mahammad. The early loss of his mother made him feel lonely and sorrowful. His young mind began to meditate upon the transitoriness of earthly relation; and as he matured this meditative nature became stronger.

His grand-father Abd-ul-Mutalib took the charge of him and treated him with unusual fondness untill 578 A. D.. when he died. The loss of his loving grand-father was a great shock to the young heart of Mahammad, who was then only eight years old. However, the dying grand-father consigned the gaurdianhship of his orphan grand-child to his son Abu-Talib, who faithfully discharged his duty as long as he lived. Abu Talib's fondness for Mahammad equelled that of his father and he treated his nephew as his own child. He kept Mahammad

under his constant supervision and took him wherever he went. When Mahammad reached his twelfth year Abu-Talib started a mercantile expedition to Syria. But the young Mahammad would not be left behind, he must accompany his uncle and so they went together. On this journey they went through several Jewish settlements and came in contact with the Christians of Syria. This gave a great opportunity to Mahammad to learn the manners, customs, ceremonies and religious beliefs of the Jews and the Christians. His keen intellect, governed by a high spiritual tendency, grasped even at this early age, the minute theological differences that exist between the faiths of the Jews and the Christians.

Nothing of importance is mentioned in the life of Mahammad until he was twenty years old. At this time he took part in a battle which was fought by his uncles against the rival chiefs of other tribes. Mahammad however did not fight, but gathered the arrows of the enemy as they fell and handed them over to his uncles. On one occasion, in his youth, he took up the occupation of a shepherd and as he watched the flocks in lonely desert he often felt the presence of the divine power around him and frequently went into ecstatic trances which were natural to him, and thus communed with the supreme. The historians unanimously declare that in modesty of deportment, purity of manners and in moral virtues, the youth of Mahammad was unrivalled among all the inhabitants of Mecca. It was on account of his pure character that his fellow citizens respected and honoured him and gave him the tittle of Al-Amin, the faithful. Thus honoured, Mahammad lived a quiet life in the family of his uncle Abu-Talib, until he was obliged to earn his own

livelihood, for Abu-Talib had a large family and but moderate means.

Mohammad was never covetous of wealth nor did he care for the bustle and anxiety of a merchant life. But forced by pecuniary circumstances and requested by Abu-Talib himself, he accompained the caravan of a wealthy Arab lady Khadiza, of the Korish tribe, and started for Syria.

The reflective mind of Mahammad, who was now 25 years old, found another opportunity to imbibe the tenets and beliefs of the Syrian Christians. He observed the rites and ceremonies of the worship of Mary and Jesus on the Cross. After disposing of the merchandise and buying things which Khadiza, the wealthy widow needed, Mahammad returned with the caravan to Mecca. Historians describe the characteristic features of Mahammad in the prime of youth in the following manner:

"Slightly above the middle size, his figure though spare, was handsome and the chest broad and open; the bones and frame-work large; and the joints well-knit together. His neck was long and finely moulded. His head, unusually large; gave space for a broad and noble brow. The hair thick, jet-black, and slightly curling, fell down over his ear. The eyebrows were arched and joined, the countenance thin but ruddy. His large eyes, intensely black and piercing received additional lustre from eyelashes long and dark, the nose was high and slightly aquiline, but fine and at the end attenuated. The teeth were far apart. A long bushy beard, reaching to the breast, added manliness and presence. His expression was pensive and contemplative. The face beamed with intelligence. The skin was clear and soft. His broad back leaned slightly

forward as he walked and his step was hasty, yet sharp and decided like that of one rapidly descending a declivity. There was something unsettled in his blood-shot eyes which refused to rest upon its object. He was the subject of strong passions; when much excited the vein between his eyebrows would mantle and violently swell accross his ample fore-head, yet he was cautious and circumspect, and in action kept ever aloof from danger. He was generous and considerate towards his friends. His commanding mien inspired the stranger with an undefined and indescribable awe; but on closer intimacy apprehension and fear gave place to confidence and love.

He was resolute and tacitern. His singleness of purpose, strength and fixedness of will and a sublime determination made his people bow before him with awe and reverence. Perceiving the noble and commanding qualities of Mahammad, Khadiza was so charmed and fascinated by the wonderful personality of Mahammad that she desired to marry him and through her sister at once proposed to him. Mahammad agreed and their matrimonial relation was established. This union was a very fortunate and a happy one and within the next ten or twelve years Khadiza bore to Mahammad two sons and four daughters.

It was Khadiza who first recognised the prophetic qualities in the character of her husband and surrendered to him her whole heart, soul and faith.

From this time on Mahammad was taken care of by his wife Khadiza and was thus enabled to live a quiet life spending most of his time in retirement and meditation. When he was about thirty-five years old, an unexpected event occured in his life which created some influence in

the prophetic character of our hero. A violent flood swept down the valley of the neighbouring hills around the city of Mecca, and shattered the walls of the holy temple of Kaaba. The Korish priests fearing the utter destruction of the temple wanted to rebuild the walls and put a roof over the holy spot, which was so long without any cover, to prevent the thieves from taking away the precious relics. But the treasury was low and there was no one to meet the expenses. Suddenly the anxiety of the priests was removed by the news that a Grecian ship was driven ashore by a storm on the Red-Sea near Mecca. The Korish chiefs, hearing the news, went to the shore, purchased the timber of the broken ship, and engaged her captain, a skilful Greek architect, Becum by name, to help in the reconstruction of Kaaba. The foundation and walls were built, but a serious discussion arose regarding the spot where the sacred black-stone should be placed in the wall. On account of the difference of opinion the building was suspended for four of five days. The contention among the Korish preists became hot and was about to end in blood-shed, when an old Arab citizen declared "O Korish, hearken unto me, my advice is that the man who chanceth first to enter the court of the Kaaba by the yonder gate, he shall be chosen either to decide the difference amongst us or himself place the stone." The priests and citizens agreed to this proposal with acclamation and waited for the result. It happened that Mahammad was the first man to enter the gate. Seeing him they all exclaimed, here comes Al-Amin, the faithful; we are content to abide by his decision. Receiving the commission, calm and self-possessed, he tried to conciliate them all by taking off his mantle and spreading it on the ground, placing the stone

thereon and asking the chiefs to raise the four corners of the mantle. As they lifted the stone from the ground by holding the corners of the garment, Mahammad directed them with his own hand to the spot where it should be placed, and there it has stood for the succeeding centuries. The reflective mind of Mahammad at once realised that providence has singled him out to be the judge among his people in such a sacred matter. He felt for the people of Mecca, whose immorality and debasement became almost unbearable to him.

Mahammad's heart was longing for divine revealation and he wanted to know the true religion of God. So he retired to the solitary valleys and caves of mount Hira, about three miles north of Mecca. There he would live in a cave for days at a time, sometimes alone, sometimes with his wife Khadiza. This mountain range is stony and barren and has not one single green spot on it. The scenery was dry and dreary under the tropical sun, consequently there was no external attraction for our hero, but his whole soul was now absorbed in spiritual visions which naturally appeared to him. Sometimes he would remain motionless in ecstasy, sometimes he would burst forth in wild rhapsodical language. Sometimes he would repeat in beautiful Arabic poems with such sentiments: "Verily, the man is in the way of ruin excepting such as possesses faith." Sometimes he would pray for guidance to the Supreme Beings who alone, as he believed, could help him. Sometimes standing alone on the mountain top amid the stillness of death which reigned in the desert, he would repeat: "Praise be to God, the lord of all creations; the most merciful, the most compassionate, Ruler of the day of reckoning. Thee do we worship and invoke for

help. Lead us in the straight path."* No doubt such prayer rising from the sincere and earnest soul of Mahammad reached the throne of the Almighty.

In this manner he passed many years, now struggling for spiritual light, now receiving glimpses of Truth, now overtaken by darkness and doubt, again comforted by spiritual visions. Carlyle writes of Mahammad at this stage of life thus, "A silent great soul, he was one of those who cannot but be in earnest, whom nature herself has appointed to be sincere While others walk in formulae and hearsays, contented enough, to dwell there, this man could not screen himself in formulae; he was alone with his own soul and the reality of things. The great Mystery of Existence, as I said, glared in upon him, with its terrors, with its splendours; no hearsays could hide that unspeakable fact, "Here am I." Such sincerity, as we named it, has in very truth something of the divine. The word of such a man is a voice direct from Nature's own heart. Men do and must listen to that as to nothing else, all else is wind in comparison. From of old, a thousand thoughts, in his pilgrimings of, and wanderings, had been in this man. 'What am I? What is this unfathomable Thing I live in which man name universe? What is life; What is death? What am I to believe? What am I to do?" The grim rocks of mount Hira, of mount Sinai. The stern sandy solitude answered not. The great Heaven rolling silent overhead with its blue glancing stars, answered not. There was no answer. The man's own soul, and what of God's inspiration dwelt there had to answer."

At last, at the age of forty, he received divine ins-

Sura 1, introduction, Al-Fatihat.

piration, and realised that he was the prophet of his people. At this time Mahammad began to repeat verses which came to him as revealations and which were afterwards embodied in the Koran; in beautiful Arabic full of spiritual fire and wisdom, he would repeat them before his wife and friends and relatives. They would listen with attention and (realising that such beautiful verses coming from one who was utterly illiterate, who did not know how to read and write) they would admire the wonderful power that was playing through Mahammad. His first admirers were Khadiza, his wife and his two adopted sons Zeid and Ally and his bosom-friend Abu-Bekr. He felt a tremendous influence that was overwhelming his whole being, but at times he was not sure whether it was from God or some evil-spirits. During these moments of doubt Khadiza was his comfort and consolation. She would comfort him and confirm his faith in the Lord.

At last Gabriel, the messenger of God, appeared before him and approaching within two bow's length, brought from the most High the memorable Sura 96 which begins; "Recite in the name of thy Lord, who that created all things, who hath created man of congealed blood. Recite by thy most benificial Lord; who taught the use of pen; who teacheth man that which he knoweth not Assuredly. Verily, man becometh insolent, because he seeth himself abound in riches. Verily unto thy Lord shall be the return of all. What thinkest thou as to him who forbideth our servent, when he prayeth? What thinkest thou; if he follow the right direction; or command piety? What thinkest thou; if he accuses the Divine revealations of falsehood, and turn his back? Doeth he not know that God seeth? Assuredly. Verily, if he forbear not, we will drag him by

the forelock, the lying, sinful forelock. And let him call his council to his assistance ; we also will call the infernal guards to cast him into Hell. Assuredly, obey him not ; but continue to adore God ; and draw high unto Him."

Thus receiving the Divine commission from the Lord, Mahammad spoke literally in the name of Lord. For this reason every sura in the Koran begins with "Say" or "Recite." Now he became prophet and vicegerent of the Almighty.

But the people of Mecca did not recognise the Divine commission. He was scorned, abused and called by names. The people would treat him as one insane, as a sorcerer, as one possessed by evil-spirits and so on. Mahammad grieved, and dispirited, wearied and perplexed, stretched himself on a carpet covering his body with his garment and went into the trance of ecstasy. Again the angel appeared to him and commanded him to preach saying "Oh thou that are covered, arise and speak and magnify thy Lord."

Thus we see that Mahammad was not only an inspired prophet but was commissioned by the Lord to preach and summon his people to his religion. These visions are described to be as real as the morning dawn. From this time on revealations began to follow one after another until the last moment of his earthly career.

Mahammad's faith in the Lord become unbounded. He would not take one single step in his actions until he had received a direct command from the Above. When the command came the countenance of the prophet used to be troubled and he would fall on the ground senseless or go into a trance. Oftentimes the inspiration would come unexpectedly without giving any previous warning to him. Mahammad himself said when asked : "Inspiration

cometh in one of two ways; sometime Gabriel communicateth the revelation to me as one man to another; this is easy, and other times, it is like the ringing of the bell penetrating my heart and rending me; and this is which afflicteth me the most." It was on account of these violent inspirations that the hair of the prophet prematurely turned grey. All these revealations are termed the Koran or word of God, the literal meaning of the word being "what is read or recited."

At the age of 44 Mahammad became firmly convinced that he was the Prophet of God and all doubt vanished from his mind. Now Mahammad began to preach against Idol-worship and that "There is but one God and Mahammad his prophet." Disregarding the scorn and abuse of his relatives and of the people he went on preaching the truth and succeeded in adding to the small group of his admirers: viz. his wife, his two adopted sons and Abu-Bekar, his friend. There were 40 converts during the first four years; after three years of private preaching and solicitation the prophet made an open call to the Korish at large. But the Korish objected to this call because they were worshippers of the Idol of Kaaba. They thought that their forefather's religion, the worship of Kaaba, the glory of Mecca and the centre of piligrimage from all Arabia was in great danger. So the Korish were determined to crush the new religion of the prophet and force the followers to abandon it. Now terrible persecution began, hostility was excited and acts of violence, commenced. One of the followers of Mahammad retired with a group of believers to a valley near Mecca for prayer and meditation. On the way they met strong opposition from the unbelievers, ending in fight, and then it was that the first blood was shed in Islam by the

prophets follower Sad, who struck a man with a camel's goad.

As time went on, the followers of Mahammad began to increase in numbers and the jealousy and enmity of Korish were extremely aggravated by the success of the new sect. Mahammad himself being protected by his powerful uncle Abu-Talib remained safe and uninjured, but his followers were terribly persecuted. Mahammad then commanded his followers to go to Abysinia; and in the 7th month of the 5th year of Mahammad's mission, eleven of his followers with their wives sailed in flight to Abysinia. This is termed the first Hegira. The korish pursued them in vain.

One of his followers then spoke to the Christian king of Abysinia regarding what Mahammad had done for them. "O King" said he, "We were an ignorant people, we worshipped images, ate dead bodies, were lewd, ill-treated our neighbours, and the strong despoiled the weak of their properties. We were long been in this condition when God sent a prophet to us from amongst our own people, whose noble birth, truthfulness, honesty and righteousness were well known to us. He called us to God, to wroship him and him only, and to leave off adoring the idols and stones before which our father and forefather knelt. He ordered us to obey God alone and not to make anyone His equal. He made it incumbent on us to offer up prayers, to give alms, to fast when not sick or travelling. He commanded us to speak the truth, to give back safe and whole what is entrusted to us by others, to be affectionate to our relations and k nd to our neighbours, to shun wicked acts, licentiousness and bloody quarrels: He told us not to bear false evidence, not to deprive orphans of their

properties, not to impute bad motives or be suspicious of women. We have taken his advice and admonitions to heart, have believed in his truthfulness, have followed all the orders which God has made known to us, and have believed in the unity of God. We abstain from what is forbidden, and confine ourselves to what is permitted.

Our people are infuriated at this change in our belief, thoughts and actions They have persecuted us, and done their best to force us back to the idols, images and wicked acts which we have left. When it became impossible to live among them, and when persecution and torture became unbearable, we left our country, and believing you to be a tolerant king have taken refuge in your dominions.'[1]

In the meantime the revealations continued, and Gabriel appeared to Mahammad giving him all instructions regarding the doctrine of Islam such as the pictures of heaven and hell; of the paradise, the celestial enoyments for the believers, and eternal hell fire for the unbelievers, the resurrection of the body etc.

Now the dispensation of Mahammad was called Islam (surrender of the soul to God) and his followers were named Mussalmans, that is, those who surrender themselves, and unbelievers were termed Kafir. At the age of 50 Mahammad lost his beloved wife Khadiza. So long the prophet was devoted to one wife although poligamy was the prevailing custom of Arabs and a month after this Abu-Talib the uncle and gaurdian of the prophet passed away. He was the prop of his childhood, the guardian of his youth and a tower of defence in his maturity. Now Mahammad was heart-broken. He had lost his best friend

---

[1] Miracle of Mahammad, by Sheikh. H. Kidwai, pp 41-42

and the guardian. From this time on the persecation of the Corish was directed towards the prophet himself.

At the age of 52 Mahammad, in a vision, being guided by Gabriel, his soul soared to the seventh heaven and appeared in the direct presence of the Almighty, who instructed him to pray five times in the day, instead of three. The Corish now plotted against the life of Mahammad; and so he fled to Median in June 622 A..D. arriving there on the 8th day (June 28th)at the age of 53. All of his disciples and followers, numbering about 100 deserted their homes in Mecca and went to Medina with the prophet; This is the 2nd Hegira.

In Medina he bought a place and within 7 months after his arrival built his first mosque or place for worship. It was called the mosque of Friday (Musjid-al-Juma) Friday became the Sabbath for public worship, because Mah ommad held his first service at Medina on Friday. Maho- mmad spent the rest of his life in Medina and many revealations came at this time.

In 630 A. D. The prophet entered into Mecca commanding 10,000 followers armed in battle-array; took possession of the Kaaba, destroyed the idols and triumphantly established the banner of Islam in the heart of Mecca. After the conquest of Mecca Mahommad said, "O Lord, I have delivered my message and discharged my ministry." Then he returned to Medina where he passed out at the age of 63 in the year 632 A. D., after suffering for two weeks from a severe attack of fever.

No prophet had ever suffered so much persecution nor

had shown so much firmness of faith and trust in the will of his Lord throughout his life and under all circumstances as was shown by the prophet of Arabia. His teachings were simple but full of fire which suited the warlike temper of the Arab nation.

Mahammad by his teachings changed the character of the lawless Arab tribes, gave them laws, made them law-abiding, and from disintagrated and warring factions, created a nation. No prophet could have done anything with these wild fanatical people of the desert of Arabia.

Mahammad preached the unity of God and unity of his prophet, whosoever believes this doctrine receives ever-lasting life and celestial happiness.

Regarding the glorious work of Mahammad Carlyle writes :—To the Arab nation it was as a birth from dark-ness into light ; Arabia first became alive by means of it. A poor shepherd people, roaming unnoticed in its deserts since the creation of the world ; A hero prophet was sent down to them with a word they could be-lieve ; see, the un noticed becomes world-noticeable, the small has grown world-great ; within one century after-wards Arabia is at Grenada on this hand, at Delhi on that ; glancing in valor and splendor and the light of genius, Arabia shines through long ages over a great section of the world. Belief is great, life giving. The history of a nation becomes fruitful, soul-elevating, great, as soon as it believes. These Arabs, the man Mahammad and that one century, is it not as if a spark had fallen one spark, on a world of what seemed black, un-noticeable sand, but lo, the sand proves explosive powder, blazes heaven high from Delhi to Grenada."

সূচীপত্র

বিশ্ববাণীর নিয়মাবলী

গ্রাহকগণের জন্য :—

১। "বিশ্ববাণীর" ফাল্গুনে বর্ষারম্ভ হয়। বৎসরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

২। বিশ্ববাণীর বার্ষিক মূল্য ২॥০ ; ছয় মাসের জন্য ১।০ ; প্রতি সংখ্যা।০, চার আনার ডাকটিকিট পাঠাইলে নমুনা সংখ্যা পাঠান হইয়া থাকে। ব্রহ্মদেশে বার্ষিক মূল্য ২৸০, যাণ্মাষিক ১।৵০, প্রতি সংখ্যা।১৲।

৩। গ্রাহকগণের ঠিকানা অল্পদিনের জন্য পরিবর্ত্তিত হইলে স্থানীয় ডাকঘরে নির্দ্দেশ দিবেন, বেশী দিনের জন্য হইলে বাঙ্গালা মাসের ১০ তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে।

৪। কোন কিছু জানিতে হইলে গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া সর্ব্বদা রিপ্লাই কার্ডে অথবা টিকিটসহ পত্র দিতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের হার পত্র লিখিয়া জানিতে পারেন। টাকাকড়ি চিঠি-পত্র ও প্রবন্ধাদি **বিশ্ববাণী**, কার্য্যাধ্যক্ষের নামে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ—১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশ্ববাণী

৩য় বর্ষ | চৈত্র—১৩৪৭ | ২য় সংখ্যা

শ্রীরামকৃষ্ণ

অধ্যাপক শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

ভারত-ধর্ম্মের ধারা বহুমুখী, বহুপ্রসারিত
বহুরুচি, বহুপথ, বহুভেদ, বহুমতান্বিত
মিলেছে তোমার চিত্তে সাগরে তটিনী-ধারা সম,
হে গম্ভীর মহাম্বুধি, অপার ঔদার্য্য অনুপম !
আত্মভোলা শিশু তুমি জ্ঞানভোলা হে ঋষি মহান্‌
জড় স্তব্ধ দেশধর্ম্ম তোমাতে লভিল নবপ্রাণ !
'মানবে মানবে মিত্র, পতিতে আছেন নারায়ণ,
ধর্ম্মে ধর্ম্মে ভেদ নাই, প্রেমসূত্রে বাঁধা জীবগণ'—
এ অমূল্য বাণী তুমি অসার কলহময় দেশে
সঞ্জীবনী-সুধা সম বিতরিলে সবার উদ্দেশে।
নবপ্রেমে নবধর্ম্মে নবকর্ম্মে যে নব ভারত
আজিকে উদ্বেল দেখি, নব সত্যে জাগায় জগৎ,
তাহা যে তোমারি দান, তোমারি ভাবের মূর্ত্ত ছবি
বিবেক-আনন্দ যোগী, সে যে কাব্য তুমি তারি কবি।
সে তব মানসপুত্র জগতে দাঁড়াল জ্যোতির্ম্ময়,
তব প্রেমসাম্যমন্ত্র ভেরীরবে ঘোষিল দুর্জ্জয়।
তোমারে প্রণাম করি, নরদেব প্রেমিক উদার
কৃষ্ণ-বুদ্ধ-চৈতন্যের অভিনব সৌম্য অবতার॥ *

---

* ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা ছাত্র সম্মিলনীর শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী মহোৎসব উপলক্ষে কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে পঠিত।

তিব্বতে বৌদ্ধসঙ্ঘের গোড়ার কথা

শ্রীঅজিত ঘোষ

তখন সবেমাত্র নালন্দার গৌরবময় যুগের সূত্রপাত হয়েছে। উত্তর-ভারতে গুপ্ত-সাম্রাজ্যও তখন বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ভারতের বৌদ্ধসঙ্ঘও তখন বেশ শক্তিশালী। খ্রীষ্টীয় ৫ম শতকের কথা। বৌদ্ধসঙ্ঘের চিন্তা ও কর্মধারায় এক প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার জোয়ার এল। যে কর্মবাদ ও আদর্শকে মুখ্য করে প্রিয়দর্শী অশোকের ধর্মাভিযান চলেছিল, প্রচার ও সংগঠনের ক্ষেত্রে তারই বেদনা আবার সঞ্চারিত হয়ে উঠেছিল। ফলে দেখা গেল, ভারতীয় শ্রমণেরা বৌদ্ধসঙ্ঘের বাণী নিয়ে দেশে দেশে, ভারতের বাহিরে সুদূর দেশের প্রান্তে গিয়ে হাজির হয়েছেন। এই কর্মতৎপরতা মহাযান বৌদ্ধদের ভিতরেই বেশী এসেছিল। তাঁদের ধারণা হয়েছিল যে, সমগ্র এশিয়াখণ্ডে, অন্ততঃ বৃহত্তর ভারতে জম্বুদ্বীপের সবটুকুতে এক ধর্মরাজ্যের সংগঠন করবেন। এই নব-অনুপ্রেরণার ফলে বৌদ্ধ-ধর্মের প্রচারকার্য প্রবল হতে প্রবলতর হয়ে উঠল। ওদিকে সিংহলে অনুরাধপুরকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধসঙ্ঘ বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। সেখানেও এক নবীন ধর্মাভিযানের সাড়া পড়ে গেছে। গুজরাত হতে দক্ষিণ ভারতে হীনযানেরা বেশ শক্তি সঞ্চয় করছে। একজন্য হিমালয়কে অতিক্রম করবার বাসনাই মহাযানদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠল। অবশ্য এর আগে গান্ধারের তক্ষশিলা হতে অনেকটা প্রভাব হিমালয়ের ওপারে গিয়ে পড়েছিল। তবুও দেখা গেল, এযুগের বৌদ্ধ শ্রমণেরা নেপাল ও তিব্বত হয়ে মহাচীনের ভিতর অগ্রসর হয়েছেন। অবশ্য এর আগেই মহাচীনে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশলাভ করেছে এবং তার ফলেই এই শতাব্দীর প্রথম দিকে চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন্ ভারতে এসেছিলেন। বৌদ্ধ তন্ত্রযান ধারণী ও মণ্ডলগুলি তখন বেশ ধীরে ধীরে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। বিশেষতঃ বিনায়ক-তন্ত্রে তখন বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাব এসে পড়েছিল। সেই তন্ত্র এক দিন তিব্বতে গিয়েও পৌঁছিল। কিন্তু কে নিয়ে গেলেন? কেহ কেহ বলেছেন, যশোগুপ্ত, বুদ্ধনন্দী-প্রমুখ পাঁচ জন বৌদ্ধ শ্রমণ ৪৬০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহল হতে ভারতের মধ্য দিয়ে চীন যাবার পথে তিব্বতে গিয়েছিলেন। খুব সম্ভব তাঁদের হাতে বিনায়কতন্ত্র ছিল। তখন প্রায়ই তিব্বতের মত দুরধিগম্য পার্বতীয় প্রদেশ অতিক্রম করে চীনে গতায়াত চলত। সেই গতায়াতের পথে হয় ভারতের শ্রমণেরা, না হয় চীনা বৌদ্ধ পরিব্রাজকেরা তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের অনেকটা প্রভাব আনতে পেরেছিলেন।

বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রচারে নালন্দাসঙ্ঘের উৎসাহ ছিল সবচেয়ে বেশী। তখন নালন্দা হতে বেশ সহযোগিতা করা হত বলেও মনে করা হয়। তবে এর কিছু পরে নালন্দাসঙ্ঘ নিজেরাই উৎসাহী হয়ে কাজে নেমেছিলেন। তাঁদের সে কর্মক্ষেত্র ক্রমেই প্রসারলাভ করতে থাকে। ক্রমে নালন্দার ঐতিহাসিক যুগ ৭ম শতাব্দী এসে পড়ল। নালন্দার সমীপে মগধের নালন্দা পরবর্তী শিক্ষাকেন্দ্র বিক্রমশিলার তখনও আবির্ভাব হয় নি। য়ুয়ন্-চোয়ঙ, ঈ-চিঙ প্রমুখ চীনা পরিব্রাজকেরা যখন নালন্দায় এসেছিলেন তার কিছু আগেকার কথা। সমগ্র জম্বুদ্বীপে তখন নালন্দার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। নালন্দার ভিক্ষু ও স্নাতকদের একান্ত চেষ্টায় ও ক্রমবর্ধমান প্রচারের ফলে বৌদ্ধধর্মের ভিতর দিয়ে সংস্কৃতি, শিক্ষা ও দীক্ষা দেখতে দেখতে তিব্বত হতে কোরিয়া ও চীনা তুর্কীস্তান, ওদিকে মহাচীন, জাপান ও সুদূর প্রাচ্যে প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা লাভ করল।* এরকম ক্রমবর্ধমান অবস্থায় এমন একটা যুগ এসে পড়েছিল যখন হিমাচলের ওপারে বহির্ভারতীয় দেশগুলিতে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠায় তিব্বত প্রধানতম সহায়ক কেন্দ্র হয়েছিল। এমন কি, কিছুকাল পরে এমন একটা সময়ও এসেছিল যখন ভারতে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম শক্তিহীন হয়ে পড়ছিল, তখন তিব্বতের বৌদ্ধসঙ্ঘ অতঃপর তিব্বত বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র হবে এরূপ আশা পোষণ করেছিলেন। যাহোক, ৭ম শতকে বৌদ্ধদের মধ্যে তন্ত্রসাধনা তখন বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বৌদ্ধ ধারণী ও গুহ্যসমাজের গোপন রহস্য যখন নেপাল ও তিব্বতের পথে এন্‌দেয়ারে, দন্দান-উইলিগ্‌ ও তুন্‌-হুয়াঙ হয়ে মহাচীন ও জাপানে ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন তিব্বত সে তন্ত্রের প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারে নি। ক্রমে এই তন্ত্রবাদের প্রভাবে তিব্বতের বৌদ্ধসঙ্ঘ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। এই তন্ত্রের কতটুকু প্রভাব নালন্দা হতে এসেছিল তা হয়তো প্রতিপন্ন করা যাবে না, তবে বৌদ্ধধর্ম যে নালন্দারই প্রভাবে তিব্বতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল সে বিষয়ে দ্বিমত পাওয়া যায় না। এর জন্য নালন্দার প্রচারকদের নিশ্চয়ই তিব্বতীয় ভাষা শিখতে হয়েছিল এবং প্রয়োজনানুসারে বৌদ্ধ পিটক-সূত্র ও শাস্ত্রগুলিও নিশ্চয়ই তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করতে হয়েছিল।

একথা সত্য যে, য়ুয়ন্-চোয়ঙের ভারতাগমনের পূর্ব হতেই এশিয়াখণ্ডের নানা দেশের ছাত্র ও পরিব্রাজক নালন্দায় আসতেন। নিশ্চয়ই একে নালন্দার প্রচারকার্যের ফল বলতে হবে। অবশ্য রাষ্ট্রীয় ও বাণিজ্যক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র ছিল, কিন্তু সংস্কৃতির আদানপ্রদান যে বৃহত্তম আদর্শের দিক দিয়ে বিবেচনা করা হত—সে কথাই প্রথমে চিন্তা করা দরকার। এ-বিষয়ে ভারতবাসীরা যে কতদূর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন, অজন্তার চিত্রসমাবেশে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ উদ্দেশ্য ছাড়া মূল উদ্দেশ্য কিন্তু প্রচারক্ষেত্রেই নিবদ্ধ ছিল। ভারতের অধ্যাত্মিক

প্রচারকেরা ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে বাহন করে বুদ্ধের বাণী দেশদেশান্তরে নিয়ে যেতেন। শত বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে নিশ্চয়ই তাঁদের এই ধর্মাভিযান চলেছিল। অনেকে হয়তো স্বদেশে ফিরতে পারেন নি—ইতিহাসের পাতায় তাঁদের পরিচয় দেবার সুযোগ নেই। সে যাই হোক, এই প্রচারকেরা শুধু প্রচার করেই ক্ষান্ত হতেন না, যেখানে যেখানে প্রচার করতেন সে-সব স্থানের সুধী-মনীষী ও শিক্ষার্থীদের নিজেদের দেশে আমন্ত্রণ করতেন ভারতের শিক্ষা, চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য। এরই ফলে ভারতের বাহিরের দেশগুলি হতে ছাত্র ও মনীষীরা এদেশে আসতে থাকেন। ভারতের শিক্ষাপীঠগুলিতে তাঁদের এই গতায়াত ক্রমেই বেড়ে চলে—নালন্দায় এসে তাঁদের শিক্ষার পূর্ণ সার্থকতা হত। প্রায় সকল বিদেশীরই তখন এমন ধারণা হয়েছিল যে, নালন্দার শিক্ষা-সমাবর্তন না হলে যেন স্নাতক হওয়া সম্ভবপর হত না।

ভারতবাসীদের তথাকথিত প্রচারকার্যের ফলে ও নালন্দার গৌরবাধিষ্ঠানের গুরুত্ব গ্রহণ করেই প্রথম তিব্বতীয় শিক্ষার্থী থোন্‌মি-সম্ভট নালন্দায় এসেছিলেন। য়ুয়ন্‌-চোয়ঙ যখন নালন্দায় আসেন তার আগেই থোন্‌মি সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। তিব্বতরাজ স্রং-সন্‌-গম্‌-পো তাঁকে ভারতীয় লিপিবিদ্যা ও ভারতীয় শ্রেষ্ঠ ভাষাগুলি শেখবার জন্য ৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে পাঠিয়েছিলেন। এছাড়া তিব্বতরাজের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, থোন্‌মি বৌদ্ধধর্মের এবং ভারতীয় শিক্ষা ও চিন্তাধারার যথাযথ সত্য ও তথ্য তিব্বতে নিয়ে আসতে পারবেন। থোন্‌মি ছিলেন তিব্বতরাজেরই মন্ত্রী অনুলের পুত্র, অবশ্য উত্তরকালে তিনিও মন্ত্রী হয়েছিলেন। এখন, তিব্বতরাজ স্রং-সনেরও কিছু পরিচয় এখানে দেওয়া প্রয়োজন। প্রথম দিকে তিনি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন না এবং খুব সম্ভব বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর বড় একটা অনুরাগ ছিল না। তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠায় তিনি যে উৎসাহী হয়েছিলেন তার গৌরব একরকম তাঁর চীনা পত্নী ওয়েন্‌-সেঁঙেরই প্রাপ্য। ওয়েন-সেঁঙ ছিলেন চীনের তঙ-বংশীয় সম্রাটের কন্যা। ৭ম শতকের প্রথম দিকে স্রঙ সন্‌ যখন চীন আক্রমণ করেন তখন তিনি ওয়েন-সেঁঙকে বিবাহ করেন। এ বিবাহে না কি চীন-সম্রাটের সম্মতি ছিল না, কারণ তিনি ছিলেন বৌদ্ধ—অন্য কারণও থাকতে পারে। ওয়েন-সেঁঙ তিব্বতরাজকে বিবাহ করে তাঁকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেন। এছাড়া এক জন নেপালী বৌদ্ধ রাজকুমারীও তাঁর মহিষী ছিলেন। এই দুজন মহিষীর দ্বারাই স্রঙ-সন্‌ প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। স্রঙ-সন্‌ বেশ পত্নীবৎসল ছিলেন বলেও মনে হয়। কারণ, পত্নীদের দ্বারাই তিনি সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত হতেন। অনেকের মতে চীন থেকে প্রথম তিব্বতে সভ্যতার আলো প্রবেশ করে। এ-বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। তবে ওয়েন্‌-সেঁঙ চীনা সভ্যতার কিছু কিছু নিদর্শন তিব্বতে আমদানী করেছিলেন। চীনের শিল্পকলার অনেক-কিছু তিনি তিব্বতে

প্রচলন করেন। তিনি নিজেও কয়েকটী শিল্পে পারদর্শিনী ছিলেন। থোন্‌মিকে ভারতে 'পাঠানর ব্যাপারে তাঁর খুব হাত ছিল, অবশ্য নেপালী রাজকুমারীর প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না। এ-ছাড়া এই দুই মহিষীর পরামর্শক্রমেই স্রঙ-সন্‌ লাসা নগরী প্রতিষ্ঠা করে সেখানে বৌদ্ধকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে চীনা শ্রমণ য়ুয়ন্‌-চাঙ যখন শিক্ষার্থিরূপে নালন্দার পথে অগ্রসর হন তখন তিব্বতের মধ্য দিয়ে ভারতে আসবার পথ ওয়েন্‌-সেঙই তাঁকে দিয়েছিলেন।

যাহোক, তিব্বত ত্যাগ করে নেপালের মধ্য দিয়ে থোন্‌মি ভারতের বুকে এসে পড়লেন। কিন্তু ক্রমাগত চলতে চলতে তিনি একেবারে দক্ষিণ-ভারতে হাজির হলেন। সেখানে তিনি ব্রাহ্মণ লি'পদত্তের কাছে জ্ঞানমার্গের প্রথম স্তরের শিক্ষা লাভ করে 'নাগরী' ও 'গাথা'র অক্ষরবিজ্ঞান শিক্ষা করেন। তারপর তিনি আসেন নালন্দায়। এখানে তিনি আচার্য দেববিৎসিংহের শিক্ষাধীনে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ-শাস্ত্রনিচয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ পান। নালন্দা হতে যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান লাভ করে এবং শাস্ত্রাদি সংগ্রহ করে তিনি স্বদেশে ফিরেছিলেন, অন্য কোন তিব্বতীয় শিক্ষার্থীর পক্ষে সেরূপ ঘটেছিল কি না জানি না। তিনি যখন নালন্দায় তখন য়ুয়ন্‌-চোয়ঙ সেখানে এসেছিলেন এবং শিক্ষার্থিরূপে অনেক দিন বাসও করেছিলেন। য়ুয়ন্‌-চোয়ঙের সঙ্গে সতীর্থরূপে তাঁর পরিচয় ঘটা খুবই স্বাভাবিক এবং য়ুয়ন্‌-চোয়ঙের সুদীর্ঘ ভ্রমণ ও শিক্ষানুশীলনের অভিজ্ঞতার পরিচয় নিশ্চয়ই তিনি কিছু-না-কিছু গ্রহণ করেছিলেন। যাহোক, রাজপৃষ্ঠপোষকতায় ও রাজকর্তৃক যখন তিনি ভারতে প্রেরিত হয়েছিলেন তখন স্বদেশে ফিরে তিনি তাঁর শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা দেশের কাজে নিয়োজিত করেছিলেন একথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে।

থোন্‌মি যখন নালন্দায় আসেন তখন বৌদ্ধ-সাহিত্যে ও জীবনে হিন্দু-তন্ত্রের প্রবেশলাভ ঘটেছে। বৌদ্ধরা তখন হিন্দুদের শক্তি-পরিকল্পনাকে গ্রহণ করেছেন। ফলে বৌদ্ধ দেবগোষ্ঠির মধ্যে এমন সমস্ত দেবতার আবির্ভাব হল যাঁদের মূর্তিপরিকল্পনায় নিজ নিজ শক্তি-পরিকল্পনাও অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এই সময়েই বৌদ্ধ 'গুহ্যসমাজে'র আবির্ভাব হয়। সেই গুহ্যসমাজের 'মণ্ডলে' পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের নিজ নিজ শক্তির উদ্ভব হল। একথা সত্য যে, হিন্দু দেবদেবীর মধ্য হতেই সমবধারণার ভাবনা নিয়ে বুদ্ধের এই সমস্ত মূর্তি ও বিশেষতঃ শক্তিগুলি গ্রহণ করা হয়েছিল। এভাবেই বৌদ্ধদের মধ্যে 'যোগাচার'-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এই গুহ্যমত বা যোগাচারের সাধনা ৬ষ্ঠ শতকে উদ্ভব হয়েছিল বটে, কিন্তু তার সুপ্রতিষ্ঠা ৭ম শতকেই হয়। সুতরাং থোন্‌মি যখন ভারতপ্রবাসে তখন বৌদ্ধরা 'সমাধি'র সাধনায় যোগাভ্যাসের আশ্রয় নিয়েছেন। নালন্দাতেও সেই যোগাচারমতের বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল। থোন্‌মি সেই যোগাচার-তন্ত্রও শিক্ষা করেন। তার পর তিনি দেশে ফিরে,

যান। যাবার সময় তিনি অনেক বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের অনুলিপি ও শক্তিপূজা-সম্বলিত অনেক তন্ত্রের পুঁথিও নিয়ে গিয়েছিলেন। মজার কথা এই যে, এর আগেই নেপাল হতে তিব্বতে যোগাচারের প্রবেশলাভ ঘটেছিল। সম্ভবতঃ তিব্বতের যোগাচার-তন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করবার জন্য থোন্‌মিকে ভারতবর্ষে পাঠান হয়েছিল। হুয়েন্‌-চাঙ যখন নালন্দা হতে তন্ত্রশিক্ষা নিয়ে স্বদেশের পথে অগ্রসর হন তখনও তাঁকে নেপাল ও তিব্বতের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। তিব্বতে গিয়ে তিনি শক্তি-সংস্কৃতির প্রভাব ও যোগাচার-তন্ত্রের সুপ্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করেছিলেন। ভারতের যোগাচারের সঙ্গে তিব্বতের যোগাচারের যে একটা পার্থক্যও এসে গিয়েছিল তাও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে নি।

থোন্‌মির স্বদেশে প্রত্যাগমনের পর তিব্বতের বৌদ্ধ-তন্ত্র আরও একটু শক্তিশালী হয়ে ওঠে। লাসায় এই যোগাচার-সাধনার কেন্দ্র করা হয়। তিব্বতের বৌদ্ধপ্রধান 'লামা'রা সেই তন্ত্রসাধনার কর্ণধার হয়ে ওঠেন। এর পর ৭ম শতকে তিব্বতের ইতিহাসে আর বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। ৮ম শতকের প্রথম পাদে নালন্দার শ্রমণ চন্দ্রগোমী বৌদ্ধপ্রচারকরূপে তিব্বতে উপস্থিত হন। নালন্দা থেকেই তাঁকে তিব্বতে পাঠান হয়েছিল। তিব্বতের বৌদ্ধসঙ্ঘ তখন তন্ত্রসাধনায় বেশ আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। জ্ঞানমার্গের পথে ধর্মকে আয়ত্ত করা এবং সেই ধর্মকেই আশ্রয় করে প্রকৃত জ্ঞান ও সমুন্নত সংস্কৃতিকে অক্ষুণ্ণ রাখার পথ যোগাচার-সংস্কৃতির প্রসারে ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছিল। এদিকে ভারতের বৌদ্ধসঙ্ঘও তখন হিন্দুদের পুনরভ্যুত্থানে ধীরে ধীরে অবনতির দিকে চলেছিল। খুব সম্ভব এই অবনতির পথে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে একটা সঙ্গতি আনবার জন্য হিন্দুর শক্তি-সংস্কৃতিকে বৌদ্ধ তান্ত্রিক পর্যায়ে গ্রহণ করা হয়েছিল। তবুও নালন্দাসঙ্ঘ যোগাচার-সাধনা গ্রহণ করলেও তাঁদের প্রাচীন ধারাকে বিসর্জন দেন নি। প্রাণপণে তাঁরা প্রকৃত জ্ঞানের অনুশীলন অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা করেছিলেন। বোধ হয়, তিব্বতের ধর্মজীবনেও একটা সঙ্গতি আনবার জন্য চন্দ্রগোমীকে পাঠান হয়েছিল। অবশ্য হিন্দু ও বৌদ্ধের কোন প্রশ্ন সেখানে ছিল না। তিব্বতে তখন এক শ্রেণীর বৌদ্ধ ছিলেন, তাঁরা প্রকৃত জ্ঞানমার্গের পথই চাইতেন। শাস্ত্র ও জ্ঞানকে আশ্রয় করে সংস্কৃতির ক্রম প্রগতির সাধনাই তাঁদের লক্ষ্য ছিল। খুব সম্ভব এই অবস্থায় একটা সঙ্গতিরক্ষার প্রয়োজন হয়েছিল! চন্দ্রগোমী তিব্বতে বেশ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। তাঁর লেখা অনেক গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল এবং অনেক পণ্ডিতও সে-কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন। সুতরাং যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি তিব্বতে গিয়েছিলেন তা যে অনেকাংশে সুফল হয়েছিল এরূপ মনে করা যেতে পারে।

চন্দ্রগোমীর পরেই শান্তরক্ষিত ও পদ্মসম্ভবের নাম পাওয়া যায়। দুজনেই নালন্দার ভিক্ষু ও বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি। শান্তরক্ষিত ছিলেন বাঙালী, বাঙলার এক রাজবংশে তাঁর

জন্ম হয়েছিল ; পদ্মসম্ভব ছিলেন কাশ্মীরের অধিবাসী। এঁদের দুজনের মধ্যে কে আগে এসেছিলেন তা ঠিক করে বলা যায় না। তবে দেখা যায়, দুজনেই সমসাময়িক ; তিব্বতে শান্তরক্ষিতের কর্মজীবনে পদ্মসম্ভব তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। বোধ হয়, পদ্মসম্ভবই আগে এসেছিলেন ; কারণ তাঁর কর্মক্ষেত্রে শান্তরক্ষিতের নাম পাওয়া যায় না। স্রঙ-সন্-গম্-পোর পৌত্র তিব্বতরাজ খি-স্রঙ-দে-সন্ তাঁদের নালন্দা থেকে আনিয়েছিলেন। এই খি-স্রঙ-দে-সন্‌কেই তিব্বতের ইতিহাসে সর্বাধিক ধর্মপরায়ণ নৃপতি বলে অভিহিত করা হয়। ৭৪০ হতে ৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সগৌরবে রাজত্ব করেছিলেন। ৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে শান্তরক্ষিত তিব্বতে আসেন। তিব্বতে উপস্থিত হলে তাঁকে রাজকীয় সম্বর্ধনায় সম্মানিত করা হয়। এর অব্যবহিত পরেই তাঁর নির্দেশ ও উপদেশ অনুসারে তিব্বতের প্রথম সম্-য়ে বৌদ্ধবিহার নির্মিত হয়। ভারত হতে আনীত শাস্ত্রনিচয় এই বিহারে রক্ষা করা হয়েছিল। শান্তরক্ষিতই এই বিহারের প্রথম সঙ্ঘাধ্যক্ষ হন এবং সেখান হতেই ৭৬২ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুকাল পর্যন্ত একনিষ্ঠ উৎসাহে ধর্মসংস্কার ও ক্রমোন্নয়নে ব্যাপৃত থাকেন। এই বিহারের নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠায় তিব্বতরাজ এবং ভিক্ষু পদ্মসম্ভবের আগ্রহ ও উৎসাহই ছিল সর্বাধিক। তখন তিব্বতে পদ্মসম্ভবের অভাবনীয় প্রতিষ্ঠা। সেখানে তাঁর নাম ছিল গুরু রিন্‌পোচে। লাসার লামাদের মধ্যে তাঁর আসনও ছিল শ্রেষ্ঠ, এমন কি, তাঁকে অমিতাভ-বুদ্ধের অবতারও বলা হত। আবার কখনও বা তাঁর মধ্যে দলাই-লামার আবির্ভাব কল্পনা করা হত, অবশ্য তাঁর এই প্রতিষ্ঠার পরিণতি ঘটেছিল শান্তরক্ষিতের মৃত্যুর পরে। যতদিন শান্তরক্ষিত ছিলেন ততদিন পদ্মসম্ভব তাঁর সহযোগিরূপেই কাজ করেছিলেন। শান্তরক্ষিতের মৃত্যু হলে তিনি তিব্বতের সর্বপ্রধান লামার আসন লাভ করেন। তারপর তাঁর সুপ্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয়।

খি-স্রঙ বরাবরই যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন, বিশেষতঃ চীনের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ছিল বেশী। কিন্তু তবুও তিনি দেশের ধর্মসংস্কারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে পরাঙ্মুখ হতেন না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, ভারতে বৌদ্ধসঙ্ঘ তো ক্রমেই শক্তিহীন হয়ে পড়ছে ;— এখন তিব্বতকেই বৌদ্ধজগতের কেন্দ্রস্থল করে তুলতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, যতখানি তিনি ধর্মসংস্কারে আত্মনিয়োগ করতে চাইতেন, যুদ্ধের পর যুদ্ধে সে আগ্রহ সফল হতে পারে নি। এভাবে যুদ্ধবিগ্রহের ভিতর দিয়েই তাঁর জীবনের অবসান হয়। অতঃপর তাঁর পুত্র ম্‌ভে-চিন্-জি-সন্ সিংহাসনারোহণ করে চীনসম্রাট টে-সঙের সঙ্গে সন্ধি করেন। তিব্বতের সঙ্গে চীনের এই দ্বিতীয় সন্ধি। এই সন্ধির কথা লাসায় দো রিঙে এখনও লিপিবদ্ধ আছে। ম্‌ভে-চিন্-জি-সনের সাম্যবাদের দিকে ঝোঁক ছিল খুব বেশী। তিব্বতের ইতিহাসে তাঁকে সর্বপ্রধান সাম্যবাদী নৃপতি বলা হয়েছে। তাঁর আদর্শ হল, সকল লোকেই সমান ;

সুতরাং সকলের সমান অবস্থায় আসা উচিত। এরূপ তিনি আদেশ দিলেন, যারা বিত্তশালী তারা তাদের বিত্তের অংশ দরিদ্রদের দিক—তাতে সকলেই একটা সাম্য অবস্থায় এসে দাঁড়াবে। আদর্শ উচ্চ হলেও যথাযথ ফল পাওয়া গেল না। আরও দুবার তিনি চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাতেও কিছু হল না। ফলে সে উদ্দেশ্য তিনি ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। তখন তিব্বতে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য খুব বেশী রকম ছিল; তার ফলে বৌদ্ধ ধর্মজীবনের উচ্চতর আদর্শে যথেষ্ট বাধা উপস্থিত হত।

৯ম শতক হতে তিব্বতের দুঃসময়ের সূত্রপাত হয়। আবার চীনের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ শুরু হল। দেখতে দেখতে মোঙ্গলদের সঙ্গেও যুদ্ধ বেঁধে গেল। এমনি যুদ্ধবিগ্রহের আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে ক্রমে তিব্বতরাজবংশে অন্তর্বিরোধ উপস্থিত হল। এভাবে চলতে চলতে শতাব্দীর একেবারে শেষে ৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে লঙ-দর্ম তাঁর ভ্রাতাকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করলেন। আবার লঙ-দর্মের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রল্-প-চন্ লঙ-দর্মকে হত্যা করে বসলেন। লঙ-দর্ম ভ্রাতৃহত্যা করে যে বিরোধ ও অশান্তির সূচনা করেছিলেন তার ফল তিব্বতের বৌদ্ধসঙ্ঘকে সাময়িকভাবে বেশ পঙ্গু করে ফেলেছিল। তাই লাসায় এখনও সেই ভ্রাতৃহত্যার স্মৃতি পালন করা হয়। প্রতি বর্ষেই সেই দিন এক জন বৌদ্ধ ভিক্ষু হত্যার স্মৃতি-পালনার্থ নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। যাহোক, উক্ত অন্তর্কলহের ফলে তিব্বতের রাজশক্তি বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। অখণ্ড তিব্বতরাজ্য খণ্ড খণ্ড হয়ে কতকগুলি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হল। ১০ম শতকের শেষ দিকেও দেখা গেল, তিব্বতে চার জন রাজা রাজত্ব করছেন। ১১শ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এই রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য ও বিরোধ অব্যাহত ছিল।

এদিকে নালন্দায় ভাঙনের যুগ এসে পড়ল। মগধরাজ্যেরই মধ্যে নালন্দার কাছাকাছি বিক্রমশিলায় আবার একটা নূতন শিক্ষাকেন্দ্রের অভ্যুদয় হল। দেখতে দেখতে এই শিক্ষাকেন্দ্রটি নালন্দার বেশ প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল। এমন কাছাকাছি আর একটা প্রতিদ্বন্দ্বী শিক্ষাকেন্দ্রের কেন প্রয়োজন হল তার সঠিক সিদ্ধান্ত করা যায় না। নীতিগত বৈষম্য নিয়ে যে বিক্রমশিলা-বিহারের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এমন কথা বলা চলে না। যে কারণে খৃষ্টীয় ৭ম শতকে গুজরাতের বলভী-শিক্ষাপীঠ গড়ে উঠেছিল, সে-কারণে যে বিক্রমশিলার প্রতিষ্ঠা হয় নি, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিক্রমশিলা নালন্দারই মত বৌদ্ধ মহাযানশাখার অন্তর্ভুক্ত—বলভীর মত হীনযানপন্থী ছিল না। এছাড়া গুজরাতের কাটিয়াবাড় হতে নালন্দার দূরত্ব অনেকখানি। সুতরাং বলভীর অভ্যুদয়ের সঙ্গত কারণ থাকতে পারে। কিন্তু এমন কি কারণ ঘটেছিল যাতে নালন্দার কাছাকাছি একই নীতি ও পর্যায়ভুক্ত স্বতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বি-শিক্ষাকেন্দ্রের প্রয়োজন হল? আরও একটু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, খৃষ্টীয় ৮ম শতকের মাঝামাঝি বাঙলার পালরাজ ধর্মপাল বিক্রমশিলা প্রতিষ্ঠা করবার পর থেকে বিক্রমশিলাই

পালরাজগণের সর্বাঙ্গীন পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে এসেছে, নালন্দাসঙ্ঘ তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা তো পানই নি—বরং পাল-নৃপতিদের নির্দেশে বিক্রমশিলার আচার্যসঙ্ঘকে নালন্দার ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হত। এই রাজবিদ্বেষের বিরুদ্ধে নালন্দাসঙ্ঘ যে ভাবে আরও দীর্ঘ তিন শ' বছর অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিলেন, সেটুকু যে দীর্ঘকালের প্রতিষ্ঠা ও জনসাধারণ গৌরবের বশেই সম্ভব হয়েছিল একথা খুবই সত্য। এই তিন শ' বছর পরে নালন্দা ক্রমে শক্তিহীন হয়ে পতনের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল—কোন রকমে অস্তিত্বটুকুই বজায় ছিল। পক্ষান্তরে স্তরে স্তরে বিক্রমশিলার গৌরব ও সমৃদ্ধি বেড়ে চলল, শেষে খ্রীষ্টীয় ১১শ—১২শ শতকে এমন অবস্থায় এল যখন আর নালন্দার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রয়োজন হয় না। বিক্রমশিলার উদ্ভব, নালন্দার ও বিক্রমশিলার এই বিরোধের রহস্য এবং পরিশেষে নালন্দার পতনের নিগূঢ়ত্ব-সম্বন্ধে কোন সত্যই আবিষ্কার করা যায় নি। কোন কোন ঐতিহাসিক অনুমান করেছেন, তন্ত্রকে গ্রহণ করেই নালন্দার পতনের পথ প্রশস্ত হয়েছিল; কারণ তন্ত্রসাধনার পরাবিদ্যার আশ্রয় নিয়ে প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞানানুশীলনে বাধা জন্মে। নালন্দার আসল লক্ষ্য ছিল অনুশীলনসাধ্য অপরাবিদ্যার দিকে; সুতরাং নালন্দার পতন হওয়া স্বাভাবিক। এই অনুমান কিন্তু স্বীকার করা যায় না, কারণ তা হলে অপরাবিদ্যাকে গ্রহণ করে, রাজপৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেও বিক্রমশিলার উন্নতি সম্ভবপর হত না। আরও একটা কথা এখানে বলা যেতে পারে। সে যুগে তন্ত্রের দুটি ধারা ছিল—একটা ছিল আচারসিদ্ধ, আর একটা দার্শনিক রীতি ও নীতিকে অবলম্বন করেছিল। আচারসিদ্ধ তন্ত্র বাঙলার নিজস্ব—যোগসাধনার আভ্যাসিকের পথ তাতে প্রশস্ত। বিক্রমশিলায় তার প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা ছিল যথেষ্ট। নালন্দা কিন্তু সে প্রভাব স্বীকার করতে পারে নি; এ-কারণে বঙ্গরাজশক্তির আনুকূল্য লাভ করাও বোধ হয় সম্ভব হয় নি।

যাহোক, নালন্দা-ইতিহাসের এই দীর্ঘ দুঃসময়ে নালন্দা হতে আর বিদেশে প্রচারকদের পাঠান বড় একটা সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি। সেক্ষেত্রে তিব্বতেও শান্তরক্ষিতের পরে আর প্রচারক না যাওয়াই স্বাভাবিক। ওদিকে তিব্বতের রাষ্ট্রীয় অবস্থাও অনুকূল ছিল না। তবুও যদি তিব্বত হতে কোন আমন্ত্রণ নালন্দায় আসত, তাহলেও নালন্দার পক্ষে সে আমন্ত্রণ রক্ষা করা দুঃসাধ্য হত। ইতিমধ্যে বিক্রমশিলায় কোন আমন্ত্রণ এসেছিল বলে মনে হয় না, বিক্রমশিলা থেকেও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কাহাকেও পাঠান হয় নি। খ্রীষ্টীয় ১১শ শতকে বিক্রমশিলা বেশ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে—বিক্রমশিলার তখন সুবর্ণযুগ বললেও চলে। বৌদ্ধভারতের কেন্দ্রভূমি মগধও তখন আবার শান্ত অবস্থা ধারণ করেছে; নালন্দার গৃহে গৃহে, জনবিরল বীথি ও প্রাঙ্গণতলে, আম্রকুঞ্জে অতীত স্মৃতির নিঃসহায় পুঞ্জীভূত বেদনা প্রায় স্তব্ধ হয়ে এসেছে। এমনি সময় এবার বিক্রমশিলায় তিব্বতরাজের পক্ষ হতে প্রচারক বৌদ্ধ পণ্ডিত প্রেরণের জন্য অতি সনির্বন্ধ আমন্ত্রণ উপস্থিত হল। [ক্রমশঃ]

দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি

পণ্ডিত শ্রীমৎ শীলাচার ভিক্ষু, বিনয়সূত্র বিশারদ,
অধ্যাপক নালন্দা বিদ্যাভবন কলিকাতা।

দেবাদিদেব, ব্রহ্মাদিব্রহ্ম, ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ ত্রিতাপ-দগ্ধ দেব মানবের হিতসুখ কামনায় পঁয়তাল্লিশ বৎসরকাল অহিংসার বাণী প্রচার করিয়া অশীতি বৎসর বয়সে বৈশাখী-পূর্ণিমার চন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত রজনীতে কুশীনারার মল্লদের সুরম্য শাল-উদ্যানে যুগ্ম শাল-তরুতলে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। তাঁহার পরিনির্বাণের পর হইতে এই সুব্যাখ্যাত নৈর্বাণিক ধর্ম্মের মূলে দুর্নীতির কীট প্রবেশ করে; তা'ই তাঁহার পরিনির্বাণের অব্যবহিত পরেই প্রথম ধর্ম্মসঙ্গীতির আবশ্যক হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও নিষ্কৃতি পাওয়া গেল না। আবার ন্যূনাধিক একশত বৎসরের মধ্যে বৈশালীবাসী দুর্নীতিপরায়ণ ভিক্ষুরা সুনির্ম্মল বুদ্ধ শাসনের কণ্টকস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। তাই পুনরায় দ্বিতীয়বার ধর্ম্ম-বিনয় সঙ্গায়নের প্রয়োজন হইয়াছিল।

বুদ্ধের পরিনির্বাণের একশত বৎসর পর বৈশালীবাসী দুর্নীতিপরায়ণ বৃজিপুত্র ভিক্ষুরা বৈশালীতে দশ বস্তুর (দশ প্রকার আচরণ যাহা ভিক্ষুদের বর্জ্জনীয়) প্রবর্ত্তন করেন। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :

১। কপ্পতিসিঙ্গীলোণকপ্পো। "যেখানে লবণের অভাব হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেখানে ব্যবহার করিবার জন্য শৃঙ্গাধারে লবণ লইয়া যাইতে পারেন।" [শ্রাবস্তীতে কথিত "সুত্ত-বিভঙ্গ" মতে ইহা বিনয় বিরুদ্ধ।] "সন্নিধিকার ভোজনে পাচিত্তিয়।"

(২) কপ্পতি দ্বঙ্গুল কপ্পো। "মধ্যাহ্নের পর শরীরের ছায়া দুই আঙ্গুল অতিক্রম না করা পর্য্যন্ত ভিক্ষুগণ ভোজন করিতে পারেন।" [রাজগৃহে কথিত "সুত্ত-বিভঙ্গ" মতে ইহা বিনয় বিরুদ্ধ।] "বিকাল ভোজনে পাচিত্তিয়।"

(৩) কপ্পতি গামন্তর কপ্পো। "গ্রামান্তরে যাইবেন মনে করিয়া ভুক্তাহার-প্রবারিত ভিক্ষুগণ অনতিরিক্ত ভোজন করিতে পারেন।" [শ্রাবস্তীতে কথিত "সুত্ত-বিভঙ্গ" মতে ইহা বিনয় বিরুদ্ধ।] "অনতিরিক্ত-ভোজনে পাচিত্তিয়।"

(৪) কপ্পতি আবাস কপ্পো। "এক সীমাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন আবাসের ভিক্ষুগণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উপোসথ করিতে পারেন।" [রাজগৃহে কথিত "উপোসথ সংযুক্ত" অনুসারে ইহা বিনয় বিরুদ্ধ।] "বিনয় বিধান মতে দুক্কট।"

(৫) কপ্পতি অনুমতি কপ্পো। "সংঘের অপর ভিক্ষুগণ আসিলে তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ করিবেন, এই মনে করিয়া উপস্থিত ভিক্ষুগণ বিনয়-কর্ম্ম করিতে পারেন।" [চম্পায়-কথিত "বিনয় বত্থ" মতে ইহা বিনয় বিরুদ্ধ] "বিনয় বিধানে মতে দুক্কট।"

(৬) কপ্পতি আচিন্ন কপ্পো। "আচার্য্য ও উপাধ্যায় স্থানীয় স্থবিরদিগের আচরিত প্রথানুসারে ভিক্ষুগণ আচরণ করিতে পারেন।" "বিনয় বিধান মতে [আপত্তির গুরুত্ব হিসাবে] আপত্তি।"

(৭) কপ্পতি অমথিত কপ্পো। ভিক্ষুগণ যথারীতি ভোজন সমাপ্ত করিয়া ক্ষীরভাব পরিত্যাগ করিয়াছে অথচ দধিভাব প্রাপ্ত হয় নাই এই রূপ দুগ্ধ ভিক্ষুরা পান করিতে পারেন।" [শ্রাবিস্তাতে কথিত "সুত্ত-বিভঙ্গ" মতে ইহা বিনয় বিরুদ্ধ।] "অনতিরিক্ত ভোজনে পাচিত্তিয়।"

(৮) কপ্পতি জলোগি কপ্পো। "যে সুরা বা পানীয় রস এখন ও মত্তভাব প্রাপ্ত হয় নাই, এইরূপ সুরা ভিক্ষুরা পান করিতে পারেন।" কৌশাম্বীতে কথিত "সুত্ত বিভঙ্গ" মতে ইহা বিনয় বিরুদ্ধ]। 'সুরা মেরেয় পানে পাচিত্তিয়'।

৯। কপ্পতি অদসকং নিসীদনং। "কদ্বালযুক্ত না হইলে ভিক্ষুগণ প্রমাণাতিরিক্ত আসনেও উপবেশন করিতে পারেন।" [শ্রাবস্তীতে কথিত "সুত্ত-বিভঙ্গ" মতে ইহা বিনয় বিরুদ্ধ।] 'ছেদনকে পাচিত্তিয়।'

(১০) কপ্পতি জাত-রূপ-রজতং। 'ভিক্ষুগণ স্বর্ণ, রৌপ্য বা মুদ্রাদি গ্রহণ করিতে পারেন।' [রাজগৃহে কথিত 'সুত্ত-বিভঙ্গ' মতে ইহা বিনয় বিরুদ্ধ।] 'জাতরূপ-রজত প্রতিগ্রহণে পাচিত্তিয়।'

উপরোক্ত দশ বস্তুর মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম বস্তু সুত্ত-বিভঙ্গের পাঠানুসারে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম বস্তু 'রাজগৃহে উপোসথ সংযুক্ত' ও চম্পেয়্যকে 'বিনয়বত্থু' অনুসারে নিরূপিত করা হইয়াছে। ষষ্ঠ বস্তু প্রসঙ্গে পালিগ্রন্থাদিতে কোন প্রামাণ্য বিবরণ পাওয়া যায় না।

কথিত আছে এক সময় আয়ুষ্মান যশঃ কাকণ্ডক-পুত্র নামক অনৈক প্রতিপত্তি সম্পন্ন অর্হৎ স্থবির বৃজি-রাজ্য ভ্রমণ করিতে করিতে বৈশালীতে উপনীত হইয়া, মহাবন-কূটাগার-শালায় বাস করেন। তখন বৈশালী-বাসী বৃজি-পুত্র ভিক্ষুগণ উপোসথ দিবসে কাংস্য-পাত্রে জল পূর্ণ করিয়া ভিক্ষু সংঘের পুরোভাগে স্থাপন করতঃ সমাগত বৈশালীবাসী বৌদ্ধ উপাসিকা ও উপাসকদিগকে বলিতেন :—হে উপাসক উপাসিকাবৃন্দ, আপনারা এইখানে (জলপূর্ণ পাত্রে) কার্ষাপণ, অর্দ্ধকার্ষাপণ, সিকিকার্ষাপণ ও মাসাদি প্রদান করুন। ইহা ভিক্ষু সংঘের

উপকারে লাগিবে। তখন আয়ুষ্মান যশঃ স্থবির ভিক্ষু সংঘের ঈদৃশ 'বিনয়'-গর্হিত কার্য্য দেখিয়া, সমাগত উপাসক উপাসিকাদিগকে বলিলেন ;—হে উপাসক উপাসিকাবৃন্দ, আপনারা কার্ষাপণাদি দিবেন না ; কারণ শাক্যপৌত্রীয় শ্রমণদের পক্ষে ইহা বিনয় নিষিদ্ধ। কিন্তু তাঁহারা স্থবিরের বাক্যের মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কার্ষাপণাদি দানে বিরত হইলেন না। এইদিকে বৃজিপুত্র ভিক্ষুরা প্রদত্ত কার্ষাপণাদি গ্রহণ করতঃ রাত্রি শেষে ভাগ করিয়া যশঃ স্থবিরকে তাহার একাংশ প্রদান করিলেন। কিন্তু ধর্ম্মভীরু যশঃ স্থবির তাহা গ্রহণ করিলেন না, বরঞ্চ এই গর্হিত কার্য্যের জন্য তাহাদিগকে তিরস্কার করিলেন।

তখন বৃজিপুত্র ভিক্ষুরা যশঃ স্থবিরকে বিপন্ন করিবার মানসে 'শ্রদ্ধাবান উপাসক উপাসিকাদিগকে অকারণ নিন্দা, তিরস্কার করিয়াছেন,' এই অজুহাতে যশঃ স্থবিরের উপর 'পটিসারনীয়' দণ্ড কর্ম্মের আদেশ প্রদান করিলেন। [অর্থাৎ কোন শ্রদ্ধাবান উপাসক উপাসিকাকে অকারণ নিন্দা তিরস্কার করতঃ তাহাদের শ্রদ্ধার ব্যাঘাত করিলে তাঁহাকে সেই উপাসক উপাসিকার নিকট যাইয়া তাঁহার অপরাধের দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য এই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয়—'আমার কোন আচরণের দ্বারা যদি আপনি অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন অথবা দুঃখ পাইয়া থাকেন, তাহা নিজ গুণে ক্ষমা করুণ।'] ঈদৃশ দণ্ড প্রাপ্ত ভিক্ষুর সঙ্গে অন্য একজন ভিক্ষু দিতে হয়। তাই যশঃ স্থবির স্থানীয় জনৈক ভিক্ষুকে সঙ্গে লইয়া বৈশালীবাসী বৌদ্ধ উপাসক ও উপাসিকা দিগকে এই বলিয়া বুঝাইয়া দেন যে তিনি কাহাকেও মনোকষ্ট দেন নাই, নিন্দাও করেন নাই এবং কোন প্রকার তিরস্কারও করেন নাই। যাহা ধর্ম্ম-বিনয় সম্মত নিয়ম তাহাই তিনি তাঁহাদিগকে জানাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। উপাসক উপাসিকারা যশঃ স্থবিরের কথার মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করিতে পারিয়া এই অভিমত প্রকাশ করিলেন—'শাক্য পৌত্রীয় শ্রমণদের মধ্যে যশঃ স্থবিরই প্রকৃত শাক্য পৌত্রীয় শ্রমণ নামের যোগ্য, বৈশালীবাসী অপরাপর বৃজি-পুত্রভিক্ষুরা শ্রমণ নামের অযোগ্য।'

অতঃপর তাঁহারা যশঃ স্থবিরকে তাঁহাদের আরামে বাস করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু তিনি তাহাদের বাক্যে কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া সহচর ভিক্ষুসহ আরামে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 'বৃজি-পুত্রভিক্ষুরা সহচর ভিক্ষুর মুখে যে সংবাদ শুনিলেন তাহাতে বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, যশঃ স্থবির বিষম বিপদ ঘটাইয়াছেন—তাঁহারা সকলেই যে শাক্য পৌত্রীয় শ্রমণ নামের অযোগ্য, তাহাই তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহারা আরও অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া (যশঃ গৃহস্থ উপাসক উপাসিকাদের নিকটভিক্ষুদের নিন্দা প্রকাশ করিয়াছেন) এই অজুহাতে তাঁহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া উৎক্ষেপণীয় দণ্ডপ্রদানের আয়োজন করিলেন—(অর্থাৎ সংঘ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া

দিবার আয়োজন করিলেন।) তাঁহাদের কূট চক্রান্তের বিষয় অবগত হইয়া কৌশলে তথা-হইতে প্রস্থান করিয়া যশঃ কৌশাম্বীতে উপস্থিত হইলেন।

তিনি কৌশাম্বীতে উপনীত হইয়া পাবেয্য ও অবন্তীবাসী ভিক্ষুদের নিকট এই বলিয়া সংবাদ পাঠাইলেন,—'বন্ধুগণ আসুন! এই বিষয়ের মীমাংসা করুন। অত্রেই অধর্মের ও অবিনয়ের প্রকাশ এবং ধর্মের ও বিনয়ের বিলয় সূচিত হইতেছে। অত্রেই অধর্ম ও অবিনয়-বাদীর প্রাবল্য এবং ধর্ম ও বিনয়বাদীর দৌর্বল্য প্রকাশিত হইতেছে ইহার মীমাংসা ব্যতীত ধর্মের স্থায়ীত্ব অসম্ভব।'

সেই সময় আয়ুষ্মান সম্ভূত স্থবির অহোগঙ্গ-পর্বতে বাস করিতেন। আয়ুষ্মান যশঃ স্থবির আর কালবিলম্ব না করিয়া স্বয়ং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ঘটনার পূর্বাপর সমস্ত বিবরণ বিশদভাবে বর্ণনা করিলেন। সম্ভূত স্থবির ঘটনার পূর্বাপর বিচার করিয়া জানিতে পারিলেন যে, বাস্তবিক বৈশালীবাসী বজ্জিপুত্র ভিক্ষুরা ধর্ম বিনয়ের বহির্ভূত আচরণ করিতেছেন। তাই তিনি যশঃ স্থবিরের পক্ষেই স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিলেন। ইত্যবসরে পাবেয্যবাসী ষাটজন ধুতাঙ্গধারী অর্হৎ ভিক্ষু এবং অবন্তীবাসী অষ্টাশীজন ধুতাঙ্গধারী অর্হৎ ভিক্ষু অহোগঙ্গ পর্বতে আসিয়া সমবেত হইলেন। স্থবিরগণ পরস্পর বিবেচনা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, বিষয়টি বড়ই জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ। তাই তাঁহারা সর্বশাস্ত্র বিশারদ, ধর্মপরায়ণ, মাতৃকা-পারদর্শী, পণ্ডিত, মেধাবী, সুবক্তা, ধর্মভীরু সাহসী ও নীতির পক্ষপাতী সোরেয্যবাসী রৈবত স্থবিরের নিকট এই বিষয় বিবৃত করা সমীচীন হইবে মনে করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন।

রৈবত স্থবির তখন সোরেয্য নামক স্থানে বাস করিতেন। যশঃপ্রমুখ ভিক্ষুগণ তাঁহাকে লইয়া যাইতে আসিতেছেন জানিতে পারিয়া, বিবাদে নির্লিপ্ত থাকিবার অভিপ্রায়ে সোরেয্য হইতে সাংকাশ্যে, সাংকাশ্য হইতে কান্যকুব্জে, কান্যকুব্জ হইতে উদুম্বরে, উদুম্বর হইতে অর্গলপুরে, অর্গলপুর হইতে সহজাতিতে গমন করিলেন। এদিকে "অহোগঙ্গ-পর্বতে" সমবেত ভিক্ষুগণ তাঁহার পশ্চাদানুসরণ করিতে করিতে সহজাতিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং উপস্থিত হইয়া পূর্বোক্ত বিবাদের সমুদয় ঘটনা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিলেন। তখন আর রৈবত স্থবির বিবাদে নির্লিপ্ত থাকিতে পারিলেন না। উপরিউক্ত দশ বস্তুর বিচার করতঃ ধর্মবাদী, অধর্মবাদী সম্বন্ধে ঠিক অবগত হইয়া, ধর্মবাদী যশঃপ্রমুখ ভিক্ষুগণের পক্ষ সমর্থন করিলেন। এদিকে বৈশালীবাসী বজ্জিপুত্র ভিক্ষুরা এই খবর অবগত হইয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাই তাঁহারাও রৈবত স্থবিরকে স্বপক্ষে আনিবার জন্য, শ্রমণ পরিভোগ্য পাত্রচীবরাদি-বিবিধ উপকরণ লইয়া নৌকাযোগে বৈশালী হইতে সহজাতিতে উপনীত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। অগত্যা তাঁহারা বিফল মনোরথ হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর সাল্‌হ নামক অনৈক ন্যায়পরায়ণ স্থবির স্বীয় বিবেকবুদ্ধির দ্বারা বিশেষভাবে অনুধাবন করিয়া জানিতে পারিলেন যে, প্রাচীনকা বা প্রাচ্য ভিক্ষুগণ অধর্ম্মবাদী এবং পাবেয্যকা বা পশ্চিম দেশীয় অর্থাৎ যশঃপ্রমুখ ভিক্ষুগণ ধর্ম্মবাদী।

সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ রৈবত স্থবির সঙ্ঘের নিকট এই মর্ম্মে বিজ্ঞপ্তি দান করিলেন যে,—বন্ধুগণ। "যদি এই বিবাদের মীমাংসা এইখানেই করা হয়, তাহা হইলে বৈশালীবাসি বৃজি-পুত্র ভিক্ষুরা পুনরায় তাহা উত্থাপন করিবেন। যদি সঙ্ঘ উপযুক্ত মনে করেন, তাহা হইলে যেখানেই বিবাদ উৎপন্ন হইয়াছে, সেখানেই ইহার মীমাংসা করা হউক।" স্থবিরের কথায় সকলেই একমত হইয়া বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য বৈশালীতে সমবেত হইলেন।

তখন পথব্যা'র সঙ্ঘ-স্থবির সর্ব্বকামী বৈশালীতে উপস্থিত ছিলেন। ভিক্ষুর বর্ষগণনানুসারে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষু ছিলেন। তখন তাঁহার বয়স ভিক্ষুর বর্ষগণনানুসারে ১২০ বৎসর হইয়াছিল। রৈবত স্থবির সঙ্ঘের নির্দ্দেশানুসারে প্রাচ্য ভিক্ষুগণের মধ্যে সর্ব্বকামী, সাল্‌হ, কুব্জশোভিত ও বাসবগামী এই চারিজন সঙ্ঘস্থবির এবং পশ্চিম দেশীয় ভিক্ষুগণের মধ্যে রৈবত সম্ভূত, যশঃ ও সুমন এই চারিজন সঙ্ঘস্থবির, মোট আটজন সঙ্ঘ স্থবির বিচারক নির্ব্বাচিত হইলেন। এই বিচার সভায় সর্ব্বসাকল্যে ১২০০০০ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় কল্পতি সিঙ্গীলোণ কল্পং, কল্পতি দ্বঙ্গুল কল্পং, ইত্যাদি দশটি বিচার্য্য বিষয় নির্দ্ধারিত হয়। সঙ্ঘের সম্মতিক্রমে রৈবত স্থবির সর্ব্বকামীকে একে একে পূর্ব্বোক্ত বিচার্য্য বিষয়-সমূহ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করেন এবং তিনিও সঙ্ঘের অনুমতিক্রমে পূর্ব্বোক্ত বিনয় বিধান মতে তাঁহার মতামত জ্ঞাপন করেন। এইভাবে বিচার সভার কার্য্য সমাধা করা হইলে, পুনরায় ধর্ম্ম-বিনয় সঙ্গায়নের জন্য উক্ত সম্মিলিত ভিক্ষু হইতে ত্রিপিটক পারদর্শী শাস্ত্রবিদ, পণ্ডিত, মেধাবী ও ধর্ম্মভীরু ৭০০ শত ভিক্ষুসদস্য নির্ব্বাচিত হন এবং তাঁহারাই পুনঃ ধর্ম্ম-বিনয় সঙ্গায়ন করেন। এই সঙ্গীতির কার্য্য শেষ করিতে আট মাস সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল।

প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতির মধ্যে একটি বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথম সঙ্গীতি মুখ্যতঃ বিনয়-সঙ্গীতি এবং গৌণতঃ ধর্ম্ম সঙ্গীতি। ধর্ম্ম-বিনয় সম্ভূত বুদ্ধবচনগুলি সংগ্রহ করাই প্রথম সঙ্গীতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, এবং আনুষঙ্গিকভাবেই তন্মধ্যে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদগুলির বিচার করা হইয়াছিল। পক্ষান্তরে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদগুলির ব্যতিক্রমের ঔচিত্যানৌচিত্য সম্বন্ধে বিচারের জন্যই দ্বিতীয় সঙ্গীতির আবশ্যক হইয়াছিল এবং আনুষঙ্গিক ভাবেই তন্মধ্যে বুদ্ধবচনগুলি আবৃত্তি করা হইয়াছিল। বিনয় চুলবর্গের ১২শ খণ্ডকে দ্বিতীয় সঙ্গীতির সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন যে বিবরণ দেওয়া আছে, তন্মধ্যে ধর্ম্মবিনয় আবৃত্তির কথা আদৌ উল্লেখ নাই; অবশ্য ধর্ম্মবাদী বিনয়বাদী এই কথার উল্লেখ আছে এবং বিশেষ করিয়া বিবাদ-মীমাংসার কথাই বহুলাংশে পরিলক্ষিত হয়।

দ্বিতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন ঠিক কোন সময়ে, কোন স্থানে আহূত হইয়াছিল, এই সম্বন্ধে প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে একটু মতবৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। চুলবর্গের বিবরণ মতে দেখা যায় বৈশালীর বালুকারামেই দ্বিতীয় সঙ্গীতির স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু দীপবংশ, মহাবংশ প্রভৃতি গ্রন্থাদিতে যে বিবরণ আছে, তাহাতে দেখা যায় বৈশালীর মহাবন কূটাগার শালায় দ্বিতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল। কিন্তু সমন্তপাসাদিকা নামক বিনয় অর্থকথা চুলবর্গের সহিত একমত সমন্তপাসাদিকায় দ্বিতীয় সঙ্গীতি সম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে তাহা চুলবর্গের পুনরুক্তি বলিয়া মনে হয়। চুলবর্গের বিবরণে দেখা যায় বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের এক শত বৎসর পর দ্বিতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন হয় অবশ্য এই বিষয়ে অন্যান্য গ্রন্থাদিও একমত। চুলবর্গের বিবরণে কোন রাজার উল্লেখ নাই, কিন্তু দীপবংশাদি বংশ জাতীয় গ্রন্থাদিতে দেখা যায় শিশুনাগপুত্র কালাশোকের রাজত্বের সময় এবং তাঁহারই সহায়তায় দ্বিতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন হয়। ইহাতে কিছু আসে যায় না, কারণ চুলবর্গ একটি বিনয় সংগ্রহগ্রন্থ, বিনয় সম্বন্ধীয় বিষয়ের সহিতই ইহার সম্বন্ধ। দশ-বস্তুর বিচারই ইহার প্রাসঙ্গিক, তাহারই বিস্তৃত বিবরণ ইহাতে সন্নিবেশিত আছে। ইহার প্রসঙ্গ বহির্ভূত কথা পরবর্ত্তী বৌদ্ধ-গ্রন্থসমূহে ভিন্ন ভিন্ন আকারে বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় সঙ্গীতির বিবরণগুলির মধ্যে অসঙ্গতি আছে, ইহা স্বীকার করি। কিন্তু ইহার বিবরণগুলি ভিত্তিহীন—এই কথা বলা চলে না। যদিও কোন বৌদ্ধগ্রন্থে দ্বিতীয় সঙ্গীতির উল্লেখ নাই, তথাপি দীপবংশাদি বংশজাতীয় গ্রন্থাদিতে অজাতশত্রু হইতে কালাশোক পর্য্যন্ত রাজপরম্পরার যে ইতিবৃত্ত আছে, তাহা হইতে সত্যই প্রতীয়মান হয় যে, বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের এক শতাব্দীর মধ্যে দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহূত হইয়াছিল।

উপসংহারে ইহাই শুধু বলিতে চাই যে—দ্বিতীয় সঙ্গীতি সম্বন্ধে যে সমস্ত বিবরণ প্রাচীন পালিগ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ আছে তাহাই শুধু আলোচনা করিলাম। তাহাদের মধ্যে যে সামান্য এক আধটু অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয় তাহা পরিবেশকের বৈকল্য ঘটিলেও মূলতঃ বিষয়টা ঠিকই বলিতে হইবে। দ্বিতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন যে হইয়াছিল তাহা কেহই অস্বীকার করেন নাই। স্থান সম্বন্ধে যিনি যাহা মোটামুটি বলুন না কেন, বলা যায় যে বৈশালীতেই দ্বিতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল; কারণ যেখানে দশবস্তুর প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল সেইস্থানেই যে ইহার মীমাংসা করা হইয়াছিল ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পর দ্বিতীয়বার ধর্ম্ম-বিনয় আবৃত্তি করা হইয়াছিল বলিয়া ইহা দ্বিতীয় সঙ্গীতি নামে পরিচিত। সাতশত ভিক্ষুর সম্মিলনে হইয়াছিল বলিয়া ইহা সপ্তশতিক নামে অভিহিত। যশঃস্থবিরের উদ্যোগে এই সঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে

যশঃসঙ্গীতিও বলা যায়। বিনয়ের ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদসমূহের ঔচিত্যানৌচিত্য সম্বন্ধে বিচার করা হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে বিনয় সঙ্গীতিও বলা যায়। এই সঙ্গীতির কার্য্য আটমাস চলিয়াছিল বলিয়া ইহাকে অষ্টমাসিক সঙ্গীতিও বলা যাইতে পারে।

প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে আরও বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা হইল না। বারান্তরে সে সব বিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

অদ্বৈতবাদ

পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

অতএব মাণ্ডুক্যোপনিষৎ হইতে সখণ্ড সগুণ আত্মার পরিচয় পাওয়া যায় না, সুতরাং স্বগতভেদ সিদ্ধ হয় না। একই আত্মার অবস্থাভেদের জন্য স্বগতভেদ স্বীকার করা কখনই হইতে পারে না। প্রত্যুত নানা অবস্থার মধ্যে কোন বস্তু অবিকৃত থাকিলে সেই অবস্থাগুলিই তাহার কল্পিত বা মিথ্যা বলা হয়।

যদি বলা হয়—ত্রিপাদ দিবি, অর্থাৎ স্বর্গে 'অমৃত' বলায় এবং একপাদ' সর্ব্বভূত' বলায় ইহা যে বিরাটের কথা তাহাও বুঝায় না। কারণ, সর্ব্বভূত ও দ্যুলোকাদি উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে সূক্ষ্মরূপে বা বীজাকারে তাহা ব্রহ্মে বর্ত্তমান থাকে; কারণ, "তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ আকাশঃ সম্ভূতঃ" অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম হইতে আকাশ সম্ভূত হইল—এই তৈত্তিরীয় শ্রুতি হইতে আকাশাদির ব্রহ্মে সূক্ষ্মরূপে স্থিতি জানা যায়, নচেৎ ব্রহ্মের বিকার হয়—বলিতে হয়। অতএব আকাশাদি সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত যে আত্মাতে, সেই আত্মারই কথা এই মাণ্ডুক্যোপনিষদে বলা হইয়াছে। আর তজ্জন্য এই ছান্দোগ্যোপনিষদের বাক্যদ্বারা এই মাণ্ডুক্যোপনিষদের কথিত আত্মা বা ব্রহ্ম, স্বগতভেদবিশিষ্ট হইবে না কেন—ইত্যাদি?

তাহা হইলে বলিব—না, তাহা অসঙ্গত। কারণ, মাণ্ডুক্যোপনিষদে ব্রহ্ম বা আত্মার অবস্থাগত পাদভেদ অতিস্পষ্ট ভাবেই শব্দদ্বারা কথিত হইয়াছে। ইহাতে আত্মার স্বগতভেদের কথা একেবারেই নাই। অন্য শ্রুতির অন্য প্রসঙ্গে উক্তির আরোপে এই

অবস্থাগত পাদভেদকে স্বরূপগত পাদভেদে পরিণত করা কখনই সঙ্গত হয় না। আর ব্রহ্মে স্বগতভেদ স্বীকার করিলে তাহাকে ব্রহ্মভিন্নরূপেই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, ব্রহ্ম অবিকারী। তাহার একদেশ বিকারী হইলে আর তাহাকে অবিকারী বলা চলে না। আর ব্রহ্মের বিকারী ও অবিকারী উভয় অংশকে ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত করিয়া অবিকারী অংশকে ব্রহ্ম বলিলে 'ব্রহ্ম'-নামের কোন সার্থকতা থাকে না। যাহা অপেক্ষা বৃহৎ আর নাই, তাহাই যদি ব্রহ্ম নামের অর্থ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের উক্ত অবিকারী ও বিকারী অংশদ্বয় সমান বৃহৎ আর হয় না। এইরূপে এক্ষেত্রে ব্রহ্মনামের সার্থকতা থাকে না। অতএব ছান্দোগ্যোপনিষদের দ্বারা আত্মার এই পাদচতুষ্টয়কে স্বরূপগত পাদভেদ বলা সঙ্গত হয় না।

তাহার পর শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের বাক্যকে সগুণ ব্রহ্মপর বলিলে কোন অসঙ্গতি হয় না। কারণ, সেই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেই "সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ" (৬।১১) বলা হইয়াছে এবং শেষে "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্" (৬।১৯) ইহাও বলা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা ব্রহ্ম যে নির্গুণ তাহা শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে বলিলেন। আর মায়াযোগে সেই ব্রহ্ম যে সগুণ হন, তাহাও "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্ধি মায়িনং তু মহেশ্বর" (৪।১০) এই বাক্যে বলাই হইয়াছে। অতএব "ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারং চ মত্বা, সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ" (১।১২) এই সগুণ ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে—বলিতে কোন বাধা হয় না।

যদি বলা যায়—এস্থলে "ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ" বলিয়া ব্রহ্মকেই তো ত্রিবিধ বলা হইয়াছে; অতএব ব্রহ্মই ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরিতারূপে ত্রিবিধ, সুতরাং স্বগতভেদ ব্রহ্মের স্বীকার কেন করা হইবে না? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, এস্থলে "এতৎ ত্রিবিধং সর্ব্বং ব্রহ্ম" এইভাবে অন্বয় করিব, অর্থাৎ এই ব্রহ্মকে ত্রিবিধ বলিব না, কিন্তু "এই ত্রিবিধ সর্ব্বই ব্রহ্ম" বলিব। অর্থাৎ "এতৎ" পদের সহিত ব্রহ্মের অন্বয় না করিয়া "ত্রিবিধ"পদের অন্বয় করিব। সুতরাং ব্রহ্মকে আর ত্রিবিধ বলিতে হইবে না। যেমন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বাক্যে সর্ব্বকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, ব্রহ্মকে সর্ব্ব বলা হয় না, অর্থাৎ সর্ব্বকে ব্রহ্ম বলায় যেমন সর্ব্বে সর্ব্বত্ব আর থাকে না, কেবল ব্রহ্মই থাকেন, এস্থলেও "এই সব ত্রিবিধ" বলায় এইরূপ ব্রহ্মই হইয়া যায়। অর্থাৎ ব্রহ্মে এই ত্রিবিধ ভাব মিথ্যা—ইহাই সিদ্ধ হইয়া যায়। অতএব শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের বাক্যদ্বারাও এই মাণ্ডুক্যোক্ত আত্মার স্বরূপগত পাদভেদ করা সঙ্গত হয় না।

তাহার পর—এখানে উপক্রম উপসংহারের বিরোধ নাই যে, বলাবল বিচার সম্ভব হইবে? কারণ, উপক্রমমধ্যে আত্মাকে চতুষ্পাদ বলা হইয়াছে, তাহার তিনটী অবস্থারূপ তিনটী পাদকে নিরাস করিয়া অর্থাৎ অনাত্মা বলিয়া চতুর্থ অবস্থারূপ চতুর্থপাদকে "আত্মা বিজ্ঞেয়" বলায় সেই প্রথম তিনটী অবস্থারূপপাদ এই চতুর্থ পাদের মত নিত্য বলা হইল না।

বংশঃসঙ্গীতিও বলা যায়। বিনয়ের সূত্রান্তসূত্রে শিক্ষাপদসমূহের ঔচিত্যানুচিত্য সম্বন্ধে বিচার করা হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে বিনয় সঙ্গীতিও বলা যায়। এই সঙ্গীতির কার্য্য আটমাস চলিয়াছিল বলিয়া ইহাকে অষ্টমাসিক সঙ্গীতিও বলা যাইতে পারে।

প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে আরও বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা হইল না। বারান্তরে সে সব বিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

অদ্বৈতবাদ

পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

অতএব মাণ্ডুক্যোপনিষৎ হইতে সখণ্ড সগুণ আত্মার পরিচয় পাওয়া যায় না, সুতরাং স্বগতভেদ সিদ্ধ হয় না। একই আত্মার অবস্থাভেদের জন্য স্বগতভেদ স্বীকার করা কখনই হইতে পারে না। প্রত্যুত নানা অবস্থার মধ্যে কোন বস্তু অবিকৃত থাকিলে সেই অবস্থাগুলিই তাহার কল্পিত বা মিথ্যা বলা হয়।

যদি বলা হয়— ত্রিপাদ দিবি, অর্থাৎ স্বর্গে 'অমৃত' বলায় এবং একপাদ 'সর্বভূত' বলায় ইহা যে বিরাটের কথা তাহাও বুঝায় না। কারণ, সর্ব্বভূত ও দ্যুলোকাদি উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে সূক্ষ্মরূপে বা বীজাকারে তাহা ব্রহ্মে বর্ত্তমান থাকে ; কারণ, "তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ আকাশঃ সম্ভূতঃ" অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম হইতে আকাশ সম্ভূত হইল—এই তৈত্তিরীয় শ্রুতি হইতে আকাশাদির ব্রহ্মে সূক্ষ্মরূপে স্থিতি জানা যায়, নচেৎ ব্রহ্মের বিকার হয়—বলিতে হয়। অতএব আকাশাদি সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত যে আত্মাতে, সেই আত্মারই কথা এই মাণ্ডুক্যোপনিষদে বলা হইয়াছে। আর তজ্জন্য এই ছান্দোগ্যোপনিষদের বাক্যদ্বারা এই মাণ্ডুক্যোপনিষদের কথিত আত্মা বা ব্রহ্ম, স্বগতভেদবিশিষ্ট হইবে না কেন—ইত্যাদি ?

তাহা হইলে বলিব - না, তাহা অসঙ্গত। কারণ, মাণ্ডুক্যোপনিষদে ব্রহ্ম বা আত্মার অবস্থাগত পাদভেদ অভিপ্রায় ভাবেই শব্দদ্বারা কথিত হইয়াছে। ইহাতে আত্মার স্বগতভেদের কথা একেবারেই নাই। অন্য শ্রুতির অন্য প্রসঙ্গে উক্তির অনুরোধে এই

অবস্থাগত পাদভেদকে স্বরূপগত পাদভেদে পরিণত করা কখনই সঙ্গত হয় না। আর ব্রহ্মে দৃশ্যজগৎ স্বীকার করিলে তাহাকে ব্রহ্মভিন্নরূপেই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, ব্রহ্ম অবিকারী। তাহার একদেশ বিকারী হইলে আর তাহাকে অবিকারী বলা চলে না। আর ব্রহ্মের বিকারী ও অবিকারী উভয় অংশকে ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত করিয়া অবিকারী অংশকে ব্রহ্ম বলিলে 'ব্রহ্ম' নামের কোন সার্থকতা থাকে না। যাহা অপেক্ষা বৃহৎ আর নাই, তাহাই যদি ব্রহ্ম নামের অর্থ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের উক্ত অবিকারী ও বিকারী অংশদ্বয় সমান বৃহৎ আর হয় না। এইরূপে এক্ষেত্রে ব্রহ্মনামের সার্থকতা থাকে না। অতএব ছান্দোগ্যোপনিষদের দ্বারা আত্মার এই পাদচতুষ্টয়কে স্বরূপগত পাদভেদ বলা সঙ্গত হয় না।

তাহার পর শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের বাক্যকে সগুণ ব্রহ্মপর বলিলে কোন অসঙ্গতি হয় না। কারণ, সেই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেই "সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ" (৬।১১) বলা হইয়াছে এবং শেষে "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্" (৬।১৯) ইহাও বলা হইয়াছে। এতদ্বারা ব্রহ্ম যে নির্গুণ তাহা শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে বলিলেন। আর মায়াযোগে সেই ব্রহ্ম যে সগুণ হন, তাহাও "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্ধি মায়িনং তু মহেশ্বর" (৪।১০) এই বাক্যে বলাই হইয়াছে। অতএব "ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারং চ মত্বা, সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ" (১।১২) এই সগুণ ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে—বলিতে কোন বাধা হয় না।

যদি বলা যায়—এস্থলে "ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ" বলিয়া ব্রহ্মকেই তো ত্রিবিধ বলা হইয়াছে; অতএব ব্রহ্মই ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরিতারূপে ত্রিবিধ, সুতরাং স্বগতভেদ ব্রহ্মের স্বীকার কেন করা হইবে না? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, এস্থলে "এতৎ ত্রিবিধং সর্ব্বং ব্রহ্ম" এইভাবে অন্বয় করিব, অর্থাৎ এই ব্রহ্মকে ত্রিবিধ বলিব না, কিন্তু "এই ত্রিবিধ সর্ব্বই ব্রহ্ম" বলিব। অর্থাৎ "এতৎ" পদের সহিত ব্রহ্মের অন্বয় না করিয়া "ত্রিবিধ"পদের অন্বয় করিব। সুতরাং ব্রহ্মকে আর ত্রিবিধ বলিতে হইবে না। যেমন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বাক্যে সর্ব্বকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, ব্রহ্মকে সর্ব্ব বলা হয় না, অর্থাৎ সর্ব্বকে ব্রহ্ম বলায় যেমন সর্ব্বে সর্ব্বত্ব আর থাকে না, কেবল ব্রহ্মই থাকেন, এস্থলেও "এই সব ত্রিবিধ" বলায় এইরূপ ব্রহ্মই হইয়া যায়। অর্থাৎ ব্রহ্মে এই ত্রিবিধ ভাব মিথ্যা—ইহাই সিদ্ধ হইয়া যায়। অতএব শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের বাক্যদ্বারাও এই মাণ্ডুক্যোক্ত আত্মার স্বরূপগত পাদভেদ করা সঙ্গত হয় না।

তাহার পর—এখানে উপক্রম উপসংহারের বিরোধ নাই যে, বলাবল বিচার সম্ভব হইবে? কারণ, উপক্রমমধ্যে আত্মাকে চতুষ্পাদ্ বলা হইয়াছে, তাহার তিনটী অবস্থারূপ তিনটী পাদকে নিরাস করিয়া অর্থাৎ অনাত্মা বলিয়া চতুর্থ অবস্থারূপ চতুর্থপাদকে "আত্মা বিজ্ঞেয়" বলায় সেই প্রথম তিনটী অবস্থারূপপাদ এই চতুর্থ পাদের মত নিত্য বলা হইল না।

যদি একইসঙ্গে চারিটী অবস্থা থাকিত, যেমন ছান্দোগ্যোক্ত চারিটী পাদ একসঙ্গে থাকে, এবং সেই চারিটী অবস্থাকে উপক্রমে আত্মা বলিয়া উপসংহারে চতুর্থ অবস্থাকে আত্মা বলা হইত, তাহা হইলে বিরোধ হইত। কিন্তু জাগ্রতাদি অবস্থা এক সঙ্গে থাকে না; অতএব উপক্রম উপসংহারে এস্থলে বিরোধ নাই। এজন্য অরুন্ধতীদর্শন ন্যায়ে প্রথমে আত্মার স্থূল পরিচয় দিয়া শেষে প্রকৃত আত্মার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে—বলিতে হইবে। অতএব প্রকৃত আত্মা এক অদ্বৈত—ইহাই বলা এই উপনিষদের লক্ষ্য। এইরূপে এই উপনিষদে এই এক অদ্বৈতেরই সন্ধান পাওয়া গেল। মুক্তিকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে এই মাণ্ডুক্য উপনিষদ্‌খানি ১০৮ উপনিষদের সার। এজন্য ইহার আদর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বস্তুতঃ এই উপনিষদেরই উপর ব্যাসপুত্র শুকদেবের শিষ্য গৌড়পাদাচার্য্য কারিকা রচনা করিয়া গিয়াছেন, এবং এই কারিকার উপর শঙ্করাচার্য্য ভাষ্য করিয়াছেন এবং আনন্দগিরি সেই ভাষ্যের উপর টীকাও করিয়াছেন। এই কারিকারমধ্যে অদ্বৈতবাদ সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত হইয়াছে। শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ এই মাণ্ডুক্যোপনিষৎ ও তাহার কারিকার অনুসরণ করিয়া যে তাঁহাদের মতের পুষ্টি করিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ হয় না। কারণ এই শূন্যবাদী বৌদ্ধমধ্যে দুইটী শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। একদল শূন্যকে সৎস্বরূপ বা সুখস্বরূপ বলিয়াছেন, অপর দল তাহাকে নিস্তত্ত্ব অর্থাৎ কিছুই না বলিলে যাহা বুঝায় তাহাই বলেন। ব্যাসাদি ঋষিগণ ও বৈদিক আচার্য্যগণ এই নিস্তত্ত্ব শূন্যবাদীর মতই নানারূপে খণ্ডন করিয়াছেন। শূন্যকে যাঁহারা সৎস্বরূপ বা সুখস্বরূপ বলেন তাঁহাদের মত তাঁহারা খণ্ডন করেন নাই। এই নিস্তত্ত্ব শূন্যবাদী বৌদ্ধই প্রাচীন বৌদ্ধ। ইহারা গৌতম বুদ্ধের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। গৌতম বুদ্ধ, বৈদিক ঋষি ও আচার্য্যগণকে নিস্তত্ত্ব শূন্য খণ্ডন করিতে দেখিয়া, মনে হয়, মধ্যে মধ্যে শূন্যকে সৎস্বরূপ এবং সুখস্বরূপ বলিয়া ফেলিয়াছেন। পালি ত্রিপিটকে বুদ্ধের উক্তি মধ্যে দ্বিবিধ শূন্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়। আর এই জন্য বর্ত্তমানের জাপানী বৌদ্ধগণ বুদ্ধবাক্যানুসরণ করিয়াই শূন্যকে অসৎ বলেন না। তাঁহারা এই কথার উপর ভিত্তি করিয়া শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতিকে বৌদ্ধমতানভিজ্ঞ বলিতেও উৎসাহিত হন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যপ্রভৃতি আচার্য্যগণ যে, ঋষিগ্রন্থের টীকাদি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ঋষিপ্রোক্ত প্রাচীন বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহারা বিস্মৃত হন। আচার্য্যগণ সেই প্রাচীন বৌদ্ধমতের বিবৃতি করিবার জন্য যে মধ্যে মধ্যে গৌতম বুদ্ধের পরবর্ত্তী বৌদ্ধাচার্য্যগণের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহাদের এই ভ্রম হয়। বস্তুতঃ প্রাচীন বৌদ্ধমতের অনুসরণকারী আধুনিক একদলও যে ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহই হয় না। সেই জন্যই আচার্য্যগণ তাঁহাদের বাক্যের দ্বারা সেই প্রাচীন বৌদ্ধমত বিবৃত করিয়াছেন। প্রাচীন শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ অসৎখ্যাতিবাদী ছিলেন, কিন্তু শূন্যকে যাঁহারা সৎস্বরূপ ও সুখস্বরূপ বলেন, সেই বৌদ্ধগণের মত যে

অসৎখ্যাতিবাদ নহে তাহা সহজেই বুঝা যায়। নাগার্জ্জুন এই অসৎ শূন্যকে চতুষ্কোটিবিনির্মুক্ত বলিয়া প্রকারান্তরে অসৎখ্যাতিবাদী প্রাচীন বৌদ্ধমতেরই পুষ্টি করিয়াছেন। ফলতঃ গৌতম বুদ্ধের শূন্য যে এই মাণ্ডুক্যোপনিষদ ও তাঁহার কারিকা অবলম্বনে উদ্ভাবিত, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। অব্যবহার্য্য, অলক্ষণ, প্রপঞ্চোপশম, শান্ত, শিব, অব্যপদেশ্য প্রভৃতি শব্দ নাগার্জ্জুন প্রভৃতির গ্রন্থে ভুরি ভুরি পাওয়া যায়। এই মাণ্ডুক্যোপনিষদের অনুরূপ উপনিষদ্ নৃসিংহোত্তর তাপণীয়মধ্যে 'শূন্য' শব্দই ব্রহ্ম অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই জন্য গৌতম বুদ্ধের মতের অবলম্বন যে এই উপনিষৎ ও ইহার কারিকাগ্রন্থ, তাহাতে আর সন্দেহ হয় না। বিশেষ এই যে, প্রাচীন বৌদ্ধগণ বেদমান্য করিতেন আর এই গৌতম বুদ্ধ কিন্তু বেদ অমান্য করিয়াছেন। যাহা হউক এ সকল কথা পরে যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

ইহার ষড়্‌বিধ তাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিঙ্গগুলি এই—

(১) উপক্রম—"ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং"। ১

উপসংহার "আত্মাত্রশ্চতুর্থো"। ১২

(২) অভ্যাস—"প্রপঞ্চোপশমং শান্তম্। ১২

(৩) অপূর্ব্বতা—"অদৃষ্টমব্যবহার্য্যম্। ৭

(৪) ফল—"সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ"। ১২

(৫) অর্থবাদ—"আপ্নোতি হবৈ সর্ব্বান্ কামান্" ৯।

(৬) উপপত্তি—"সোঽয়মাত্মাধ্যক্ষরম্ ... ৎ। ১

যাহাহউক এতদ্বারা অদ্বৈতবাদই প্রতিপন্ন হয়, অজমতবাদ নহে।

ইতি মাণ্ডুক্যোপনিষৎ সমাপ্ত।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

এইবার দেখা যাউক সপ্তম তৈত্তিরীয়োপনিষদে তত্ত্ববোধক বাক্যগুলি হইতে কি রূপ অদ্বৈততত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায় ইহার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ব্রহ্মানন্দবল্লীর প্রথমেই দেখা যায়—

১। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ২।১

অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্তস্বরূপ। এখানে এই তিনটী পদের দ্বারাই ব্রহ্ম যে "এক ও অদ্বৈত" তাহা জানিতে পারা যায়। তন্মধ্যে "অনন্ত" এই পদের দ্বারা অতি স্পষ্টভাবেই অদ্বৈতবাদীর অদ্বৈতের সন্ধান প্রদান করা হইয়াছে, অর্থাৎ

যে কোন প্রকারেই কিছু স্বীকার করা হইবে, তাহাতেই অনন্তত্বের হানি হইবে। এ জন্য একপদদ্বারা সেই এক অদ্বৈতেরই সন্ধান পাওয়া গেল। তদ্রূপ সত্যস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ বলাতেও' সেই অদ্বৈত বস্তুরই সন্ধান পাওয় যায়। ইহার বিশদ 'ব্যাখ্যা পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে, এজন্য এখানে আর পুনরুক্তি করা হইল না। তথাপি সংক্ষেপে এই সত্য বা সৎস্বরূপ বস্তু এক অদ্বৈতই হয়। কারণ, যাহা কিছু "আছে বা নাই" বলা হয়, তাহাতেই সত্তারও একটা জ্ঞান আমাদের হয়। ঘট আছে বলিলে যেমন ঘটসত্তার'জ্ঞান হয়, তদ্রূপ ঘট নাই—বলিলে ঘটাভাব আছে—এইরূপ জ্ঞানই হয়। এজন্য যাহা কিছুরই জ্ঞান হয়, তাহাতে সত্তার জ্ঞান অনুবৃত্ত হয়, আর যাহা সকল বস্তুতে অনুবৃত্ত হয় তাহা সেই সকল বস্তু হইতে পৃথকই হয়। এই সকল বস্তুকে উপাধি বলা হয়। এই উপাধিশূন্য সত্তাই বা সত্য বস্তুই অদ্বৈতবস্তু হয়। এজন্য "সত্যং"-পদদ্বারা সেই এক অদ্বৈত বস্তুরই সন্ধান পাওয়া যায়। তদ্রূপ "জ্ঞানং" এই পদদ্বারাও সেই এক অদ্বৈত বস্তুরই সন্ধান পাওয়া যায়। কারণ, জ্ঞান ভিন্ন কোন বস্তুরই সত্তা সিদ্ধ হয় না। যাহা জানা যায় বা জানা যায় না—এরূপ যাবৎ বস্তুই জ্ঞানদ্বারা প্রকাশিত বা সিদ্ধ হয়। এখন ঘটজ্ঞান পটজ্ঞান প্রভৃতি যাবৎ জ্ঞানেই ঘটপটাদি উপাধি হয়। এই উপাধি বাদ দিলে যে জ্ঞান থাকে তাহা এক অদ্বৈত বস্তুই হয়। জ্ঞান ও সত্য—এই উভয়ই উপাধিহীন হইলে অদ্বৈত হয় বলিয়া এবং ও সত্য ভিন্নভাবে না থাকায় এতদুভয়ের দ্বারা অদ্বৈতেই সন্ধান পাওয়া গেল। তদ্রূপ আনন্দ পদদ্বারাও সেই অদ্বৈতেরই সন্ধান পাওয়া যায়। এইজন্য অন্যত্র ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ বলা হইয়াছে। এই উপনিষদেও ব্রহ্মকে সত্য জ্ঞান, ও অনন্ত বলিয়া "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" বলিয়া তাহাকে আনন্দস্বরূপও বলা হইয়াছে। অতএব এই "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্" শ্রুতির দ্বারা সেই অদ্বৈতবাদীর অদ্বৈতেরই কথা বলা হইয়াছে।

২। "তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ,আকাশাদ্ বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী, পৃথিব্যাঃ ওষধয়ঃ, ওষধীভ্যোঽন্নম্, অন্নাৎ পুরুষঃ, স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ।"২।১

অর্থাৎ "সেই এই আত্মা হইতে আকাশ হইয়াছে, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধি সকল, ওষধি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে পুরুষ, সেই পুরুষ হইতেছেন অন্ন-রসময়।"

এস্থলে সেই ব্রহ্মকে আত্মা বলিয়া তাহা হইতেই সমুদায়ের উৎপত্তি বলার মূলে এক অদ্বৈতেরই সন্ধান প্রদত্ত হইল। জীবের আত্মা ও ব্রহ্ম, উহারা যে অভিন্ন, তাহাই বলা হইলে। এ স্থলে সেই ব্রহ্মরূপী আত্মার সহিত, উৎপত্তির সহায় প্রকৃতি বা শক্তি বা পরমাণু বা কাল প্রভৃতি কোন কিছুরই নাম না করায় দ্বৈতবাদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ কোন মতবাদই উপদিষ্ট হইল না, কিন্তু শুদ্ধ অদ্বৈতবাদই উপদিষ্ট হইল।

যদি বলা যায়—সেই ব্রহ্মরূপী আত্মা হইতে জীব ও জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে—বলায় ব্রহ্মের এক অংশের বিকার স্বীকার করিব ? আর তাহা হইলে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই উপদিষ্ট বলিব ?

তাহা হইলে বলিব—না, তাহা নহে। কারণ, পরবর্ত্তী বাক্যসমূহে এই অন্নরসময় ব্রহ্মাত্মরূপী পুরুষের অন্তরে প্রাণময়, তাহার অন্তরে মনোময়, তাহার অন্তরে বিজ্ঞানময় ও তাহার অন্তরে আনন্দময় বলিয়া সেই আনন্দময়ের আশ্রয় ব্রহ্ম—ইহা "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" এই বাক্যে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি হইলেও সেই ব্রহ্মকে আশ্রয় বলায়, ব্রহ্মের এক অংশের বিকার হয় নাই—ইহাই বলিতে হইবে। কারণ, ব্রহ্মের এক অংশের বিকার স্বীকার অভিপ্রেত হইলে ব্রহ্মের অবশিষ্ট অংশকে প্রতিষ্ঠারূপী পুচ্ছ অর্থাৎ আশ্রয় বলা হইত। কিন্তু তাহা না বলিয়া ব্রহ্মকেই আশ্রয় বলা হইয়াছে। এখানে 'ব্রহ্ম' এই পদের অর্থ ব্রহ্মের অবশিষ্ট অংশ বলিলে 'ব্রহ্ম'পদের অর্থ সংকোচ করা হইবে। অতএব অদ্বৈত ও সত্য, এবং জীব ও জগৎ তাহাতে কল্পিত বা মায়া মাত্র, অর্থাৎ মিথ্যা—ইহাই এ স্থলে বলা হইল। ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া তাহা ব্রহ্মকেই আশ্রয় করিয়া থাকিলে, তাহা ব্রহ্মে কল্পিত ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। এ জন্য এই শ্রুতিদ্বারা অপর কোন মতবাদই উপদিষ্ট হয় নাই—বলিতে হইবে। এ স্থলে ব্রহ্মসূত্রের বৃত্তিকার পাণিনি মুনির গুরু উপবর্ষের মতের অনুসরণ করিয়া আচার্য্য ভাস্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই আনন্দময় আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন। কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর ইঁহাদের বহুপূর্ব্বেই তাহা নানা যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। খণ্ডনের প্রধান কারণ এই যে, আনন্দময় যদি ব্রহ্ম হইতেন, তাহা হইলে এই আনন্দময়ের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়রূপ পুচ্ছকে বলা হইত না। বৃত্তিকার মতানুসারিগণের অভিসন্ধি এই যে, আনন্দময় ব্রহ্ম হইলে আনন্দময়ের পুচ্ছাদি অঙ্গ থাকায় ব্রহ্মেরও অঙ্গ থাকিবে। সুতরাং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই সিদ্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, ও বিজ্ঞানময়ের যেমন অঙ্গদের কথা বলা হইয়াছে, তদ্রূপ আনন্দময়েরও অঙ্গের কথা বলায় আনন্দময়ও উক্ত অন্নময়াদিরই ন্যায় কোষবিশেষ হইতেছেন, ব্রহ্মরূপ আর হইতেছেন না। অন্ন-রসময়ের অঙ্গ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা এই—

"তস্য ইদমেব শিরঃ, অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ, অয়ম্ উত্তরঃ
পক্ষঃ, অয়ম্ আত্মা, ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা॥" ২।১

অর্থাৎ "সেই অন্ন-রসময় পুরুষের এই মস্তকই মস্তক, এই দক্ষিণ বাহুই দক্ষিণ পক্ষ,

এই বাম বাহুই উত্তর পক্ষ, এই দেহের মধ্যভাগই আত্মা, আর এই নাভির অধোভাগ প্রতিষ্ঠারূপী পুচ্ছ। তদ্রূপ প্রাণময়ের অঙ্গ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ অন্নরসময়াৎ, অন্যোঽন্তর
আত্মা প্রাণময়ঃ,তেনৈষ পূর্ণঃ, স বা এষ পুরুষ-
বিধ এব, তস্য পুরুষবিধতাম্ অন্বয়ং পুরুষ
বিধঃ, তস্য প্রাণ এব শিরঃ, ব্যানো দক্ষিণঃ পক্ষঃ,
অপান উত্তরঃ পক্ষঃ, আকাশ আত্মা,
পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।"

অর্থাৎ "সেই এই অন্নরসময় পুরুষ হইতে অন্য, অথচ তাহার অভ্যন্তরে অবস্থিত প্রাণময় আত্মা, তাহার দ্বারা এই অন্নরসময় পুরুষ বা আত্মা পূর্ণ। এই প্রাণময় আত্মাও অন্নরসময় পুরুষেরই ন্যায়, সেই অন্ন-রসময়ের পুরুষাকারতার সদৃশ এই প্রাণময়ের পুরুষাকারতা। তাহার প্রাণই মস্তক, দক্ষিণ পক্ষ ব্যান, উত্তর পক্ষ অপান, দেহের মধ্য-ভাগ রূপ আত্মা আকাশ, এবং প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়রূপ পুচ্ছ—পৃথিবী। তদ্রূপ মনোময়ের অঙ্গ সম্বন্ধে বলা হইতেছে—

"তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ প্রাণময়াৎ, অন্যোঽন্তর আত্মা
মনোময়ঃ, তেনৈষ পূর্ণঃ, স বা এষ পুরুষবিধ এব।
তস্য পুরুষবিধতাম্, অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য
যজুরেব শিরঃ, ঋগ্ দক্ষিণঃ পক্ষঃ, সামোত্তর পক্ষঃ,
আদেশ আত্মা, অথর্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।"

অর্থাৎ "সেই এই প্রাণময় পুরুষ হইতে অন্য, অথচ অভ্যন্তরে অবস্থিত মনোময় আত্মা, তাহার দ্বারা এই প্রাণময় পুরুষ বা আত্মা পূর্ণ। এই মনোময় আত্মাও প্রাণময় পুরুষেরই ন্যায়, সেই প্রাণময়ের পুরুষকার সদৃশ মনোময়ের পুরুষাকারতা, তাহার যজুই মস্তক, দক্ষিণপক্ষ ঋগ্। উত্তর পক্ষ সাম, দেহের মধ্যভাগরূপ আত্মা আদেশ এবং প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়রূপ পুচ্ছ—অথর্বাঙ্গিরস। তদ্রূপ বিজ্ঞানময়ের অঙ্গ স্বরূপ বলা হইয়াছে—

"তস্মাদ্ বা এতস্মাৎ মনোময়াৎ, অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ
তেনৈষ পূর্ণঃ, স বা এষ পুরুষবিধ এব, তস্য পুরুষবিধতাম্
অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য শ্রদ্ধৈব শিরঃ, ঋতং দক্ষিণঃ পক্ষঃ,
সত্যম্ উত্তরঃ পক্ষঃ, যোগ আত্মা, মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।"

অর্থাৎ সেই এই মনোময় পুরুষ হইতে অন্য, অথচ অভ্যন্তরে অবস্থিত বিজ্ঞানময় আত্মা,

তাহার দ্বারা এই মনোময় পুরুষ বা আত্মা পূর্ণ। এই বিজ্ঞানময় আত্মাও মনোময় পুরুষেরই ন্যায়, সেই মনোময়ের পুরুষাকারতার সদৃশ বিজ্ঞানময়ের পুরুষাকারতা। শ্রদ্ধাই তাহার মস্তক, ঋত তাহার দক্ষিণ পক্ষ, সত্য তাহার উত্তর পক্ষ, যোগ তাহার আত্মা, অর্থাৎ দেহের মধ্যভাগ, এবং মহঃ অর্থাৎ বুদ্ধি তাহা প্রতিষ্ঠারূপী পুচ্ছ।

তদ্রূপ আনন্দময়ের অঙ্গ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"তস্মাদ্বা এতস্মাদ্ বিজ্ঞানময়াদ, অন্যোঽন্তর

আত্মা আনন্দময়:। তেনৈষ পূর্ণ:, স বা এষ পুরুষবিধ এব, তস্য পুরুষবিধতাম্, অন্বয়ং পুরুষবিধ:। তস্য প্রিয়মেব শির:, মোদো দক্ষিণ: পক্ষ:, প্রমোদ উত্তরপক্ষ:, আনন্দ আত্মা, ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।"

অর্থাৎ "সেই এই বিজ্ঞানময় পুরুষ হইতে অন্য অথচ অভ্যন্তরবর্ত্তী আত্মা আনন্দময়। তাহার দ্বারা এই বিজ্ঞানময় পুরুষ বা আত্মা পূর্ণ। এই আনন্দময় আত্মাও বিজ্ঞানময় পুরুষের ন্যায়। সেই বিজ্ঞানময়ের পুরুষাকারতার সদৃশ এই আনন্দময়ের পুরুষাকারতা। প্রিয় তাহার মস্তক, মোদ তাহার দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ তাহার উত্তর পক্ষ, আনন্দ অর্থাৎ সামান্যাকার সুখ তাহার আত্মা বা দেহের মধ্যভাগ। ব্রহ্ম তাহার প্রতিষ্ঠারূপ পুচ্ছ।

এ স্থলে প্রিয় শব্দের অর্থ—অভীষ্ট পুত্রাদিদর্শনজনিত আনন্দ বা সুখ, মোদ শব্দের অর্থ—প্রিয় বস্তু লাভে যে হর্ষরূপ আনন্দ তাহা, প্রমোদ অর্থ প্রিয় বস্তুর ভোগ জনিত উৎকর্ষতাপ্রাপ্ত হর্ষরূপ আনন্দ, এবং আনন্দ শব্দের অর্থ সামান্যাকার সুখ বা আনন্দ। অর্থাৎ প্রিয়, মোদ ও প্রমোদমধ্যে যাহা সাধারণরূপে বর্ত্তমান, তাহাই এই আনন্দ পদবাচ্য। এখন এই "আনন্দময় আত্মা" যদি ব্রহ্ম হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার অঙ্গের কথা আর বলা হইত না। বস্তুত: এই আনন্দময় আত্মার পুচ্ছকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম যদি আনন্দময় আত্মা হন, তাহা হইলে তিনি আবার তাহার পুচ্ছ হন কি প্রকারে? অঙ্গী ও অঙ্গ তো এক অভিন্ন বস্তু হয় না। অতএব আনন্দময় আত্মা ব্রহ্ম নহেন।

তাহার পর এই আনন্দময়রূপ আত্মার আত্মাকে অর্থাৎ দেহের মধ্যভাগকে আনন্দ বলা হইয়াছে। সুতরাং আনন্দময়কে ব্রহ্ম বা আত্মা বলিলে তাহার অঙ্গরূপ দেহের মধ্যভাগকে আবার আনন্দ বলা যায় কি করিয়া? অগত্যাদিরূপে সমস্ত এস্থলে "আনন্দময়" ও "আনন্দ" মধ্যে কিছু ভেদ স্বীকার করিতেই হইবে। তাহা না হইলে আনন্দময়ের মস্তকাদিও আনন্দই হইবে। এইরূপে দেহমধ্যভাগ ও মস্তকাদির মধ্যে আর ভেদ থাকিল না। অথচ শ্রুতিতে এই ভেদ স্বীকার করিয়াই বিভিন্ন অঙ্গের নাম করা হইয়াছে। কিন্তু আনন্দময় যদি ব্রহ্ম বা আত্মা না হন, তাহা হইলে তাঁহার মধ্যভাগ

আনন্দ হইতে পারিবে, এবং দেহমধ্যভাগ ও মস্তকাদির অভেদ শঙ্কা থাকে না। অতএব আনন্দময় আত্মা ব্রহ্ম নহেন।

তাহার পর আনন্দকে শ্রুতিতে ব্রহ্মানন্দবল্লীতেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। যথা—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনঃ" অর্থাৎ ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ জানিলে আর কোথা হইতেও ভীত হইতে হয় না। তৎপরে পরবর্তী ভৃগুবল্লীতে "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" অর্থাৎ ভৃগু আনন্দকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিলেন, ইত্যাদি। এখন এই আনন্দ যাঁহাতে প্রচুর, তিনি তাহা হইলে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মভিন্ন কিছু বস্তুবিশেষ নিশ্চিতই হইবেন। আর তজ্জন্য তাঁহাকে আনন্দময় বলিতে কোন বাধা হইবে না। বস্তুত মাণ্ডুক্যোপনিষদে আনন্দময়কে চতুষ্পাৎ ব্রহ্মের তৃতীয় পাদ "প্রাজ্ঞ" এবং "সর্ব্বজ্ঞ সর্বেশ্বর" ইত্যাদি বলা হইয়াছে। যথা—

"যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎসুষুপ্তম্।
সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এব আনন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ
প্রাজ্ঞস্তৃতীয় পাদঃ ॥৫। এষ সর্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যামী এষ যোনিঃ
সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যায়ৌ হি ভূতানাম্" ॥ ৬ ॥

অর্থাৎ যেখানে নিদ্রিত ব্যক্তি কোন কামনা করে না, কোন স্বপ্ন দেখে না, তাহা সুষুপ্তস্থান। তাহা একীভূত, প্রজ্ঞানঘন, আনন্দময় আনন্দভোক্তা, চেতোমুখ, সকল ভূতের কারণ, এবং লয়ের স্থান।"

আর যাহাকে তুরীয় বা চতুর্থপাদ বলা হইয়াছে, তাহাকে বলা হইয়াছে—

"অদৃষ্টম্ অব্যবহার্য্যম্ অলক্ষণম্ অচিন্ত্যম্
অব্যপদেশ্যম্ একাত্মপ্রত্যয়সার প্রপঞ্চোপশমং
শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ" ।৭

অর্থাৎ "যাহা অদৃশ্য, অব্যবহার্য্য, অগ্রাহ্য, অলক্ষণ, অচিন্ত্য, অব্যপদেশ্য, একাত্মপ্রত্যয়সার, প্রপঞ্চের লয়স্থান, শান্ত শিব অদ্বৈত, তাহাই চতুর্থ, তাহাই আত্মা, তাহাই জ্ঞেয়"। সুতরাং বুঝা যাইতেছে "আনন্দময়" ব্রহ্ম নহেন বা আত্মা নহে কিন্তু তাহা সর্ব্বান্তরতম কোশবিশেষ, তাহার মধ্যে আত্মা বা ব্রহ্ম বস্তু অবস্থিত। আর আত্মাই যে ব্রহ্ম তাহা এই শ্রুতির প্রথমেই বলা হইয়াছে, যথা—

"সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ।"১।২

অর্থাৎ সেই সবই ব্রহ্ম, এই আত্মা ব্রহ্ম, সেই এই আত্মা চতুষ্পাদ্।" অতএব আনন্দময় ব্রহ্ম নহেন, কিন্তু তাহা কোশবিশেষ, সুতরাং তাহা সেই কোশবিশিষ্ট আত্মা বা ব্রহ্ম অর্থাৎ সোপাধিক ব্রহ্ম অর্থাৎ ঈশ্বর বা প্রাজ্ঞ জীব। এই ঈশ্বর—সমষ্টি, আর

প্রাজ্ঞ তাঁহার ব্যষ্টি। তাহার পর তৈত্তিরীয় আরণ্যকে এবং মহানারায়ণোপনিষদে বিরজা হোমের সময় অন্নময়াদির ন্যায় আনন্দময়কেও আহুতি দিবার উপদেশ আছে, যথা—

"অন্নময়-প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়ানন্দময়াত্মা মে শুধ্যন্তাং
জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা"

(প্রপাঠক ১০ অনুবাক ৫৭, মন্ত্র ৭ম, নারায়ণোপনিষৎ। তৈত্তিরীয় আরণ্যক, মহানারায়ণোপনিষৎ ৬৬)

অর্থাৎ আমার অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোশগুলি শুদ্ধ হউক, আমি বিরজ বিগতপাপ জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা।" আরণ্যকে আত্মা এই পদটী নাই। কিন্তু উপনিষদে আত্মা পদটী আছে। আনন্দময় আত্মা হইলে তাহার ত্যাগের বা শুদ্ধির ব্যবস্থা থাকিত না। অতএব এই আনন্দময় আত্মা বা ব্রহ্ম নহেন।

বিশ্বগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী বেদানন্দ

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দী ভারতবর্ষের জাতীয় ইতিহাসে এক প্রচণ্ড পরিবর্তন আনিয়াছিল। এই শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গেই পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রচণ্ড প্লাবন ভারতীয় হিন্দুর ধর্মসংস্কার, সামাজিক জীবন ও শিক্ষার ধারায় নানা বিপর্য্যয় সৃষ্টি করিতেছিল। বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি আপনার আশ্চর্য্য সমারোহ ও মোহময় চাকচিক্যে দেশের যুবকবৃন্দের চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে অভিভূত ও বিভ্রান্ত করিতে লাগিল। পাশ্চাত্যের মনোমুগ্ধকর সভ্যতা, তাহার বিশাল ও সমৃদ্ধ সাহিত্য, তাহার জড়বাদ ভোগ সর্ব্বস্বতা, দেহাত্মবাদ ইত্যাদি ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালী যুবকবৃন্দের অধিকাংশকেই কুপ্রভাবগ্রস্ত করিয়া ফেলিল। জাতীয় ভাব-বিবর্জ্জিত ও পাশ্চাত্যভাবাপন্ন বাঙলার যুবক সমাজের মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দু আচার ব্যবহার, হিন্দুর নৈতিক বিশ্বাস সমস্তই উপেক্ষা অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার বিষয় হইয়া উঠিল। ক্রমে তখনকার ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালী যুবকগণ হিন্দু মত ও সংস্কারকে বর্জ্জন করিয়া নাস্তিক হইতে

লাগিলেন। আলেকজাণ্ডার ডাফ, কেরী, মার্শম্যান প্রভৃতি খৃষ্টান মিশনারীরাও এই সময়ে কলিকাতা, শ্রীরামপুর, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি বাঙলার প্রধান প্রধান সহরে ও নগরে প্রবল উৎসাহে খৃষ্টধর্ম প্রচার করিয়া বহু হিন্দু যুবককে খৃষ্টান করিতে লাগিলেন। সেই সময় দেশে অনেক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন বটে, কিন্তু যে শক্তি যে দিব্য মহাজ্ঞান থাকিলে ধর্মভাবকে জাগ্রত জীবন্ত ও সক্রিয় করিয়া জাতির স্বাতন্ত্র্যকে সুদৃঢ় করা যায়, সেই তপস্যার শক্তি বা ব্রহ্মজ্ঞান পণ্ডিত মহাশয়দিগের মধ্যে আদৌ ছিল না। ধর্মের মূলনীতি অপেক্ষা তাঁহারা বরং নানা যুক্তিহীন অসার আচার, ভ্রান্তপ্রথা ও কুসংস্কারকে প্রকৃত হিন্দুধর্ম বলিয়া মনে করিতেন। বেদবিরুদ্ধ, ঋষিবিরুদ্ধ, বহু ভ্রান্ত আচারে ও কুপ্রথায় তখন হিন্দু সমাজ আচ্ছন্ন ছিল—শুধু কতকগুলি গ্রাম্য কুসংস্কার, লোকাচার, দেশাচার ও স্ত্রীআচারই হিন্দুসমাজে ধর্ম বলিয়া পরিগণিত হইত। সমাজের নেতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা মোটেই ছিল না বলিয়া তাঁহারা বিধর্মী ও বিদেশীদের দেহাত্মবাদ ও খৃষ্টধর্ম প্রচারের প্রবল আক্রমণকে কোনক্রমে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হন নাই। অপর পক্ষে ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি নব্য সম্প্রদায় পাশ্চাত্যভাব ও উপনিষদের সুপ্রাচীন ধর্মাদর্শের সংমিশ্রণে যে ধর্ম আন্দোলন করিতেছিলেন তাহা বহু ইংরাজী শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ধনী ও মানীর নিকট গ্রহণীয় হইলেও বিদেশী পদ্ধতিতে গঠিত ও পরিচালিত বলিয়া এদেশের মাটিতে তাহা সতেজ উন্নত তরুর ন্যায় শিকড় বাঁধিতে পারিল না। এইজন্য এই সকল সংস্কারপন্থী সম্প্রদায় কোন কোন বিষয়ে দেশের বহু হিতসাধন করিলেও ইহাঁদের প্রচারিত ধর্মমত দেশের জনসাধারণের মধ্যে কোনই প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না। একদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে প্রভাবিত দেহাত্মবাদী, নাস্তিক ও খৃষ্টানদের সর্বনাশকর অভিযান—অন্যদিকে ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি বিদেশী-প্রভাবিত নব্যতন্ত্রের অভ্যুদয়—আবার অন্যদিকে শতাব্দীব্যাপী কুসংস্কার ও অনর্থ আচারের অচলায়তনের মধ্যে রক্ষণশীল হিন্দুদের তথাকথিত ধর্মের আস্ফালন ও তাহার 'বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা'।

ধর্মহীনতা, অনাচার, তামসিকতা, অপবিত্রতা প্রভৃতি নানাবিধ আসুরিক ও অপবিত্রভাবে সমস্ত ভারতবর্ষ বিশেষ করিয়া বাঙলা দেশ তখন যেন ঘোর অবনতির অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। যাঁহারা প্রকৃত ধর্মজিজ্ঞাসু তাঁহারা কোনদিকেই ধর্মলাভের সুযোগ সন্ধান না পাইয়া বিভ্রান্ত, ব্যাকুল দিশাহারা ও নিরাশ হইয়া পড়িতেছিলেন। সেই দারুণ ধর্ম-সঙ্কটের দিনে কি হিন্দু কি অহিন্দু কি ভারতবাসী অথবা বিদেশী কোন শিক্ষিত ব্যক্তিই ভ্রান্তি অজ্ঞতা অথবা বিবেকবুদ্ধির জন্য বিশ্বাস করিতে পারিতেন না যে হিন্দুধর্মের যথার্থ একটা মহিমামণ্ডিত স্বরূপ বা তাহার একটা বিরাট স্বাতন্ত্র্য আছে।

যখন চারিদিকে এই নিরাশার ঘনঘোর অন্ধকার ভারতের তথা সমগ্র জগতের ধর্ম-আকাশে তিমির অমানিশার সৃষ্টি করিয়াছিল—সেই সময় অকস্মাৎ কোন অদৃশ্য উদয়গিরি হইতে

হইতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল উদয় উষার উদার অরুণ জ্যোতি। বিস্মিত নেত্রে প্রত্যেক মুক্তিকামী দেখিল ভাগীরথী-তীরে দক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটী তপোবনে সমাসীন জগজ্জনীর বরপুত্র হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়কারী শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের জীবনে সাধনাদ্বারা প্রমাণ করিলেন, "ঈশ্বর নিশ্চয়ই আছেন—তিনি এক—কিন্তু তাঁহার বিভিন্ন নাম—প্রত্যেক ধর্ম্মমত তাঁহাকে লাভ করিবার এক একটি পথ। ঈশ্বর, আল্লা, God, Jove হরি, পরমাত্মা জগজ্জননী তাঁহারই ভিন্ন ভিন্ন নাম।" নিজের অপরিমেয় ও অভ্রভেদী ধর্ম্মানুভূতি সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়ই বলিতেন, "এখানকার উপলব্ধি বেদ-বেদান্ত ছাড়িয়ে অনেক দূরে চ'লে গেছে।" অথবা স্বামী বিবেকানন্দ পরমহংসদেবের সম্বন্ধে যেমন লিখিয়াছেন, "He (Sri Ramkrishna) has lived that one single life which the whole Hindu nation has lived for ages"—যুগ যুগ ধরিয়া সমগ্র হিন্দুজাতি যে আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণের এক জীবনেই তাহা স্তরে স্তরে সমন্বিত হইয়াছে।

ধর্ম্মের নামে গোঁড়ামী, সাম্প্রদায়িকতা, পরধর্ম্মবিদ্বেষ, সঙ্কীর্ণতা ও ধর্ম্মান্ধতা দূর করিবার জন্যই ঠাকুর রামকৃষ্ণের আবির্ভাব। তাঁহার জীবন, বাণী সাধনা, আচার ও আচরণ সর্ব্বদাই অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মভাবের নিদর্শন ছিল। "সম্প্রদায়পূর্ণ পৃথিবীতে আর একটি নতুন সম্প্রদায় গড়বার জন্যে ঠাকুর আসেননি"—স্বামী বিবেকানন্দের এই উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য। তিনি আসিয়াছিলেন পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্ম্মবিশ্বাসীর সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামী, ধর্ম্মান্ধতা ও দলাদলি ঘুচাইয়া তাহাদের মধ্যে মিলন, মৈত্রী ও ভ্রাতৃভাব স্থাপন করিতে। শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার বলিয়াছেন, "মতুয়ার ভেতরে থাকলে সত্য লাভ হয় না।" ধর্ম্মসাধনার নামে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে জঘন্য ঘৃণা হিংসা দলাদলি জগতে বিদ্যমান সে সকলকে পরমহংসদেব সর্ব্বদাই তীব্রভাবে প্রতিবাদ করিয়াছেন। কারণ এইগুলি কোন মতেই ধর্ম্মসাধনায় সহায়ক নহে—পরন্তু ধর্ম্মলাভের পথে দারুণ অন্তরায়। এই ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতা পৃথিবীতে শুধু ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের, অজ্ঞানতার প্রসারই করিয়া থাকে। ইহার দানবীয় প্রভাবে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া যুগে যুগে মানুষ মানুষের উপর অকারণ অত্যাচার, অবিচার ও নৃশংসতা প্রকাশ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে দ্বিধা বোধ করে না। প্রকৃত পক্ষে কোন বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায় ঈশ্বরের একমাত্র প্রিয়পাত্র (Chosen people) এবং অপর সমস্ত জাতি ও সম্প্রদায় ঈশ্বরের অপ্রিয় বা পরিত্যক্ত নয়। এই যুক্তিবাদের যুগে ইহা মনে করা শুধু অজ্ঞানতারই পরিচায়ক ও উপহাসের বিষয়। সত্য কোনদিনই কখনও কোন ব্যক্তিবিশেষ, পুস্তকবিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। সত্য চিরদিনই অনাদি অসীম অনন্ত এবং তাহা চিরদিনই সম্প্রদায় বা গোঁড়ামীর প্রাচীরের বহির্ভূত। অন্ধবিশ্বাস, ধর্ম্মান্ধতা, দলাদলি, পরশ্রীকাতরতা, কুসংস্কার অথবা বহুকাল প্রচলিত ভ্রান্তপ্রথা ও জনশ্রুতি প্রভৃতিতে

আবদ্ধ থাকিলে মানুষ কখনই সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারে না। রামকৃষ্ণদেব সেইজন্য তাঁহার 'শিষ্যবৃন্দ শ্রোতা দর্শনার্থী ও ধর্ম্মজিজ্ঞাসুদিগকে ধর্ম্মের নামে যুক্তিহীন, অমানুষিক ও অসঙ্গত আচার বিশ্বাস প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতে বলিতেন।

পরমহংসদেব বলিতেন, "এই দুর্লভ মানুষ জন্ম পেয়ে যে ভগবানকে লাভ করতে চায় না তার মত দুর্ভাগা আর কেউ নেই।" সংসারের আপাতরম্য ক্ষণিক সুখে মুগ্ধ হইয়া মানুষ শুধু অশান্তি, শোক, জ্বালা, দুঃখ ও মনোকষ্টে পীড়িত হয়। ঠাকুর সেইজন্য বলিতেন, "ভগবানকে না ধ'রে থাকলে সংসারের দুঃখ থেকে মুক্তি নেই।" সেইজন্য কোন জিজ্ঞাসু ব্যক্তি 'মানব-জীবনের উদ্দেশ্য কী ?' এই কথা পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর উত্তর দিতেন "মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ।" ইহার উপায় কি ?—এই প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর বলিতেন, "কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ—বিবেক বৈরাগ্য শুদ্ধাভক্তি আর তাঁর জন্যে আন্তরিক ব্যাকুলতা।"

ধর্ম্মের যাহা মূলনীতি তাহা পালন না করিয়া শুধু বাহ্য আচার অনুষ্ঠানে বা প্রতিপালনে ধর্ম্মলাভের আশা দুরাশা মাত্র। ভগবান বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, "সংযম সত্যনিষ্ঠা ধ্যানাভ্যাস বিবেক বৈরাগ্য পবিত্রতা প্রভৃতি ধর্ম্মের এই সমস্ত মূলনীতির অভ্যাস অনুশীলনই ধর্ম্মজীবন যাপনের প্রকৃষ্ট পন্থা।" কিন্তু আমরা সাধারণতঃ দেখিয়া থাকি, শত শত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি জটাজুট তিলক মালা ভস্ম রুদ্রাক্ষ চিমটা গৈরিক ইত্যাদি বাহ্য বেশভূষা ও অর্থহীন আচার অনুষ্ঠানেরই অধিকতর যত্নশীল ও সমর্থক। সাধু বা ভক্ত বলিয়া যাঁহারা আপনাদের পরিচিত করেন তাঁহাদের অনেকেরই মধ্যে প্রধানতঃ এই সকল বাহ্য আচারের আতিশয্যই দেখা যায়। কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আপনার জীবনে এই সকল বাহ্য আচার আচরণ অপেক্ষা সংযম ত্যাগ পবিত্রতা ধ্যাননিষ্ঠা ভক্তি বিবেক বৈরাগ্য প্রভৃতি গুণগুলিকেই ধর্ম্মজীবন গঠনের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার মহাজীবন অনুধ্যান করিলে আমরা স্পষ্টই দেখি যে, আত্মসংযম, বিবেক বৈরাগ্য ধ্যানাভ্যাস পবিত্রতা প্রভৃতির নিয়মিত অনুশীলন না করিলে কোন মানুষ কোনক্রমেই ধর্ম্ম লাভ করিতে পারে না। স্বামী বিবেকানন্দ "মদীয় আচার্য্যদেব" বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "ধর্ম্ম শুধু বাক্যের আড়ম্বর নয়—ইহা মতবাদ বিশেষ অথবা সাম্প্রদায়িকতা নহে। সম্প্রদায়ে বা সমাজে ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ উপলব্ধি করাই ধর্ম্মের কার্য্য। * * মন্দির বা গীর্জ্জা তৈয়ারী অথবা সমবেত উপাসনায় যোগ দিলেই ধর্ম্ম হয় না। অথবা কোন গ্রন্থে, বচনে, বক্তৃতা অথবা সঙ্ঘে ধর্ম্ম নাই। ধর্ম্মের আসল তত্ত্ব—অপরোক্ষানুভূতি।" এ সম্বন্ধে সিদ্ধ সাধক কবীরও বলিয়াছেন :—

"মূড়মুড়াইকে জটা বনাইকে লাজা ফিরে ভঁইসা
ভাবভক্তি সাধন না করে মন যেইসা রহে ঐসা"

অর্থাৎ শুধু মস্তকমুণ্ডন, অথবা জটাধারণ কিম্বা গো মহিষাদির ন্যায় বিবস্ত্র হইয়া বিচরণ এবং ভক্তিভাবহীন ও সাধনাবর্জ্জিত হইয়া থাকিলে (ধর্ম্মাম্বেষীর) মন পূর্ব্ববৎ অবনতই থাকিবে, কিন্তু কিছুই উন্নত হইবে না। ঠাকুরও তাই বারবার বলিতেন, "যার মন প্রাণ অন্তরাত্মা ঈশ্বরে গত হয়েছে সে-ই সাধু—যে যথার্থ কামকাঞ্চন ত্যাগী সে-ই সাধু।" বহুকাল ধরিয়া ভারতবর্ষ বিশেষ বাঙলার হিন্দুজাতি ধর্ম্মের সার ভাগ পরিত্যাগ করিয়া অসার ভাগ লইয়াই মত্ত ছিল। ধ্যান ধারণা ভক্তি সংযম বিচার অপেক্ষা অনর্থ আচারই হিন্দু সমাজে প্রকৃত ধর্ম্মাচার্য্যের অভাবে প্রবল হইয়াছিল। সেইজন্য ধর্ম শুধু শাস্ত্র পুঁথির মধ্যেই নিহিত ছিল। জগজ্জননীর বরপুত্র জগজ্জননীর শক্তিতে শক্তিশালী মহামানব রামকৃষ্ণের আবির্ভাবে হিন্দুধর্ম তথা বিশ্বধর্ম্ম আবার জাগ্রত ও জীবন্ত হইয়া উঠিল। হিন্দুজাতির আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য ও শ্রেষ্ঠতার সত্যই প্রমাণিত হইল।

ধর্ম্মলাভে, ঈশ্বরলাভে, মুক্তিলাভে সকলেরই সমান অধিকার। ইহার মধ্যে ভারতীয় অভারতীয়, ব্রাহ্মণ শূদ্র, গৃহী সন্ন্যাসী, পুরুষ নারী প্রভৃতি ভেদ নাই। সত্য লাভের জন্য যে যোগ্য সে যে জাতি যে দেশ যে বংশের অন্তর্গত হউক না কেন সে-ই সত্যকে লাভ করিবে। ইহাই বিভিন্নযুগে বিভিন্ন দেশের ধর্ম্মগুরুগণ প্রচার করিয়াছেন—তথাপি ধর্ম্মব্যবসায়ী সঙ্কীর্ণচেতা ও স্বার্থান্ধ ব্যক্তিরা ইহা স্বীকার করে না। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই সঙ্কীর্ণ স্বার্থনীতিকে উচ্ছেদ করিয়া এক অভিনব সাম্য মন্ত্র প্রচার দ্বারা ধর্ম্মসাধনায় আবার সকল জাতির সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। একবার একব্যক্তি পরমহংসদেবকে বলিয়াছিলেন— "ব্রাহ্মণ-শরীর না হ'লে মুক্তি হবে না।" তাহাতে প্রতিবাদ করিয়া পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন, "ওকি কথা? যার ভক্তি আছে—তারই মুক্তি হবে।" তিনি বারবার বলিতেন "ভক্তিমান চণ্ডাল ভক্তিহীন ব্রাহ্মণের চেয়ে ঢের শ্রেষ্ঠ।" পরমহংসদেব মানুষের বংশগরিমা অথবা জাতি দেখিয়া তাহার আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা নির্ণয় করিতেন না। পরন্তু সাত্ত্বিকতা পবিত্রতা, জিতেন্দ্রিয়ত্ব, সত্যনিষ্ঠা ইত্যাদি দেখিয়াই তিনি মানুষের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা নির্ণয় করিতেন। সেইজন্যই দেখা যায় তাঁহার সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী শিষ্যবৃন্দের মধ্যে অনেকে সদব্রাহ্মণ বংশে জাত হইলেও ব্রহ্মজ্ঞতা ত্যাগ, সংযম, ধ্যানসিদ্ধি প্রভৃতির শ্রেষ্ঠতা দেখিয়া কায়স্থ বংশজাত স্বামী বিবেকানন্দকে (পূর্ব্বনাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত) তিনি আপনার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াছিলেন। স্বয়ং বিশিষ্ট ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করা এবং প্রকৃত ব্রাহ্মণতার চলবিগ্রহ হওয়া সত্ত্বেও মানবতম চণ্ডালকেও মূর্ত্তনারায়ণ জ্ঞানে তিনি প্রণাম করিতেন। জাতিভেদের কুসংস্কার দূর করিবার জন্য তিনি স্বহস্তে পায়খানা ও নর্দ্দামা পরিষ্কার করিয়া নিজের কেশ দ্বারা সেইস্থান মুছিয়া দিয়াছিলেন। জাতিভেদকে পরমহংসদেব কোনদিনই প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি উহাকে চিরদিনই ঘৃণা করিতেন। চরিত্রহীন 'ব্রাহ্মণ' অপেক্ষা চরিত্রবান ও ধার্ম্মিক শূদ্রই তাঁহার অধিক প্রিয় ছিল।

অনেকের ধারণা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মাদর্শ শুধু সন্ন্যাসীদের জন্য। কিন্তু একথা আদৌ সত্য নয়। তিনি শুধু সন্ন্যাসীর আদর্শ নহেন, তিনি গৃহীদেরও আদর্শ। তাহা যদি না হইতেন তাহা হইলে ঠাকুরের জগদ্‌গুরু নাম সার্থক হইত না। সেইজন্য একাধারেই ঠাকুর আদর্শ সন্ন্যাসী ও আদর্শ গৃহস্থের জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। কিভাবে ব্রহ্মজ্ঞ গৃহস্থের আদর্শ জীবন যাপন করিয়া শিক্ষা দীক্ষাদ্বারা স্ত্রীকে ধর্মসাধনায় সহায়িকা, সহচরী ও সঙ্গিনী করিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণী নাম সার্থক করা যায়—শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবন অবলম্বনে ঠাকুর সমগ্র জগৎকে তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। ঠাকুরের বিবাহিত জীবন ধর্মজগতে এক অশ্রুতপূর্ব্ব ও বিস্ময়কর ঘটনা। ঠাকুর ও শ্রীমা একে অন্যের মধ্যে সদা সর্ব্বদা জগজ্জননীকে প্রত্যক্ষ দেখিতেন। শুধু তাহাই নয় স্বীয় সহধর্ম্মিণী শ্রীসারদাদেবীর মধ্যে জগজ্জননীর ষোড়শীমাতৃকা মূর্ত্তির যথাবিহিত পূজা অনুষ্ঠান দ্বারা ঠাকুর আপনার সাধন-যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়াছিলেন সকলের জন্য—তিনি একদেশদর্শী নহেন পরন্তু সর্ব্বভাবময়। গৃহী-সন্ন্যাসী, পুরুষ-নারী, হিন্দু-অহিন্দু সকলের জন্য তিনি ধর্মজীবনের সর্ব্বজনীন আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। সন্ন্যাসীবৃন্দের শিক্ষার জন্য যেমন ঠাকুর একদিকে স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, অভেদানন্দ, সারদানন্দ প্রমুখ সর্ব্বত্যাগী স্থিতপ্রজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞ শিষ্যবৃন্দকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, অপর দিকে তেমনি দুর্গাচরণ নাগ মহাশয়, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রভৃতি শান্তসংযত ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধনসিদ্ধ গৃহস্থ শিষ্যদেরও জীবন তিনি গঠন করিয়াছিলেন। সকলের জন্যই ঠাকুর আসিয়াছিলেন—কেহই তাঁহার কাছে অনাদর উপেক্ষার ও অবহেলার পাত্র ছিল না। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ঠাকুর ছিলেন সকলের—তাই দক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটী তপোবন ছিল শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম, বাউল, সন্ন্যাসী, মুসলমান খৃষ্টান সকল সাধকেরই মহা মিলনতীর্থ।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মান্বেষী ও সাধকেরা ঠাকুরের কাছে আসিতেন। প্রত্যেক সাধকই ঠাকুরের মধ্যে আপন আপন ধর্মভাবের পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখিয়া বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইতেন। সত্য সত্যই তিনি ছিলেন নিখিল ধর্মভাবের মহা পারাবার। অপার মহাসমুদ্রের তরঙ্গের সংখ্যা যেমন অগণিত তেমনি ঠাকুরের ধর্মভাবেরও ইয়ত্তা হয় না। ঠাকুরকে দেখিয়া শক্তিসাধক বলিয়াছেন, "জগন্মাতার জীবন্ত মূর্ত্তি"—শান্ত সমাহিত অন্তর্মুখী ভাব ও গভীর সমাধিতে ঠাকুর শৈব সাধকদের নিকট 'শিব' বলিয়া প্রতীয়মান। বৈষ্ণবভক্তেরা ঠাকুরের প্রেমভক্তির পরাকাষ্ঠা ও মহাভাবের বিকাশ দেখিয়া তাঁহাকে বলিয়াছেন "সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্য।" বাসনা-বিমুক্ত ধ্যাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীবৃন্দ ঠাকুরের মুহুর্মুহু নির্ব্বিকল্প সমাধি দেখিয়া বলিয়াছেন 'মূর্ত্তিমান বেদান্ত।' এই প্রকার শিখ, রামাৎবৈষ্ণব, বাউল, এমন কি মুসলমান খৃষ্টান সাধকেরাও তাঁহার মধ্যে আপন আপন আপন ধর্ম্মসাধনার পরিপূর্ণতা দেখিয়া তাঁহাকে ভক্তি নিবেদন

করিতেন। তাঁহার মধ্যে এই সকল ভাবতো ছিলই, তাহাছাড়া আরও কত কি ভাব যে ছিল তাহা বুঝিয়া উঠা মানব বুদ্ধির পক্ষে অসাধ্য। ঠাকুর হিন্দু জাতিতে ও ভারতবর্ষে জন্মাইলেও তাঁহার জীবন কোন দেশ বা জাতিতে আবদ্ধ নয়। তাঁহার মহান আদর্শ সমগ্র মানবজাতিকে মুগ্ধ করিতেছে। স্বর্গীয় ফরাসী মনীষী সিলভাঁ লেভি যথার্থই বলিয়াছেন, "Sri Ram Krishna's name is common property of the whole mankind."

এই প্রকার শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ ঈশ্বরাভিন্ন দিব্যমানব সমগ্র মানব জাতিরই গৌরব। জীবের দুঃখে তিনি ব্যাকুল—করুণার তিনি মহা পারাবার। সংসারদগ্ধ নরনারীর শান্তি সান্ত্বনা ও মুক্তির জন্যই তিনি দেহরূপ স্বীকার করিয়া আসিয়াছিলেন। অহেতুক প্রেমের সাগর তিনি, তাই পাপী তাপী দীন দুঃখী পতিত সকলকেই ঠাকুর নিজের কাছে ঠাঁই দিয়াছেন। এই অলোকসামান্য জীবনের অনুধ্যান ও তাঁহার উপদেশ আন্তরিকভাবে পালনেই মানুষের মুক্তি ও পরমকল্যাণ। যে ভাব যে আদর্শ যে মহাশিক্ষা তিনি আপনার জীবনের দ্বারা সকলকে প্রদান ও প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাকে যদি যথাযথভাবে পালন করিতে আমরা সচেষ্ট হই তাহা হইলে আমরা তাঁহার যথার্থ ভক্ত হইতে পারিব। ইহাই তাঁহাকে ভক্তি প্রদর্শনের প্রকৃত পন্থা। নতুবা তাঁহার উপদেশের বিপরীত জীবন যাপন করিয়া শুধু মুখে তাঁহার স্তবস্তুতি বন্দনা করিলে কোনই ফল হইবে না। ইহা যে শুধু ভক্তির আবরণে তাঁহাকে অস্বীকার করা নয় পরন্তু শোচনীয় আত্মপ্রবঞ্চনা। সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত হওয়া যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত হইতে হইলে আমাদিগকে সমস্ত অনুদার সঙ্কীর্ণভাব অন্তর হইতে দূর করিয়া দিতে হইবে—কায়মনোবাক্যে ভগবানকে ও সমস্ত মানুষকে ভালবাসিতে হইবে। মানুষে মানুষে কোন ভেদনীতি রাখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত হওয়া অসম্ভব। সেই তীব্রবৈরাগ্য, শুদ্ধাভক্তি, সেই আত্মহারা ধ্যানতন্ময়তা, অনাবিল সারল্য, তুষারশুভ্র পবিত্রতা আমাদের জীবনে প্রতিপালিত না হইলে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবক বলিয়া পরিচয় দিবার কোন অধিকারই আমাদের নাই। সেইজন্য আমাদের প্রার্থনা শ্রীঠাকুর আমাদের সাংসারিক মোহমলিনতা কুটিলতা হইতে মুক্ত করুন। আমরা যেন সমস্ত অন্তরে সমস্ত মনেপ্রাণে তাঁহার উপদেশকে জীবনে পালন করিয়া ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হই, ঠাকুরের দিব্যস্পর্শে আমাদের সকলের জীবন মুক্ত ও অমৃতান্বিত হইয়া উঠুক।

<u>গ্রন্থ সমালোচনা</u> :—সত্যোরপথ বা 'আমি'র সন্ধান—লেখক শ্রীমৎনরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। প্রকাশক শ্রীজনার্দ্দন ভট্টাচার্য্য বি,এ। খানিপুর দেবসঙ্ঘ—পোঃ পলাস, ঢাকা। মূল্য ছয় আনা।

এই পুস্তকে সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। প্রকাশক লিখিয়াছেন এবং বইখানি পড়িয়াও দেখা যায় যে

গ্রন্থকার একজন একনিষ্ঠ সাধক—সেইজন্য এই পুস্তকে ধর্ম্ম সাধনার যে সব ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহাতে অনেক ধর্ম্মজিজ্ঞাসুর মনকে তৃপ্তি দান করিবে। কোন জটিল তর্ক বিতর্ক বা পাণ্ডিত্যের বৃথা আড়ম্বর ইহাতে দেখান হয় নাই। সাধকের সাধনায় যাহা অনুভূতিরূপে দেখা দিয়াছে সেগুলির সহিত ভগবদ্গীতা প্রমুখ শাস্ত্রের উক্তির সৌসাদৃশ্য প্রদর্শন করা হইয়াছে। গ্রন্থকার উদার চেতা ও মহানুভব ব্যক্তি।

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দের পত্র

Darjeeling
29. 6 '37.

স্নেহের—

তোমার ২৪ তারিখের ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইয়াছি। তুমি সংসারের বন্ধন অনুভব করিতেছ এবং শান্তি পাইতেছ না—ইহা আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার উপায় জানিবে। সংসারে বাস করিতে হইলে পাঁকাল মাছের ন্যায় নির্লিপ্ত ভাবে থাকিতে হইবে। এবং সমস্ত কর্ম্মের ফল শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিবে। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" এইটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া সংসারের কর্ম্ম করিলে চিত্তশুদ্ধি হইবে এবং কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট শান্তি প্রার্থনা করিবে।

এখন ত তবু তোমার সংসারে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা নাই। তাহাদের ভার বহন করিতে হইলে কতটা শান্তি ও আনন্দ পাইবে তাহা অনুমান করিতে পার! কর্ম্মক্ষেত্রে যে কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছ সেই কার্য্যসকলকে "work is worship" এই ধারণা করিয়া তাঁহার সেবা করিতেছি এই জ্ঞান রাখিবে এবং ইহার ফলাফল তাঁহাকে অর্পণ করিয়া তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া আত্মসমর্পণ (Resignation to the will of the Lord) করিলে প্রাণে শান্তি পাইবে। "কলে সঙ্ঘো নিবধ্যতে"। ত্যাগ করা এবং কামাদি রিপু জয় করা কঠিন। বিষয়ী লোকের সঙ্গে বাস করিলে তাহাদের মনের ভাব তোমার মনে উঠিবে এবং তাহাদিগের পথের পথিক হইতে হইবে। নিত্যানিত্য বস্তু বিচারের সহিত বিষয় ভোগ করিবার পর ত্যাগের ভাব আসিবে। তখন নিবৃত্তিমার্গে চলিতে পারিবে। কামক্রোধাদির মোড় ফিরাইয়া ভগবানের দিকে চালাইতে হইবে। সকল স্ত্রীলোককে জগন্মাতার মূর্ত্তি জ্ঞান করিবে।

যখনই কামভাব আসিবে তখনই ঐরূপ চিন্তা করিবে। শান্তি পাইতেছ না ভাবিয়া নিজের মনের উপর ক্রোধ করিবে এবং শান্তি প্রার্থনা করিবে। অধিক আর কি লিখিব তোমরা আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
অভেদানন্দ

IS VEDANTA PANTHEISTIC ?

Swami Abhedananda

Wherever we go we meet people who ask these questions : "Is not your Philosophy Pantheistic ?" "Is not Hinduism Pantheistic ?" "Has it not been proved that your Vedanta Philosophy teaches Pantheism ?" It is curious to notice how this word "Pantheism" prejudices the minds of the western people. Whenever it is uttered or read or heard of, it is disliked immensely. It changes the whole attitude of the reader or listener.

But if we should ask such persons what they understand by that word, perhaps very few would be able to answer correctly. Moreover, if we ask them "What harm is there in the Hindu belief or in Pantheism ?" they can make no reply. Nevertheless they have a strong impression that it is very wrong to be a Pantheist.

If we undertake to trace the original meaning of the word "Pantheism," we shall have to go back to Greek mythology. There we find that the ancient Greek shepherds used to believe in a god whom they worshipped, and whom they called Pan. They believed that god Pan was the god of the flocks and the shepherds ; that he was the guardian of the fishermen and of the bee-keepers ; he was the patron of all persons occupied in hunting and in fishing. This god Pan has been described poetically as having the head and trunk of a man, with horns and goat's beard, pugnose, pointed ears, and tail, and with goat's feet. He was very fond of music. He was the inventer of the shepherd's lute, which he used to play upon. This poetic description of the god Pan is nothing but the crude, imperfect symbolization of the conceptian of God which the shepherds of those days had. The picture is a symbol of the spirit of nature which exists in man, in beasts, in fishes, in birds, in insects, in plants. The shepherds thus understood the kinship which exists among all living creatures and things. Gradually this idea was changed, and extended. The god Pan became the god of the hills, mountains, rivers, etc, and afterwards he came to be identified with every personified object of nature.

And these were the first meaning of the word "Pantheism." We may call them obsolete forms of "Pantheism." At first, then, there was the worship of the god Pan afterwards the worship of nature in all of its personified objects and forces Pan, means all, and theism means belief in a god. Pantheism in its rudest forms was universal godism. It asserts the consubstantiation of God with nature.

During the centuries, new conceptions, new ideas have been added to the primitive forms of Pantheism, until to-day we hear of many varieties of Pantheism. Poetic, Æsthetic Pantheism, Doctrinal Pantheism, Realistic Pantheism, Philosophic Pantheism, Materialistic Pantheism, Scientific Pantheism, etc. The Poetical, Æsthetic Pantheism is nothing but worship of nature for its beauty or for itself. Doctrinal Pantheism is based on the doctrine that everything—all this universe is the everchanging manifestation of God, and, consequently, by worshipping the objects of nature we worship God. Realistic Pantheism is that in which the natural causes of the phenomenal world are personified and deified. As, for instance, if matter be the cause of all the phenomena, then matter would be the object personified and deified. If heat be the cause of natural objects, then heat would be personified, deified, and worshipped. That is what we call Realistic Pantheism. Spinoza's philosophy or Pantheism is philosophic Pantheism. Spinoza believed that there is one universal being, or substance, which is the cause, and whose attributes are mind and matter, thought and expansion.

Materialistic Pantheism holds that matter is the cause of everything, as we find in the system of Strauss and other materialists. It is sometimes called "Atheistic Physics." Among the Greek philosophers, Xenophon was the first to promulgate the doctrine. The Idealistic school taught Idealistic Pantheism, which tended to absorb the world in God ; while the Materialistic Pantheism of the Ionic school tried to absorb God in the world, and differed from Atheism merely in name. In the epistle of John we find an echo of Idealistic Pantheism, in such passages as "God is love" "Whosoever dwelleth in love dwelleth in God, and God in him."

In modern times the philosophies of Schlegel, Scheling, Hegel, and other German philosophers teach the same Idealistic Pantheism. In the middle ages some of the Christian mystics believed in the Idealistic Pantheism, but could not express their ideas perfectly. Those who did

express them were persecuted. In 1600 Giordano Bruno was burned at Rome for his Pantheistic opinions. When he was asked what he believed in, he said that he did not believe in creation, but he believed in the world as an emanation of the Infinite Mind. He said, "To realize God everywhere, to see God everywhere, and to realize that He alone Is, and all else is perishable phenomena and passing illusion; that there is one intelligence existing in God, in man, in beast, and in all that we call matter; this would be the aim of true philosophy." Goethe was an Idealistic Pantheist. Most of the eminent English poets, such as Wordsworth, Shelley, Tennyson, Byron, were Pantheists of their day. In America Emerson is considered by many an Idealistic Pantheist.

But there is still another kind of Pantheism which is known to modern times as Scientific Monism. Herbert Spencer, Huxley, John Fiske, Voltaire, M. Thompson, and several other modern scientists of to-day believe that there is one unknown and unknowable reality, which is the basis of mind and matter, and which is the cause of all phenomenal appearances.

Thus we see there are many kinds of "Pantheism." Such being the case, when we ask "Is Vedanta Panthiestic ?", we shall have to find out what kind of Panthiesm we mean. If we consider the meaning or common conception of Pantheism, which is nothing but this,—the worship of the unconscious or personal nature as God,—then we say Vedanta is not Pantheistic. If we take Webster's definition, that Pantheism is the doctrine which says there is no God but the combined forces or laws that are manifested in the existing universe—then we say Vedanta is not Pantheistic, it does not teach that. Vedanta does not believe in such a God; consequently, it cannot be Pantheistic. Vedanta does not teach Æsthetic Pantheism, because Vedanta does not teach the worship of nature. It does not teach Realistic Pantheism nor Philosophic nor Idealistic nor Scientific nor Materialistic Pantheism. We cannot limit Vedanta by any of the "isms" of the past, present, or future. None of these 'isms', such as theism, monotheism, deism, pantheism, or monism, can accept all the teachings of Vedanta; but, on the contrary, Vedanta can embrace a theist and a monotheist with one hand, a deist or pantheist or monist with the other.

You may ask: "How can it be possible to embrace those which are

diametrically opposed to one another? It is possible in Vedanta. Because Vedanta says that all these differences in 'isms' are merely differences of degree and not of kind. Vedanta says that all these 'isms' appear to have their real value when they are understood as relating to the different stages of our spiritual evolution. As the conception of God in us gradually grows higher and higher, so we pass from one 'ism' into another. Each of these 'isms' marks a different stage of spiritual evolution, and Vedanta recognizes them all.

Vedanta accepts the idea that there is a natural evolution of our spiritual conception, and it teaches that each individual mind passes through all the different stages that lie in animism or polytheism on the one hand, and the highest form of monism on the other.

A man who follows the teachings of Vedanta can be a theist, a monotheist, a deist, a pantheist, a monist. He may belong to any sect or class creed or denomination or to any religion, and still be a follower of Vedanta, if he does not limit his God to any peculiarity of doctrine or dogma; if he does not say "My 'ism' alone is true and correct, and all other 'isms' are wrong." Vedanta tells you to belong to any sect or ereed or denomination or religion, but it tells you at the same time not to stop in any of the 'isms'. It bids you go forward, always keeping the mind open to the truth. According to Vedanta, each of these 'isms' is like a class in the school of religion, and the individual soul is a study in that school. If any one stops in one class and spends his life there, thinking that there cannot be anything higher than that, then his progress will cease. Let him know that there are other classes higher than that. Let him strive to attain to those. Let him try to be promoted to those classes. Let him grow—march onward until he reaches the eternal ocean of truth. None of these 'isms' is the reality of God. They are nothing but the names of certain stages in the path of spiritual realization.

When we realize this, why should we find fault with the 'isms'? Why should we hold that this 'ism' is better than that 'ism,' or that 'ism' is better than this 'ism', etc.? If we realize that each one is in the path of that realization of the Eternal Truth, then all quarrels cease forever. There is no fault-finding, there are no curses, no persecutions. As Vedanta teaches this, how can we say that Vedanta is pantheistic?

Vedanta presents two aspects of the same reality: one is the Eternal

Ocean of intelligence, existence, and bliss, without attributes, which is called the absolute ; the other aspect of this same reality is said to be "with attributes." That is, when this Eternal Ocean of Truth is related to this phenomenal universe, then it becomes the God, the Creator, the preserver, the father, the mother of the universe. He is a personal God ; He has all the attributes which we give to personal God. He is worshipped by all the dualists, theists, monotheists, and all other kinds of dualists that exist upon the face of the earth.

But the same God, the same reality in nature, looked at without reference to the phenomenal world, becomes an impersonal God, an absolute ; the "Substantiation" of Spinoza ; an animism of the philosopher ; the unknown and unknowable of scientific monism. We cannot pray to or worship Spinoza's "Substantiation." What would be the use of praying to that ? Absolute cannot be worshipped. There is no such difficulty in Vedanta, because it admits that the personal God is the father or the mother.

"He is the father of the universe, both animate and inanimate. He is worshipped by all, under different names. There is nothing in the universe which can be equal to him ; how can there be anything greater ?" There are many such expression. But those who do not go beyond this phenomenal existence beyond the relative world do not believe in the existence of that absolute, divine essence. Vedanta has no harsh word to say to these persons It has no quarrel with them ; but at the same time it leaves room for those who are philosophical and those who are more advanced in spirituality than an ordinary dualist. But people may think Vedanta is pantheistic, without understanding the meaning of the word. It is not pantheistic. It is a spiritual oneness. It is the same oneness which we find expressed by the great prophets of the world. We find in the expressions of Jesus, "I and my Father are one." We find it in the expressions of the Hindu sage or prophet, "I am He." The expression is nothing but the spontaneous expression of the realization that lies behind.

Vedanta is not antagonistic to any existing religion, sect, or creed It has no quarrels with Christianity, Mohammedanism, Judaism, or Buddhism. The follower of Vedanta can go to the church, the synagogue the mosque, or the temple, and can worship wherever he pleases. People may call him a Christian, a Mohammedan, a Hindu, or a Buddhist, but he

does not see any difference, except in words. We may worship that eternal being through Jesus or through any other prophet. If we only admit that all these 'isms' are nothing but different stages of spiritual evolution, if we have no quarrel with anybody or sect or creed or denomination, if we are not bound by any sectarian dogma or creed or narrow idea, if we are free from superstition, prejudice, and bigotry—then we are true followers of Vedanta. Pantheism is antagonistic to theism, but Vedanta is antagonistic to none. In panthcism the prevailing idea is that God has been changed into matter and force ; but Vedanta does not teach that. Vedanta says that God is unchangeable ; he can never be changed into any matter or force or anything else ; that matter and force are nothing but the expressions of the Divine Will, which is eternal. That Divine Will is working in nature. The God of Vedanta is a living God. In Him we live, through Him we exist, without Him there cannot be anything.

Vedanta does not teach special creation, but it teaches that the whole phenomena of the universe is the expression or manifestation of the Divine Will. That Divine Will is understood by the modern scientists. and is called by them "the eternal energy." All the laws of nature are nothing but the molds in which that Divine Will works in the universe.

The true follower of Vedanta is sometimes dualistic, sometimes monotheistic, sometimes monistic. When he realizes that his body is the temple wherein dwells that divinity, when he identifies himself with his body, then he says, "I am nothing ; Thou art mine all. Thou art the creator, I am the creature." When he sees the divine image that is within him, he says, "I am part and parcel of Thee." And when he sees this Spirit, which is divine and immortal, he says "I and my Father are one."

স্বামী অভেদানন্দ স্মৃতি-মন্দির

আবেদন

কাশীপুর শ্মশানতীর্থে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সমাধি-মন্দিরের ঠিক পার্শ্বেই পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের পার্থিব দেহ আজ একবৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব্বে অগ্নিসংস্কার করা হইয়াছিল। কিন্তু সে স্থানে এযাবৎ তাঁহার কোন স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপিত হয় নাই। ওই স্থানটিতে স্বামিজী মহারাজের একটি স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণ একান্তই প্রয়োজন। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিগত শুভ জন্মতিথি পূজার দিনে (২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪১) ওই স্থানে স্বামিজীর স্মৃতি-মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করা হইয়াছে। কলিকাতা করপোরেশন আমাদিগকে উক্ত স্থানটি স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণের জন্য দান করিয়াছেন। কিন্তু ওই স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণের জন্য অনুমান পাঁচ হাজার টাকা খরচ পড়িবে তজ্জন্য এই কার্য্যে সাহায্য পাইবার আশায় আমরা আজ আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এই শুভকার্য্যে যিনি যে প্রকার অর্থ সাহায্য করিবেন তাহা নিম্ন ঠিকানায় একান্ত শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইবে। ইতি

প্রেসিডেন্ট

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ ও সমিতি

বিশ্ববাণী

তৃতীয় বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮ | চতুর্থ সংখ্যা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সোম

হে রামকৃষ্ণ যে মহামন্ত্র বিশ্বে করেছ দান
মানব সাধন মন্দির মাঝে উঠে তারি জয়গান।
দীন ব্রাহ্মণ নহ তুমি দেব তুমি হে যুগাবতার
চরণে তোমার জানাই নিয়ত অযুত নমস্কার॥

বালক সুলভ সরলতাভরা মহান জীবন তব
জগতের মাঝে সাধনার রূপ দিয়ে গেছে অভিনব।
সাধক শ্রেষ্ঠ হইলে আপনি বর লভি' দেবতার
চরণে তোমার জানাই নিয়ত অযুত নমস্কার॥

মাটির পুতুলে দেখালে হে দেব দেবতার সন্ধান
আরাধনা মাঝে শিব সুন্দরে করিলে মূর্ত্তিমান।
সাধনায় তব উঠিল বাজিয়া ধর্ম্ম বীণার তার
চরণে তোমার জানাই নিয়ত অযুত নমস্কার॥

সোনা করি' গেলে ছুঁইলে যাহারে হে গুণি পরশমণি
সকলে তোমাকে ভকতি কুসুমে পূজিছে দেবতা গণি।
স্থান পায় নাই পরাণে তোমার কুহক অহঙ্কার
চরণে তোমার জানাই নিয়ত অযুত নমস্কার॥

সকল ধর্ম্মে উপাসনা করি' মানিয়া সকল মত
বিশ্ববাসীরে দেখাইলে তুমি "যত মত তত পথ"।
উপাসনা মাঝে আঁখিজল হ'ল তব পূজা উপচার
চরণে তোমার জানাই নিয়ত অযুত নমস্কার॥

অদ্বৈতবাদ

পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, বেদান্তভূষণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এইরূপ বহু আশঙ্কার উত্তর ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ভাষ্য মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আর ভামতী, কল্পতরু ও পরিমল মধ্যে পরবর্ত্তী যাবতীয় আপত্তি খণ্ডিত হইয়াছে। যাহা হউক এই সব কারণে বৃত্তিকারের অনুসরণ করিয়া আচার্য্য রামানুজ প্রভৃতি এই আনন্দময়কে যে ব্রহ্ম বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। ব্রহ্মসূত্রের "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" (১।১।১২) সূত্রে আনন্দময় শব্দে এই সকল আচার্য্য ব্রহ্ম বুঝিয়াছেন, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য বৃত্তিকারের মতে প্রথম ব্যাখ্যা করিয়া শেষে নিজ ব্যাসসম্প্রদায়ের ব্যাখ্যানুসরণ করিয়া আনন্দময় শব্দের অর্থ জীব করিয়া "আনন্দময়"-শ্রুতিশেষে যে "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" বাক্য আছে, সেই বাক্যের ব্রহ্মকে মুখ্যব্রহ্ম বলিয়া বুঝিয়াছেন। সুতরাং "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" বাক্যের যে ব্রহ্ম, তাহার ব্রহ্মই আনন্দময়ের স্বরূপ ব্রহ্ম নহেন—এইরূপ সূত্রার্থ হইল। এস্থলে আনন্দময়কে ব্রহ্ম বলিলে সূত্রের সঙ্গে শ্রুতির বিরোধ হয়। একথা ভামতীকারও উল্লেখ করিয়াছেন—"বেদসূত্রয়োঃ বিরোধে গুণে ত্বন্যায্য কল্পনা ইতি সূত্রানি অন্যথা নেতব্যানি।" আর তজ্জন্য নিজগুরু ব্যাসদেবে দোষ স্পর্শ করে বলিয়া তাঁহার ন্যূনতা পরিহারের জন্য শঙ্করাচার্য্য এই আনন্দময়াধিকরণের সূত্রগুলির অন্যথা ব্যাখ্যা করিয়া ব্যাসদেবের নির্দ্দোষতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অথবা ব্যাসদেবের প্রকৃত অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই কথাটি না বুঝিয়া পণ্ডিত রামমিশ্র ও তচ্ছাত্র থিবো সাহেবের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া আজকাল অনেকে বলেন যে, শঙ্করাচার্য্য ব্যাসসূত্রের ব্যাখ্যা সূত্রের স্পষ্টার্থ অবলম্বনে করেন নাই; অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্য ব্যাসমতের বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইত্যাদি। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় শঙ্করাচার্য্যই ব্যাসের প্রকৃত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ, ব্রহ্মসূত্রগ্রন্থে ব্যাসদেব শ্রুতিমীমাংসার মুখে ব্রহ্মতত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। ব্যাসদেব নিজ মত প্রকাশের জন্য ব্রহ্মসূত্র রচনা করেন নাই। অধিক কি যেখানে তিনি নিজ মত বলিয়াছেন সেখানে তিনি নিজ নামই যোজনা করিয়াছেন। যাহা হউক উদ্ধৃত শ্রুতি হইতে অদ্বৈত বস্তুরই সন্ধান পাওয়া গেল। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ শ্রুতি ও সূত্রের বিরোধ স্থলে সূত্রই অন্যথা ব্যাখ্যাত হয়, ইহা শবরস্বামী মীমাংসাদর্শনের ভাষ্যে স্পষ্টই বলিয়াছেন। এই কথা বেদান্তকল্পতরু মধ্যেও কথিত হইয়াছে। যথা—"তথাচ আচার্য্য-শবরস্বামী বর্ণয়াম্বভূব লোকে যেষু অর্থেষু প্রসিদ্ধানি পদানি তানি সতি বেদাবিরোধ-সম্ভবে তদর্থান্যেব সূত্রেষু ইতি অবগন্তব্যম্ ইতি" (১৯০ পৃঃ)। তাহার পর—

(গ)* "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কদাচনেতি॥" (২।৪)

অর্থাৎ "যাহা হইতে বাক্য সকল মনের সহিত তাহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হয়, ব্রহ্মের সেই আনন্দকে যিনি জানেন তিনি কখনও ভীত হন না।"—এখানে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে বাক্য মনের অগোচর বলায়—এক নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত বস্তুর সন্ধান প্রদান করা হইল। অন্য শ্রুতিতে "দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি" অর্থাৎ দ্বিতীয় হইতেই ভয় হয়—বলায় এবং এখানে সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি ভীত হয় না বলায়—সেই অদ্বৈত তত্ত্বের কথা উপদেশ করা হইল। এখানে "ব্রহ্মের আনন্দ" এইরূপে ষষ্ঠীবিভক্তির দ্বারা বলায় ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ নহেন, কিন্তু আনন্দরূপ একটী ধর্ম্মবিশিষ্ট ব্রহ্ম—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে। কিন্তু "রাহুর মস্তক" এইরূপ প্রয়োগে অভেদেও ষষ্ঠী হয় বলিয়া এস্থলেও অভেদে ষষ্ঠী গ্রহণ করাই সঙ্গত। কারণ, "বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম" এই বৃহদারণ্যক শ্রুতিবাক্যে আনন্দ ও ব্রহ্মকে অভেদে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মের আনন্দ এই বাক্যে আনন্দকে ব্রহ্মের ধর্ম্ম বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে না। আর এস্থলে ব্রহ্মকে বাক্য ও মনের অগোচর বলায় আনন্দকে ব্রহ্মের ধর্ম্ম বলা যায় না। আনন্দকে ব্রহ্মের ধর্ম্ম বলিলে ব্রহ্ম বাক্য মনের অগোচর—ইহা বলা যায় না। কারণ, যাহার ধর্ম্ম থাকে তাহা বাক্য মনের অগোচর হয় না। নির্ধর্ম্মক বস্তুই বাক্য মনের অগোচর হয়। অতএব এস্থলে ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষই বলা হইয়াছে। তাহার পর—

(ঘ) "সোঽকাময়ত। বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্ব্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য। সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ। নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ। বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ। সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ। যদিদং কিঞ্চ। তৎসত্যমিত্যাচক্ষতে।" (২।৬)

অর্থাৎ "তিনি কল্পনা করিলেন—আমি বহু হইব, আমি উৎপন্ন হইব। তিনি তপস্যা করিলেন অর্থাৎ সৃজ্যমান জগতের রচনাদি বিষয়ে আলোচনা করিলেন, তিনি তপস্যা করিয়া এই যাহা কিছু সমস্তই সৃষ্টি করিলেন। এই সব সৃষ্টি করিয়া ইঁহাদের মধ্যে অনু-প্রবেশ করিয়া সৎ ও ত্যৎ হইলেন। (সৎ অর্থ মূর্ত্ত এবং ত্যৎ অর্থ অমূর্ত্ত)। নিরুক্ত (সবিশেষ) ও অনিরুক্ত (নির্ব্বিশেষ), নিলয়ন (আশ্রিত) ও অনিলয়ন (অনাশ্রিত), বিজ্ঞান (চেতন) ও অবিজ্ঞান (অচেতন) সত্য (ব্যাবহারিক) ও অনৃত (প্রাতিভাসিক)। —এই যাহা কিছু সত্যই হইলেন। তাহা সত্য এই কথাই বলা হয়।

এস্থলে সেই বস্তু বহু হইলেন বলায় তিনি বহু হইবার পূর্ব্বে অবশ্যই এক ও অদ্বৈত ছিলেন বলিতে হইবে, এবং যিনি নিজে বহু হন, তিনি নিজে অক্ষুণ্ণই থাকেন বলিয়া পরেও অদ্বৈত আছেন। এইরূপে এই জগতের মূল যে এক অদ্বৈত, তাহা বহু শ্রুতির দ্বারা বলা হইল। আর এক বস্তু এক থাকিয়া বহু হইলে তাঁহার এক-রূপে থাকাই সত্য এবং বহুরূপ ধারণ মিথ্যা বা প্রাতিভাসিকই হয়।

যদি বলা হয়, যে বস্তু বহু হয়, তাহার মধ্যে বহুত্বসাধক তদ্ভিন্ন কিছু না থাকিলে তাহা বহু হয় কি করিয়া? অতএব এতদ্দ্বারা অদ্বৈতের উপদেশকল্পনা সঙ্গত হয় না। কিন্তু একথাও সঙ্গত হয় না। কারণ, এস্থলে মূর্ত্ত অমূর্ত্ত যাহা কিছু সবই সৃষ্ট হইতেছে বলায়, সেই মূলীভূত পদার্থমধ্যে অন্য কোন পদার্থের সত্তা কল্পনা করা সঙ্গত হয় না। এই জন্য সৃষ্টিই মিথ্যা বলিতে হইবে। বস্তুতঃ এই প্রকার অলৌকিক তত্ত্বের উপদেশজন্য শ্রুতির প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। অতএব আশঙ্কা এস্থলে অসঙ্গত।

যদি বলা হয়—তন্মধ্যে অন্য বস্তু না থাকিলেও বহুত্বজননী শক্তিও তো স্বীকার করিতে হইবে, আর তাহা হইলেই অদ্বৈতহানি হইল।—না, তাহাও নহে। কারণ, তাহা হইলে যে শক্তি সৃষ্টি করিল, সে শক্তি সৃষ্টির পূর্ব্বে থাকিলে সৃষ্টির পূর্ব্বকাল আর সম্ভব হয় কি করিয়া? অতএব সৃষ্টি যেমন অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ মিথ্যা এই শক্তিও তদ্রূপ অনির্ব্বচনীয়, অর্থাৎ আছে কি নাই—কিছুই বলা যায় না। কার্য্য দেখিয়া কারণে শক্তি স্বীকার করা হয় বলিয়া কার্য্য না থাকিলে শক্তিও থাকে না বলিতে হয়। যদি বলা হয় গায়কের গান করিবার শক্তি গান না গাহিলেও তো থাকে, নষ্ট বলা যায় না? না, তাহাও নহে, সে ভবিষ্যতে গান গাহিলে তাহার শক্তি নষ্ট নয় বলা হয়। আর প্রত্যেক বারে একরূপ গানও কেহ গাহিতে পারে না, অতএব কার্য্য না থাকিলে শক্তিও থাকে না। সুতরাং অদ্বৈতহানির সম্ভাবনা নাই।

যদি বলা হয় "সত্যমভবৎ যদিদং কিঞ্চ" অর্থাৎ এই যাহা কিছু তাহা সত্য হইল। এই কথা বলায় জীবজগৎকে সত্যই বলা হইল। আর তজ্জন্য পরমাত্মার এই সব হওয়ায় পরমাত্মাকে অদ্বৈত বলা চলে না। জীবজগৎ মিথ্যা হইলে পরমাত্মাকে অদ্বৈত বলা চলিত। জীবজগৎ সত্য, অথচ অদ্বৈত বলিলে পরমাত্মার বিকার স্বীকার করিতে হয়, নতুবা সেই পরমাত্মার ভিতরে অবস্থিত এই জীবজগতের সূক্ষ্মাবস্থার অভিব্যক্তি বলিতে হয়, কিন্তু তাহাতেও অদ্বৈতহানি হয়। এতদুত্তরে বলিতে হইবে—না, একথাও সঙ্গত নহে। কারণ "সত্যং চ অনৃতং চ সত্যম্ অভবৎ যদ্ ইদং কিঞ্চ" ইহার স্পষ্ট অর্থ এই যে, যাহা কিছু সত্য এবং অনৃত অর্থাৎ ব্যাবহারিক সত্য এবং প্রাতিভাসিক সত্য সে সকলই সেই সত্য ব্রহ্মই হইলেন। অর্থাৎ ইহা সেই ব্রহ্ম মধ্যে বীজাকারেও ছিল না, ব্রহ্মই এই সকল হইলেন ইহাই এস্থলে বলা হইল। কোন আকারে থাকিলে তিনি হইলেন—একথা বলা আর সঙ্গত হয় না।

যদি বলা হয় "যদিদং কিঞ্চ তৎসত্যম্ ইতি আচক্ষতে" এই বাক্যে এই উৎপন্ন জীবজগৎকেই তো সত্য বলা হইল; কারণ, "তৎ" পদের দুইরূপ অর্থ হয় যথা, একটী "সেইহেতু" আর একটীর অর্থ "সেই"। আর "সত্যম্" পদের অর্থ সত্য। সুতরাং উক্ত বাক্যের একটী অর্থ হয় "এই যাহা কিছু তাহা সত্য বলা হয়" আর একটী অর্থ হয়—"এই যাহা কিছু সেই হেতু সত্য বলা হয়"। এই দুই প্রকার অর্থেই জীব ও জগৎকে সত্য

বলা হইয়াছে। আর জীব ও জগৎ সত্য হওয়ায় সেই পরমাত্মা বিশুদ্ধ অদ্বৈত নহে, কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈত বলিতে হইবে।

কিন্তু তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, যে জীবজগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাকে সত্য বলায়, সেই সত্য কখনই পরমাত্মার ন্যায় সত্য—ইহা বলা হইল না। কারণ, পরমাত্মার উৎপত্তি নাই অথচ সত্য। পক্ষান্তরে তিনি জীব ও জগদ্রূপে উৎপন্ন হইয়া তন্মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ায় "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"। যখন তাহারা সত্য হইয়াছে, তখন তাহারা ব্যাবহারিক বা আপেক্ষিক সত্যই হইতেছে, পরমাত্মার ন্যায় নিরপেক্ষ পারমার্থিক সত্য হইতে পারে না। অর্থাৎ কারণরূপে পরমাত্মার সত্যতাই কার্যরূপ এই উৎপন্ন জীব ও জগতে অনুস্যূত হইয়াছে বলিয়া ইহারা সত্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, ইহাই বুঝাইতেছে। কারণের ধর্ম কতকটা যে কার্যে অনুগত হয়, তাহা সর্ববাদিসম্মত বিষয়। অতএব ব্যাবহারিক সত্য এই জীব ও জগদাদি মিথ্যাই হইল, আর তজ্জন্য সেই পরমাত্মা অদ্বৈত, ইহাই সিদ্ধ হইল।

তাহার পর "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" বলায় জীব ও জগৎ কিছুই ছিল না বলা হইল, অর্থাৎ মূলে বা আসলে অদ্বৈতই সিদ্ধ হইল, ইহাই বলা হইল।

যদি বলা হয়, তবে যাহা সৃষ্টি করা হইল, তাহা তো কারণরূপে ছিল, বলিতে হইবে। নচেৎ তিনি নিজেকে বিকারগ্রস্ত করিয়া এই সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন করিলেন—বলিতে হইবে? কেন্তু তিনি অবিকার, ইহা শ্রুতিতে বহুস্থলে কথিত হইয়াছে। অতএব এই সৃষ্টির উপাদান প্রকৃতি বা পরমাণু প্রভৃতি কোন কিছু, সেই আত্মভিন্ন ছিল—বলিতেই হইবে। আর তাহা যদি আত্মা হইতে স্বাধীনসত্তাক হয়, তাহা হইলে দ্বৈতবাদ সিদ্ধ হয় এবং যদি বিশেষ্য-বিশেষণসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হয়, তাহা হইলে বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধ হয়, অদ্বৈতবাদ তো সিদ্ধ হয় না।

এতদুত্তরে তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, এই সৃষ্টি সেই আত্মবস্তুর শক্তিবিশেষের পরিণতি, এবং সেই শক্তিও অনির্বচনীয়, অর্থাৎ মিথ্যা। আত্মা সেই মিথ্যার অধিষ্ঠান, সুতরাং সত্য, আর অদ্বৈত। অতএব এতদ্দ্বারা অদ্বৈতবাদই সিদ্ধ হয়। অবশ্য এই শক্তিকে নিত্য বলিলে শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সিদ্ধ হইত, কিন্তু ইহাকে নিত্যও বলা হয় না. কারণ, তাহাতে কার্যটি নিত্যই হইবে। এজন্য অদ্বৈতবাদ সিদ্ধিতে কোন বাধাই হয় না। এইরূপে আত্ম-বস্তুর শক্তির দ্বারা এই সৃষ্টির উপপত্তি হইতে পারে বলিয়া প্রকৃতি বা পরমাণু প্রভৃতি আত্ম-ভিন্ন বস্তুর সত্তা স্বীকার আবশ্যক হয় না। আর তজ্জন্য এস্থলে দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈতের সম্ভাবনাও নাই। অলৌকিক তত্ত্বে যে মতে যত অল্পের স্বীকার দ্বারা উপপত্তি হয়, সেইমত তত উত্তম বলিবার রীতি পণ্ডিতসমাজে আছে। অতএব শক্তিদ্বারা সৃষ্টি সম্ভাবনার উপপত্তি হইলে প্রকৃতি বা পরমাণু প্রভৃতি আত্মভিন্ন স্বাধীন সত্তাক বস্তু স্বীকার করিবার আবশ্যকতা থাকে না। আর শক্তিও মিথ্যা বলিয়া মিথ্যার দ্বারা অদ্বৈতের হানি হয় না।

যদি বলা যায় এই শক্তিকে অনিত্য বলা হয় কেন? নিত্য আত্মবস্তুর শক্তিকে নিত্যই বলা উচিত। অনিত্য বলিলে তাহার আবার নিমিত্তকারণ অন্য শক্তি স্বীকার করা

আবশ্যক হয়। আর তাহাকে আবার নিত্য্য বলা আবশ্যক হয়। এজন্য এই শক্তিকেই অনবস্থাভয়ে নিত্য্য বলাই ভাল।

তাহা হইলে বলিব, না, তাহা নহে। কারণ, তাহা হইলে ঐ শক্তির কার্য্যে সৃষ্টি স্থিতি লয়ের ক্রম থাকায় আবার তাহার নিমিত্তকারণ কিছু স্বীকার আবশ্যক হয়। অতএব এই দোষ নিত্য ও অনিত্য উভয় পক্ষে তুল্য। আর এই শক্তি নিত্য্য হইলে সৃষ্টির কখন লয় বা বন্ধ হওয়া উচিত হয় না। ইহা চিরকালই হইতে থাকিবে। কারণে শক্তি থাকিলেই কার্য্য হয়—ইহাই প্রসিদ্ধ নিয়ম। অতএব নিত্য সৃষ্টি হইবে। কিন্তু তাহা স্বীকার করিলে শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয়, প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধও হয়। অতএব যাবৎ শক্তি, তাবৎ সৃষ্টি—ইহা স্বীকার করিয়া শক্তিকে অনিত্য বলাই সঙ্গত। বস্তুতঃ নিত্য হইলে নিত্য সৃষ্টি এবং অনিত্য হইলে তাহার কারণ থাকে বলিতে হয় বলিয়া এই শক্তিকে নিত্যানিত্যভিন্ন অনির্ব্বচনীয় বা মিথ্যাই বলিতে হয়। এই শ্রুতির অনুযায়ী ছান্দোগ্য ৬।৩।২ বাক্য ২ পৃষ্ঠা এবং বৃহদারণ্যক ১।৪।৭ বাক্য ২ পৃষ্ঠা স্মরণ করা যাইতে পারে। ছান্দোগ্যে "অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য" ইত্যাদি বাক্য দ্রষ্টব্য, আর বৃহদারণ্যকে "স এব ইহ প্রবিষ্ট আনখাগ্রেভ্যঃ যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানে অবহিতঃ স্যাদ্" ইতি দ্রষ্টব্য। অতএব ভূতসৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়া জীব হওয়ার মূলে এক ব্রহ্মই সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ অদ্বৈতবাদই সিদ্ধ হয়।

যদি বলা হয়, ব্রহ্ম স্বশক্তিবলে জীবজগৎ হইলেও ব্রহ্মের তো অবস্থান্তর অবশ্য স্বীকার্য্য? আর তাহা হইলে বিশিষ্টাদ্বৈতাদিবাদই সঙ্গত হইবে।

তাহা হইলে বলিব, না, তাহাও নহে। কারণ, এই সৃষ্টিই সত্য নহে যে, সত্য অবস্থান্তর কল্পনা করিব? অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ মিথ্যার পরিণতি মিথ্যাই হয়। ভ্রমবশতঃ জগৎ সত্য জ্ঞান হয় বলিয়া ওরূপ সংশয় আসে মাত্র। স্বপ্ন ইহার দৃষ্টান্ত। স্বপ্নে দৃশ্য সত্য বোধ হয়, সেই স্বপ্নের লয় আবার সুষুপ্তিতে হয়। অতএব জাগ্রতটী আত্ম-শক্তিবশতঃ স্বপ্নের ন্যায় অবস্থা, এবং সুষুপ্তিতে সেই স্বপ্নকারিণী শক্তির যেমন লয় হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞানে এই জাগ্রতকারিণী শক্তিরও লয় হয়। এই কারণে শক্তি অনিত্য, ব্রহ্মই সত্য, সুতরাং অদ্বৈত। আর তজ্জন্য এইরূপে এই শ্রুতি হইতে অদ্বৈতেরই সন্ধান পাওয়া গেল। অদ্বৈতবিরোধী মতবাদিগণ এই শ্রুতির অন্যরূপ ব্যাখ্যায় বহু চেষ্টা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা বিচারসহ হয় না। কেবল তাহাই নহে, এই শ্রুতির দ্বারা সত্তা-ত্রৈবিধ্যও পাওয়া গেল। অর্থাৎ পারমার্থিক সত্তা, ব্যবহারিক সত্তা ও প্রাতিভাসিক সত্তারও সন্ধান পাওয়া গেল। যাহারা বলেন শ্রুতিমধ্যে এই ত্রিবিধ সত্তার উল্লেখ নাই, তাঁহারা এস্থলটী চিন্তা করিতে পারেন। তাহার পর—

(ঙ) অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত।

তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাৎ তৎ সুকৃতমুচ্যতে"॥ ২।৭

অর্থাৎ "এই" পদবাচ্য জীব ও জগৎ অগ্রে অসৎ ছিল, তাহা হইতে সৎ জন্মিল। তাহা নিজে

আপনাকে সৃষ্টি করিলেন, সেই হেতু তাঁহাকে সুকৃত অর্থাৎ স্বয়ংকর্ত্তা বলা হয়। এখানে 'অসৎ'পদে ব্রহ্মই বুঝিতে হইবে ; কারণ, ঐতরেয় ও ছান্দোগ্য মধ্যে "আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ" "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" বলা হইয়াছে। এখন এই অসদ্ ব্রহ্ম বলায় ইহাতে যে 'বিশেষ' কিছুই নাই, অর্থাৎ তদ্ভিন্ন কিছুই নাই—তাহাই বলা হইল, আর তজ্জন্য সেই অসদ্ ব্রহ্মবস্তু যে অদ্বৈত তাহাই বলা হইল। গুণাদি বিশেষ নিষেধের জন্যই অসদ্ বলা হইয়াছে।

যদি বলা হয়—সেই অসতের মধ্যে কিছু বিশেষ না থাকিলে সৃষ্টি হয় কি করিয়া ? অতএব সেই অসৎ মধ্যে অন্ত কিছু জগদ্বীজ অবশ্য স্বীকার্য্য।

না, তাহা নহে। কারণ, সেই আশঙ্কা পাছে হয় সেই জন্যই "এই জগৎ অগ্রে অসৎ ছিল" অর্থাৎ 'কিছুনয়'রূপে ছিল—এই রূপ করিয়া বলা হইল।

যদি বলা হয়—তাহা হইলে জগৎ দৃষ্ট হইতেছে কেন ? "কিছুনয়" হইতে কিছু হয় কি করিয়া ?

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, এইজন্য জগৎকে মিথ্যা বলা হয়। মিথ্যার স্বভাবই এই যে, তাহা না থাকিলেও "আছে" বলিয়া প্রতীত হয়।

যদি বলা হয়—তাহা হইলে এই মিথ্যাই আছে বলিতে হইবে ?

তাহা হইলে বলিব, না, তাহাও নহে। কারণ, "যাহা নাই তাহা যখন দৃশ্য হয়" এজন্য তাহাকে মিথ্যা বলা হয় বলিয়া সেই মিথ্যাকে আবার "আছে" বলিলে উক্ত মিথ্যা লক্ষণেই ব্যাঘাত করা হয়। অতএব সেই অসদ্বস্তুমধ্যে কোন বিশেষ নাই ইহাই বলিতে হইবে।

যদি বলা যায়—তাহা হইলে সেই অসদ্বস্তুমধ্যে করণরূপও কিছু আছে বলিতে হইবে। কারণ, কর্ত্তার যে করণ থাকে, তাহার কর্ত্তার অঙ্গ বলিয়া কর্ত্তার সঙ্গে তাহাকে অভেদে উক্ত করাও হয়, অতএব এই অসদ্ ব্রহ্ম মধ্যে বিজাতীয় সজাতীয় ভেদ না থাকিলেও স্বগতভেদ আছে, যেমন আমাদের করণ চক্ষুরাদির দ্বারা আমরা কার্য্য করি ? চক্ষুরাদি করণের সহিত কর্ত্তা আমাদের স্বগতভেদ স্বীকার করা হয় ?

কিন্তু একথাও সঙ্গত নহে। কারণ, শ্রুতিতে এই জন্য "স্বয়ং অকুরুত" বলা হইয়াছে। এস্থলে "স্বয়ং" পদদ্বারা সেই করণাদির নিষেধ করা হইয়াছে। কর্ত্তা ও করণের মধ্যে অভেদ স্বীকার করিলেও কিছু ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য। এই ভেদ এস্থলে নিবারণ করা হইল।

যদি বলা হয় করণবিশিষ্ট কর্ত্তাকেও "স্বয়ং" পদদ্বারা নির্দ্দেশ ত করা হয় ? অতএব স্বয়ংপদ করণের নিষেধ করিতেছে না ?

কিন্তু তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, 'অকুরুত' বলিলেই তো করণবিশিষ্ট কর্ত্তাকে পাওয়া যাইত। অতএব এস্থলে করণেরই নিষেধ করা হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে "ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে" বলিয়া করণের নিষেধই করা হইয়াছে।

যদি বলা যায়—স্বয়ং পদদ্বারা অপর অধীন কর্ত্তার নিষেধ করা হইয়াছে ?

তাহা হইলে বলিব, তাহাই তো করণ পদবাচ্য হয়। আর "আত্মানম্" "অকুরুত" বলায় তাদৃশ করণ বা অন্ত কোন বস্তুরই সত্তা সিদ্ধ হয় না। কারণ, নিজের উপর কোন কার্য্যের জন্য অপর কোন কিছুরই সাহায্য আবশ্যক হয় না। অতএব করণাদি অপর যাবদ্বস্তুরই নিষেধ বলিতে হইবে।

যদি বলা হয়, মন না থাকিলে কেহই নিজের উপর কোন ক্রিয়াই করিতে পারে না। অতএব মনঃরূপ করণও অবশ্য স্বীকার্য্য ?

কিন্তু তাহাও এস্থলে সম্ভব নহে। কারণ, আমাদের মন, তখন কর্ত্তা আত্মার সঙ্গে অভিন্নই হয়, আর সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুই না থাকায় পরমাত্মার মন স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন। বস্তুতঃ পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া "অমনাঃ" ইত্যাদি শব্দে মুণ্ডকোপনিষদ্ ২।১।২—৩ বাক্যে বলা হইয়াছে। অন্ত শ্রুতিতে এইরূপই বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য শ্রুতিতে মনের উৎপত্তির কথাও বলা হইয়াছে (মুণ্ড ১।১।৮; ২।১।৩)। এতদ্ব্যতীত এক ব্রহ্মই যখন সত্য, অন্য সব মিথ্যা, তখন মনও মিথ্যা, সৃষ্টিও মিথ্যা, অর্থাৎ সৎ নাই, তথাপি দেখা যায় বলা হয়, মাত্র। আর তজ্জন্য এই শ্রুতির দ্বারা সেই এক অদ্বৈত তত্ত্বেরই সন্ধান প্রদান করা হইল।

তাহার পর শ্রুতির দ্বারা বিশিষ্টাদ্বৈত তো খণ্ডিত হইল—ইহাও বলা যায়। কারণ, 'ইদং' পদবাচ্য এই দৃশ্য প্রপঞ্চ অগ্রে অসৎ ছিল বলায় ইহা সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মের অঙ্গস্বরূপ ছিল, তাহা আর বলা যায় না। অদ্বৈতবাদে এ কথায় কোন বাধা নাই। কারণ, অদ্বৈতবাদে মায়ার পরিণাম এই জগৎ বলা হয়। সেই মায়া নাই, অথচ প্রতীত হয়, সুতরাং অসৎ হইতে এই সদ্ জগৎ অর্থাৎ সদ্রূপে প্রতীয়মান উৎপন্ন হয়—একথা এই মতে অসঙ্গত হয় না। অতএব এই শ্রুতি অদ্বৈতবাদেরই অনুকূল নহে। একথা বৃহদারণ্যকোপনিষদেও আছে। ছান্দোগ্যোপনিষদেও ৩।১৯।১ এবং ৬।২।১ বাক্যে এই কথাই আছে। তাহার পর—

(চ) যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি। তত্ত্বেব ভয়ং বিদুষোঽমন্বানস্য। ২।৭

অর্থাৎ "যখন এই জীব এই অদৃশ্য, অশরীর, অনিরুক্ত (নির্বিশেষ), অনাধার ব্রহ্মে নির্ভয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন সেই জীব অভয়প্রাপ্ত হন। আর যখন এই জীব ইহাতে "উদরম্" অর্থাৎ অতি অল্পও অন্তর অর্থাৎ ভেদ দর্শন করে, তখন তাহার ভয় হয়। সেই ব্রহ্মই মননহীন বিদ্বানের ভয়স্বরূপ হন।"

এস্থলে অদৃশ্য, অশরীর, অনিরুক্ত, অনিলয় পদদ্বারা সেই এক অদ্বৈত ব্রহ্মেরই সন্ধান প্রদান করা হইল। কারণ, অদ্বৈত না হইলে অদৃশ্যাদি বাক্য হইতে পারে না।

ক্রমশঃ।

ডায়েলেকটিক্ তত্ত্বে শ্রেণীগত বৈষম্য

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

ঐতিহাসিক ডায়েলিকটিক্ তত্ত্বের দ্বারা কার্ল মার্কস প্রমুখ সমাজতন্ত্রবিদেরা সাধারণকে বুঝাইতে চাহিলেন যে, মানবেতিহাসে যুদ্ধ কলহ দেশ জয়ের আকাঙ্ক্ষার মূলে আছেন অর্থনীতি। আদিম যুগে গোষ্ঠীর মধ্যে সমষ্টিভাবে শস্যাদি উৎপন্ন হইত এবং ব্যষ্টি ভাবে সকলে নিজেদের ভিতর আপোষ মীমাংসায় তাহার বণ্টন হইত। শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে সমবেতভাবে গোষ্ঠী প্রস্তর নির্মিত অস্ত্রশস্ত্রে ধনপ্রাণ রক্ষা করিত। প্রস্তর যুগের পর তাহারা তীর ধনুকের ব্যবহার শিখিল। বনজাত ফল শস্য সচ্ছন্দে তাহারা আহরণ করিত, জলাভূমিতে মাছ ধরিত কিম্বা মৃগ পক্ষী শীকার করিয়া মাংস সংগ্রহ করিয়া খাইত। হিংস্র জন্তু ব্যাঘ্র প্রভৃতি পশু হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাহারা বাসস্থান নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন ব্যষ্টি ভাবে ইহা করা সম্ভবপর ছিল না। তাই পাঁচজনে মিলিয়া মিশিয়া এই সব কাজ করিত। ইহার ফল সমগ্র গোষ্ঠী সমভাবে পাইত। সকলেই সাধ্যানুসারে শ্রম করিত। যাহা কিছু খাদ্যাদি সংগৃহীত হইত তাহা গোষ্ঠীর সম্পত্তি। সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে কেহ স্বত্ব বা স্বামীত্ব দাবী করিতে জানিত না। সেই সময়ে কোন শ্রেণীগত বিভাগ বা পার্থক্য গোষ্ঠীর মধ্যে অজ্ঞাত ছিল। কিছুদিন পরে ইহার পরিবর্তন ঘটিল।

অরণ্য প্রদেশে আহার সন্ধানে বা শীকারে—ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা কলহ হইতে লাগিল। যে অস্ত্রশস্ত্র শীকার বা বন্য জন্তু হইতে আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হইত তাহা গোষ্ঠীর সহিত অপর গোষ্ঠীর মারামারি বা দাঙ্গায় চালাইতে হইল। ইহার পরিণাম যুদ্ধ বা সমর। এই যুদ্ধে কেহ নিহত হইত, কেহ পলাইয়া বাঁচিত আবার কেহ শত্রু হস্তে বন্দী হইয়া ধরা পড়িত। এই বন্দীরাই শেষে ক্রীতদাসের সৃষ্টি করিল। ক্রীতদাসেরা কেহ কেহ জেতার অভিপ্রায়ানুসারে ফল সংগ্রহ করিত, মৎস্য মাংস শীকার করিয়া লইয়া আসিত কিন্তু তাহার স্বত্ব বা স্বামীত্বের দাবি করিত ক্রীতদাসের মালিক বা প্রভু। যে ব্যক্তি অপর গোষ্ঠীর লোককে বন্দী করিয়া আনিত সে ইচ্ছা করিলে তাহাকে বিক্রয় করিত, কেহ ইচ্ছা করিলে জেতার নিকট হইতে তাহাকে কিনিতে পারিত, কিম্বা তাহাকে পশুর মত মোট বহন করাইতে অথবা ক্রুদ্ধ হইলে অস্ত্র দিয়া নিহত করিতে পারিত। যাহা হউক ক্রীতদাসের দ্বারা গোষ্ঠীর সমূহ খাদ্যদ্রব্য এবং শীকারের সংগ্রহশক্তি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পরে ক্রমে ক্রমে ধাতব পদার্থ আবিষ্কার করিয়া গোষ্ঠীরা তাহার ব্যবহার করিতে শিখিল। প্রস্তর বা তীর ধনুকে তাহাদের আর মন রহিল না।

পৌত টিন প্রভৃতি লইয়া ক্রমে ক্রমে তাহারা হল চালনা বস্ত্রবয়ন এবং আহার বিহারাদির জন্ত ধাতুপাত্র নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে ব্যক্তিগত বুদ্ধি ও শ্রমের পার্থক্য দেখা দিল। ইহার ফলে ব্যক্তিগত উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে ক্রয়বিক্রয়ের সূত্রপাত হইল। গোষ্ঠীর সহিত অপর গোষ্ঠীর মধ্যে পণ্যদ্রব্যের বিনিময় হারে আদান প্রদান চলিল। তাহা ছাড়া "জোর যার মুলুক তার" এই নীতি তো আদিম যুগ হইতে বিদ্যমান ছিল। যাহারা বলিষ্ঠ ও বুদ্ধিজীবি তাহাদের সম্পত্তিলাভ করায়ত্ত হইল। ফলে কেহ ক্রীতদাস কেহ প্রভূত সম্পত্তিশালী, কেহ বা অর্দ্ধ সম্পত্তিশালী আবার কেহ বা শুধু শ্রমজীবী। ক্রীতদাসের প্রথায় গোষ্ঠী ভাঙ্গিল।

কৃষি প্রভৃতি শিল্প বাণিজ্য মানুষের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ বা শ্রেণীগত পার্থক্য দেখা দিল। উপরোক্ত বিভিন্ন অবস্থায় আর গোষ্ঠীর সমষ্টিগত সম্পত্তির দাবী থাকিল না। ক্রীতদাস বা অপেক্ষাকৃত দুর্বল ব্যক্তিকে সামান্য মজুরী দিয়া ধনশালী ব্যক্তিগণ সম্পত্তি অধিকার করিয়া বসিল। এইরূপে ব্যক্তিগত অধিকারের সৃষ্টি হইল। সম্পত্তিহীন ব্যক্তিরা ক্রমে ক্রমে ক্রীতদাস হইয়া জীবন রক্ষা করিল। ক্রীতদাস প্রথা চলিত হওয়াতে শ্রেণীগত আভিজাত্য ও সর্বহারা দলের সৃষ্ট হইল। ধনীর সহিত নির্ধনের, লুণ্ঠনকারীর সহিত লুণ্ঠিতের, সম্পত্তিশালীদের সহিত সর্বহারা বা স্বল্পস্বামী ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেণীগত সংগ্রাম বা পার্থক্য আনিয়া দিল—ক্রীতদাসপ্রথা। ফিউডাল বা ভূস্বামী অথবা জমিদারী প্রথায় ক্রীতদাস, চাষী ও মজুর প্রভৃতি যারা দ্রব্যের উৎপন্নের দিকেই দৃষ্টি রাখা হইত—শ্রমিক মজুর ও চাষীদের অস্তিত্ব গণ্যের মধ্যে আসিত না। দাস বা সার্ফদের হত্যা করিবার আদিমকালের অধিকার উঠিয়া গেলেও তাহারা পণ্যের সামিল ছিল।—কিন্তু সাধারণ চাষীদের মধ্যে কেহ কেহ স্বোপার্জিত ভূমিতে চাষ করিত এবং কেহ কেহ কারু বা শ্রমশিল্পের দ্বারা নানাবিধ জিনিষ প্রস্তুত করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন চালাইত, আবার কেহ কেহ নিজ নিজ ইচ্ছামত ছোটখাট কারবার করিত—এই সব কৃষি কারু ও শিল্প বাণিজ্যের উপর অপর কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না। ইহা তাহাদের স্বাধীন স্বোপার্জিত বিত্ত সুতরাং বাহিরের লোকের কোন অধিকার বা অংশ ছিল না। ফিউডাল প্রথা বর্ত্তমান থাকিলেও মূলতঃ—দেশে উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপন্ন দ্রব্য উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল।—ধীরে ধীরে লোহা গলান, তপ্ত লোহা পিটাইয়া নানা দ্রব্য প্রস্তুত হইতে লাগিল, লোহার হল এবং তাঁতের চাহিদা দিন দিন বাড়িতে লাগিল. কৃষি ফলপুষ্প গুল্মলতা সুসজ্জিত উদ্যানবিদ্যা, দ্রাক্ষা চাষ এবং পশুপক্ষী ও গোপালন ব্যবসায় প্রভৃতির অনুশীলন চলিল। উৎপাদিকা ও উৎপন্নশক্তির বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইল—হস্তশিল্পের সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট শিল্প দ্রব্যের কলকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধিতে। এই নূতন উৎপন্ন শক্তির আবির্ভাবে মজুরের বা শ্রমিকের চাহিদা চারিদিক হইতে বাড়িতে লাগিল। শ্রমিকেরা যাহাতে নানা উৎপন্ন শিল্পের প্রবর্ত্তক হইতে উদ্যোগী হয় এবং এই কাজে তাহাদের যাহাতে

অধিকতর প্রবল ঝোঁক হয় এবং কাজের জন্য যাহাতে আগ্রহ থাকে তাহার দিকে সকলের নজর পড়িল। সাধারণ কৃষি কাজে মজুরদের মজুরী ছাড়া আর কোন স্বার্থ ছিল না। সুতরাং মজুর বা শ্রমিকেরা জমিদার প্রভুর চাষে কেবল চুক্তি মত খাটিত। কিন্তু জমির উর্বরাশক্তি বাড়াইতে জমির পাট করিতে কিম্বা ফসল বৃদ্ধির জন্য তাহাদের কোন আগ্রহ বা মাথাব্যথা ছিল না। কাজেই ভূস্বামিরা মজুরদের খাটাইয়া কোন লাভবান হইতে পারিত না, তাই তাহারা মজুরদের আর কাজে লাগাইত না। সুতরাং জমির চাষী প্রজাদের ভাগবখরায় লাগাইয়া তাহারা চাষের কাজ চালাইত। ইহাতে ভূস্বামীদার জমির সার, কৃষির জন্য হল বলদ কাস্তে প্রভৃতি সরবরাহ করার দায় হইতে বাঁচিয়া যাইত। নগদ কোন মজুরী তাহাকে হইতে দিতে হইত না। বিনা অর্থব্যয়ে তাহারা প্রজাদের নিকট হইতে নিজের খাস জমির জন্য শস্যের অংশ পাইত কিম্বা উহার বিনিময়ে নগদ অর্থও ঘরে আসিত।

এই ভাবে ব্যক্তিগত স্বত্বস্বামীত্ব ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রীতদাস প্রথার সময়ে যেমন উৎপীড়ন নিষ্পীড়ন ছিল এমজুর শ্রমিকদের উপর ঠিক তেমনি চলিতে লাগিল—তবে কিছু রকম ফের। একদিকে শুধু কায়িক শ্রমের দ্বারা অর্থশালীদের কৃপার উপর মজুরদের নির্ভরতা, অপর দিকে অর্থশালী পুঁজীবাদীদের স্বার্থ বা আয় বৃদ্ধি নির্ভর করিত শ্রমিকদিগকে প্রবঞ্চিত করিয়া—তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া—তাহাদের উৎপন্নদ্রব্য সুলভে ক্রয় করিয়া পুঁজিবাদীরা এইরূপে তাহাদের নিজেদের লাভের অঙ্ক বাড়াইত। জমিদারী প্রথার সময়ে এই ভাবে শ্রেণীগত সংঘাতের সূত্রপাত হইল।

ইহার পরিণাম একদিকে শ্রমিক অপরদিকে ধনিক, একদিকে মজুর অপরদিকে পুঁজিবাদী, একদিকে কৃষি বা কারখানার বুভুক্ষু সর্বহারার দল অপরদিকে দরিদ্রের রক্তশোষণকারী কৃষি বা কারখানার মালিকেরা। ডায়েলেকটীক্‌ তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গীতে ইহা মানবেতিহাসের মূল সূত্র।

বড় বড় অর্থশালী বা পুঁজিবাদিরা ক্রমে ক্রমে কলকারখানার সংখ্যা বাড়াইয়া দেশ বিদেশে পণ্য সম্ভার পাঠাইয়া পুঁজির পাহাড় ভারী করিতে লাগিল—আর শ্রমিকেরা—মজুরেরা—দেহের রক্ত জল করিয়া কুলিগিরি বা মোট ঘাট বহিয়া দিন রাত্রি পশুর অপেক্ষা হীন ভাবে দৈহিক পরিশ্রমে, স্ত্রীপুত্র সংসারের সর্ব ভুলিয়া পুঁজীবাদীদের মধু সঞ্চয় করাইয়া দিতে লাগিল। ইহার ফলে অর্থ বা পুঁজি কয়েকগুলি মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। রাজশক্তি বা দেশশাসন ইহাদের করায়ত্ত হইয়া পড়িল এবং তাহাদের সুযোগ সুবিধার জন্য সর্বহারা মজুরদের কুক্ষিগত করিবার জন্য নূতন নূতন আইন হইতে লাগিল। মজুররা বা শ্রমিকরা কি করিবে? দুই মুঠা তো তাহারা খাইবে? পুঁজিবাদীদের চক্রান্তে আর ছোট ছোট স্বাধীন বৃত্তিজীবীদের মুক্তি রহিল না। কলের প্রতিযোগিতায় হস্তজাত কুটীর শিল্প কি দাঁড়াইতে পারে? জমি যান্ত্রিক হলে চাষ হইতে

বেদাঙ্গ বেদের অংশ নহে—বেদের পরিশিষ্ট। এই বেদাঙ্গের সাহায্যেই বেদের অর্থ গ্রহণ হয়। এইগুলি অপৌরুষেয় নহে। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণকে 'প্রবচন' আখ্যা দেওয়া হয়—কিন্তু মনু বেদাঙ্গকে 'প্রবচন' (৩) নাম দিয়াছেন। ষড়্‌বেদাঙ্গের সর্বপ্রথম উল্লেখ সামবেদের ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণে (৪) দেখিতে পাওয়া যায়। যাস্ক তাঁহার নিরুক্তে (৫) বেদাঙ্গের বিষয়টী উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু বেদাঙ্গের কোন নাম দেন নাই। চরণব্যূহ, মনু (৬), মুণ্ডক ও ছান্দোগ্যোপনিষদে ছয়টী বেদাঙ্গের উল্লেখ আছে। (৭) কিন্তু বেদাঙ্গের অন্তর্গত বিষয়সকলের যথাযথ বিবরণ বৃহদারণ্যক ও তদ্ভাষ্যেই পাওয়া যায়। এই বেদাঙ্গ কোন ব্যক্তিবিশেষের গ্রন্থকে লক্ষ্য করিত না, ইহা ব্যাকরণশাস্ত্রকেই বুঝাইত। ঋগ্বেদের ভাষ্যে সায়ণাচার্য যেরূপে বেদাঙ্গ-ব্যাকরণের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে কোন ব্যক্তিবিশেষের ব্যাকরণকে লক্ষ্য করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। দুর্গাচার্যের বচন (৮) হইতেও তাহা প্রমাণিত হইতে পারে। ঋক্‌ যজুঃ ও অথর্ব বেদের প্রাতিশাখ্যগুলি যেভাবে গ্রথিত, তাহাতে তাহাদিগকে এক একখানি বেদাঙ্গ-ব্যাকরণ বলা নিতান্ত যুক্তিহীন নহে।

বস্তুতঃ, পাণিনির পূর্ব হইতেই যে ব্যাকরণ বেদাঙ্গ নামে অভিহিত হইত তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। পাশ্চাত্ত্য শব্দতত্ত্ববিৎ রোট, বার্নেল প্রভৃতি পণ্ডিতও এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তবে, একমাত্র অধ্যাপক গোল্ডষ্টুকর বেদাঙ্গ বলিতে কেন যে পাণিনির ব্যাকরণই বুঝিয়াছেন (৯), তাহা বুঝিতে পারা যায় না। যাহা হউক তাঁহার এই মত যে নিতান্ত অযৌক্তিক তাহাতে সন্দেহ নাই। পাণিনির বহু পূর্বে যে ব্যাকরণের পারিভাষিক শব্দের অস্তিত্ব ছিল বৈদিক গ্রন্থ হইতে তাহার যথেষ্ট উদাহরণ

পারিভাষা

দেখান যাইতে পারে। বৈদিক সাহিত্য কোন্‌ সময় বিদ্যমান ছিল তৎসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত থাকিলেও একথা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, সেগুলি পাণিনির বহু পূর্বের। বৈদিক সাহিত্যে পরিভাষাগুলি যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল এরূপ কল্পনা করিবারও কোনই কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রথম উদাহরণ তৈত্তিরীয় আরণ্যকের প্রথম উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, "'শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণঃ স্বরঃ। মাত্রা বলম্‌। সাম সন্তানঃ। ইত্যুক্তঃ শীক্ষাধ্যায়ঃ।'

(৩) 'অগ্র্যাঃ সর্বেষু বেদেষু সর্বপ্রবচনেষু চ। শ্রোত্রিয়ান্বয়জাশ্চৈব বিজ্ঞেয়াঃ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ॥"—৩. ১৮৪।

(৪) ৪. ৭।

(৫) নিরুক্ত—১. ২০।

(৬) মনু—৩. ১৮৫।

(৭) ষড়্‌বেদাঙ্গ যথা—"শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দসাং চয়ঃ
জ্যোতিষামযনঞ্চৈব বেদাঙ্গানি ষড়েব তু॥"

(৮) "ব্যাকরণং অষ্টধা নিরুক্তং চতুর্দশধা" ইত্যাদি।

(৯) Academy, July 1870.

—৭. ১,৯। (১০) অতএব বর্ণ, স্বর ও মাত্রা এই তিনটী পারিভাষিক শব্দ পাওয়া গেল। ছান্দোগ্য-উপনিষদে (১১) স্পর্শস্বর ও উষ্মবর্ণের উল্লেখ আছে। শতপথ-ব্রাহ্মণের (১২) "নহ একবচনেন বহুবচনং ব্যবহামেতি", এই বাক্যে বৈয়াকরণিক একবচন ও বহুবচনের কথা দেখা যায়। অধ্যাপক বেবের শতপথ-ব্রাহ্মণের ১০১৮ পৃষ্ঠার টীকায় প্রমাণ করিয়াছেন, যে সময় এই ব্রাহ্মণ লিখিত হইয়াছিল সেই সময় ব্যাকরণ এরূপ উন্নত হইয়াছিল যে, ভূ অস্ প্রভৃতি ধাতুর ব্যাখ্যাও ইহাতে আলোচিত হইয়াছিল।

এই উক্তির সমর্থনের জন্য ঐতরেয় ব্রাহ্মণের 'মদ' ধাতু (১. ১০, ২. ৩, ৩. ৯, ১৯), 'স্বধা'—স্বধিত (৩. ৩৯, ১৭), অনুষি—জাত-বং (৬. ৬, ২৯, ৩২, ৫. ৪) প্রভৃতি উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১৩) অক্ষর, অক্ষরপংক্তি, চতুরক্ষর, বর্ণকার, পদ প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়। গোপথব্রাহ্মণ যদিও পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণগুলির তুলনায় পরবর্তী, তথাপি ইহাতে অধিকাংশ পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ আছে। ইহার ১. ২৪ সূত্রে আছে—"ওঙ্কারং পৃচ্ছামঃ কো ধাতুঃ কিং প্রাতিপদিকং কিং নামাখ্যাতং কিং লিঙ্গং কিং বচনং কা বিভক্তিঃ কঃ প্রত্যয়ঃ কঃ স্বরঃ উপসর্গো নিপাতঃ কিং বৈ ব্যাকরণং কো বিকারঃ কো বিকারী কতিমাত্রঃ কতিবর্ণঃ কত্যক্ষরঃ কতি পদঃ কঃ সংযোগঃ কিং স্থানানুপ্রদানকরণং শিক্ষকাঃ কিমুচ্চারয়ন্তি কিং ছন্দঃ কো বর্ণঃ ইতি পূর্বে প্রশ্নাঃ।" অতএব, ইহাদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, ওঙ্কারের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ইহাতে প্রধান প্রধান পরিভাষার নামোল্লেখ করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সামবেদের তাণ্ড্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ হইতেও বৈয়াকরণিক অর্থদ্যোতক বহু পরিভাষার নাম পাওয়া যায়. এখানে সেগুলির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

শিক্ষা, প্রাতিশাখ্য

'শিক্ষা' বৈদিক মন্ত্রের প্রকৃত উচ্চারণ ও যথাযথ আবৃত্তি-বিষয়ে শিক্ষা দেয়। অধ্যাপক হোগ (Haug) বলেন, শিক্ষা প্রাতিশাখ্য অপেক্ষা প্রাচীন এবং ইহার বিধি-ব্যবস্থা পরে প্রাতিশাখ্যের নিয়মাদির সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। ডক্টর বার্নেলও তাহাই বলেন। কেহ কেহ এই শিক্ষাগ্রন্থের এতাদৃশ প্রাচীনত্ব বিষয়ে সন্দেহ করিয়া থাকেন। সকল শিক্ষা-গ্রন্থই যে প্রাচীন তাহা নহে। সমুদয় শিক্ষা-গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায় নাই. তবে, সম্প্রতি অধিকাংশ গ্রন্থই আবিষ্কৃত হইয়াছে. তৎসমুদয়ের মধ্যে 'অমোঘনন্দিনী শিক্ষা' (১৪), 'কেশবী শিক্ষা' (১৫),

(১০) Bibl. Indica Edition, by Rajendralal Mitra, p. 725.
(১১) ছান্দোগ্য-উপনিষদ—২. ২২, ৩, ৫।
(১২) Dr. A Weber's Edition, p. 990
(১৩) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, অধ্যায়—১, ২, ৫।
(১৪) Rajendralal Mitra, "Notices", I p. 72
(১৫) Rajendralal Mitra, "Report", p. 18.

'শিক্ষাসমুচ্চয়' (১৬) ও শ্রীনিবাস-কৃত 'সিদ্ধান্ত-শিক্ষা' (১৭) যে নিতান্ত অর্বাচীন তাহা পণ্ডিতমণ্ডলী স্বীকার করেন। তবে, 'গৌতমী' (১৮), 'নারদ' (১৯), 'মণ্ডুকী' (২০), ও 'লোমশনী' শিক্ষা (২১) যে অতি প্রাচীন সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না।

যাহা হউক, এই শিক্ষাগুলি ব্যাকরণ-শ্রেণীর অন্তর্গত নহে—তবে এগুলিতে উচ্চারণ ও আবৃত্তি, ব্যাকরণের এই দুইটী বিষয় আলোচিত হইয়াছে মাত্র। অতঃপর প্রাতিশাখ্যেই ব্যাকরণের অনেক কথার আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। শব্দসকলের উচ্চারণ, উচ্চারণাদির লঘু গুরু-ভেদ, প্রত্যেক অক্ষর ও শব্দের উচ্চারণ-সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ বিধি, প্রকৃতি, কাধকারিতা, দুই বা ততোধিক শব্দের সন্ধিবিধি, কারক, তদ্ধিত, সমাস প্রভৃতি এই প্রাতিশাখ্যগুলির আলোচ্য বিষয়। বৈদিক ভাষার ব্যাকরণ-বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য এই প্রাতিশাখ্যগুলি রচিত হয় নাই। এইগুলিতে শব্দ বা ধাতুর প্রকৃত্যাদির আলোচনাও নাই। তবে, এগুলি পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, কথিত ভাষা ও সঙ্গীতে কিরূপ উচ্চারণপার্থক্য ঘটে তাহা দেখিবার জন্য অক্ষর ও শব্দের উচ্চারণাদির বিশুদ্ধ বিধিব্যবস্থা দিবার জন্যই এইগুলি রচিত হইয়াছিল। ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব—এই চারি বেদের চারিটী প্রাতিশাখ্য আছে। ইহাদের মধ্যে ঋগ্বেদ-প্রাতিশাখ্যই (২২) সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে বর্ণ, উচ্চারণ, প্রযত্ন প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। যথা "অথ বর্ণ সমাম্নায়ঃ।" "তে তে সবর্ণে হ্রস্বদীর্ঘে।" "নপ্লুতপূর্বম্।" "ষোড়শাদিতঃ স্বরাঃ।" "শেষা ব্যঞ্জনানি।" শুক্লযজুর্বেদীয় বাজসনেয় প্রাতিশাখ্য ও বেদাধ্যয়ন বিষয়ে অনেক আলোচনা করিয়াছে। ইহার অপর নাম কাত্যায়ন প্রাতিশাখ্য। (২৩) এখানি অতি প্রাচীন কালের রচনা। তবে ইহা যে পরবর্তী কালে বিশেষ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছিল তাহা সহজেই বলিতে পারা যায়। সংজ্ঞা, পরিভাষা, শব্দের উচ্চারণের নিয়ম, সন্ধি, ক্রিয়ার উপর যতিপাতের নিয়ম ও উচ্চারণের নিয়ম, স্বর ব্যঞ্জনের তালিকা, পদপাঠের নিয়ম প্রভৃতি কয়েকটী বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। (২৪) সাধারণতঃ

(১৬) Mysore Cat. No. 57. (১৭) Mysore Cat. No. 51, p. 8.

(১৮) Haug, "Ueber das Wesen" U.S.W.P.N.K.—ইহা তামিলদেশে রক্ষিত।

(১৯) A. C. Burnell, "Notices" I p. 73. অধ্যাপক হোগের মতে ইহার দুই প্রকার মূল বিদ্যমান আছে।

(২০) Haug, U.S.W.P.N.K., p. 52. Weber, "Pratijna Sutra" p. 106f. "Notices", I. p. 73.

(২১) "Report" p. 18. Haug, U.W.S.N.K., P. p. 61. "Notices", i. p. 71.

(২২) ভোজদেবের সমসাময়িক বজ্রটের পুত্র উবটভট্ট 'পার্ষদব্যাখ্যা' নামে ইহার টীকা রচনা করেন।

(২৩) উবটভট্ট ইহার টীকা করিয়াছিলেন। 'জ্যোৎস্না' নামক রামচন্দ্র কৃত আর একটী টীকাও বর্তমান আছে, তবে সেটী আধুনিক।

(২৪) যথা— ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্য— ১। ক-কার, ইত্যাদি (৬. ৬)। ২। ই, উ, এ

আট জন বৈয়াকরণের নাম উল্লিখিত হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যের দেবগিরি-নিবাসী বোপদেব তাঁহার "মুগ্ধবোধে"র উপক্রমণিকার দ্বিতীয় শ্লোকে এই আট জন শাব্দিকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন—"ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃ কাশকৃৎস্নাপিশলিঃ শাকটায়নঃ। পাণিন্যমর-জৈনেন্দ্রা জয়ন্ত্যষ্টাদিশাব্দিকাঃ॥" দুর্গাদাস তাঁহার গ্রন্থের টীকায় বলিয়াছেন, 'ব্যাকরণং অষ্টধা' (১. ২.)। এই আট জন শাব্দিকের মধ্যে পাণিনির ব্যাকরণই সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। শাকটায়ন ও জিনেন্দ্রের হস্তলিখিত পুঁথি আজও বর্তমান আছে। তিব্বতীয় ভাষায় 'চন্দ্রব্যাকরণ' অদ্যাপি সুরক্ষিত আছে। (২৫) ইন্দ্র, কাশকৃৎস্ন আপিশলি ও অমরের নাম সূত্রাদির উদ্ধৃত বচনে দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্রই আদি ব্যাকরণ-প্রণেতা ছিলেন, এই মতই বিশেষ প্রচলিত। সারস্বত ব্যাকরণের ভাষ্যে ইন্দ্র আদি বৈয়াকরণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। "ইন্দ্রাদয়োঽপি যস্যান্তং ন যযুঃ শব্দবারিধেঃ। প্রক্রিয়াং তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমো বক্তুং নরঃ কথম্॥" (বোম্বাই-সংস্করণ, শ্লোক ২)। উত্তর দেশীয় বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতেও ইন্দ্র-ব্যাকরণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অবদান শতকে লিখিত আছে, সারিপুত্র বাল্যকালে ইন্দ্রব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। (২৬) তিব্বতীয় সাহিত্যে ইন্দ্রব্যাকরণের উল্লেখ বহুবার দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, সর্বজ্ঞ-(শিব-) কর্তৃক প্রথম ব্যাকরণ প্রণীত হয়। কিন্তু এই ব্যাকরণ তিনি কখনও জম্বুদ্বীপে প্রেরণ করেন নাই। তৎপরে ইন্দ্র ইন্দ্রব্যাকরণ

পাণিনির পূর্ববর্তী বৈয়াকরণগণ

ইত্যাদি (অনুক্রমণিকা)। ৩। কণ্ঠ্য ইত্যাদি (অনুক্রমণিকা) দ। ৪। রেফ (১. ১০।
৫। ণ-কারচ-কারবর্গয়োঃ (৪. ৮)।

তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য— ১। অ-কার (১. ২১), ঈকার (১. ১৮); ঋ-কার (১. ১৩), অ-বর্ণ (৭. ৫), ই বর্ণ ইত্যাদি (১. ৮)। ২। ৭ (৫ ৩০), ন (৫. ৩২), ক্ষ (২. ৩)। ৩। ত, ট (৭. ১৩), ১, ম (৭. ১৪); র (১ ১৯)। ৪। রেফ (১. ১৯)। ৫। ক-বর্গ (২. ৩৫); চ-বর্গ (২. ৩৬), ট-বর্গ (১৪. ২০)।

কাত্যায়নীয় প্রাতিশাখ্য— ১। ঐ-কার, ঔ-কার (১. ৭৩), ৯-কার (১. ৪৩); উ-বর্ণ (১. ১১৬)। ২। উরোস্পর্শঃ (১. ৭০), অ (১. ৭১)। ৩। র (১. ৬০), ৪। ষুঃ (১৩. ১৩২)। [ইহা 'ন' স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে]। ৫। ত-বর্গ (১. ৯৭)।

এই প্রাতিশাখ্যে পাণিনির 'এং' প্রভৃতির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলি যে পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহার যথেষ্ট কারণও আছে।

অথর্ব-প্রাতিশাখ্য— ১। অ-কার (১ ৩), ৯-কার (১. ৪), ল-কার (১. ৫), ষ-কার (১. ২৩)। ২। অ-বর্ণ (১. ৩৭)। ৩। য, র (১ ৬৮), ণ যমেষু (২. ৬)। ৪। রেফ (১. ২৮)। ৫। চ-বর্গ (১. ৭), উষ্মীভূ (২. ১২), চতুর্বর্গস্থ (২. ১৪) ইত্যাদি।

(২৫) Schiefner, "Neber die logischen und grammatischen Werke in Tandjur."

(২৬) Burnouf, "Introduction" i. p. 456. "a' Seize ansil avait lu la grammaire d'Indra et vaineau tods ceuse quiudisputaient avec lui"; Wassilycurs, "Der Buddismus" p. 332.

প্রণয়ন করেন ও বৃহস্পতি তাহা অধ্যয়ন করেন। ইহা জম্বুদ্বীপে প্রচলিত ছিল। অতঃপর পাণিনি-ব্যাকরণ এই স্থানে সবিশেষ প্রচলিত হয়। (২৭) 'বৃহৎকথামঞ্জরী' ও 'কথাসরিৎসাগরে' লিখিত আছে যে, পাণিনি-ব্যাকরণের আবির্ভাবের পর হইতেই ইন্দ্রব্যাকরণের চর্চা লোপ পাইতে থাকে।

১৬০৮ খ্রী° (২৮) তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারনাথ একখানি ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস প্রণয়ন করেন। তারনাথের মতে, সপ্তবর্মা (২৯) (সর্ববর্মা ?) ষণ্মুখকে (কার্ত্তিকেয়কে) ইন্দ্রব্যাকরণ তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিতে বলেন। তৎশ্রবণে কার্ত্তিকেয় বলেন--"সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ"। এইটুকু শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ তিনি ব্যাকরণের অবশিষ্ট অংশ বুঝিয়া ফেলিলেন। উদ্ধৃত সূত্রটী প্রকৃতই কাতন্ত্র বা কলাপ-ব্যাকরণের প্রথম সূত্র। এছাড়া ইহা ইন্দ্রব্যাকরণের অন্তর্গত। তারনাথ সপ্তবর্মাকে কালিদাস ও নাগার্জুনের সমকালিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি বলেন, পাণিনি-ব্যাকরণের সহিত ইন্দ্র-ব্যাকরণের, কলাপ-ব্যাকরণের সহিত চন্দ্রব্যাকরণের (৩০) ঐক্য আছে। যক্ষবর্মা শাকটায়ন-ব্যাকরণের টীকায় ইন্দ্রের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সায়ণাচার্য ঋগ্বেদের ভাষ্যে যেরূপ উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে ইন্দ্রকে আদি বৈয়াকরণ বলা যাইতে পারে। এইরূপে ইন্দ্রব্যাকরণের উল্লেখ বহু গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও অধুনা ইন্দ্রব্যাকরণের

---

(২৭) Wassiljew in Schiefner's translation of Taranatha's Tibetan History of Indian Buddhism, p. 294.

(২৮) Do. German translation, p. 54.

(২৯) সংস্কৃত পুঁথিতে 'সববর্মা' দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তারনাথ স্পষ্ট বলিয়াছেন, 'সববর্মা' ও 'ঈশ্বরবর্মা' এই দুইটাই ভুল।

(৩০) চন্দ্রাচার্যের অপর নাম চন্দ্রগোমি। ইনি মহারাজ কনিষ্কের পরে পূর্বাঞ্চলে 'বরেন্দ্র'-ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ বাঙলা এই স্থানটী—বাকলা। ভর্তৃহরি-কর্তৃক 'চন্দ্র-ব্যাকরণে'র নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ভারতের কোথাও চন্দ্রব্যাকরণের সম্পূর্ণ প্রতিলিপি পাওয়া যায় না। কাশ্মীরপ্রদেশে ডক্টর বুলার চন্দ্রব্যাকরণের 'বর্ণসূত্র' (শিক্ষা) ও পরিভাষাসূত্র ১৮৭৬ খ্রী° প্রাপ্ত হন। তিব্বতীয় ভাষায় চন্দ্রব্যাকরণের উণাদি-বৃত্তি ও উপসর্গ-বৃত্তি সংরক্ষিত আছে। বৌদ্ধ গ্রন্থকার ভিক্ষু স্থিরমতি নেপালের মধ্যবর্তী পটেন নগরে অবস্থানকালে (৯৫০—১০০০ খ্রীঃ) চন্দ্রব্যাকরণের অন্তর্গত 'ধাতুপাঠ' ও 'অধিকার-সংগ্রহ' তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। এতদ্ভিন্ন ধর্মদাসের 'সূত্রবৃত্তি' ও 'গণপাঠ', আনন্দদত্তের 'সূত্রপদ্ধতি', পূর্ণচন্দ্রের 'ধাতুপারায়ণ' এবং কায়স্থ চন্দ্রদাসের 'সম্বন্ধ-উদ্দেশ'ও (চন্দ্রবৃত্তি) আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্প্রতি ৬ অধ্যায়ে বিভক্ত চন্দ্রব্যাকরণের সম্পূর্ণ 'সূত্রপাঠ' পাওয়া গিয়াছে। পূর্বে সিংহলে চন্দ্রব্যাকরণ পঠিত হইত। কিন্তু খ্রীষ্টীয় প্রায় ১২০০ অব্দে সিংহলের বৌদ্ধ যতি 'কাশ্যপ' সংস্কৃত শিক্ষা-সৌকর্যার্থ 'বালাবোধ' নামক সরল ব্যাকরণ রচনা করেন। সিংহলের সর্বত্র ইহার প্রচার হওয়াতে চন্দ্রব্যাকরণের অধ্যয়ন সিংহলে বন্ধ হইয়া যায়। কাশ্যপের ব্যাকরণ অনেকটা 'লঘুকৌমুদী'র মত। জয়াদিত্য ও বামনের 'কাশিকাবৃত্তি'তে চন্দ্রব্যাকরণের মত সমালোচিত হইয়াছে।

কোন অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, পাণিনির পূর্বে পাণিনি-ব্যাকরণের ন্যায় এই ব্যাকরণের সুবিস্তৃত প্রচলন ছিল। পাণিনির পূর্বের দু'চারখানি ব্যতীত প্রায় সমস্ত ব্যাকরণই ইন্দ্রব্যাকরণ নামে অভিহিত হইত। তিব্বতে কলাপ-ব্যাকরণকে ইন্দ্রব্যাকরণ বলিত। বোধ হয়, পাণিনির পূর্বে ইন্দ্রব্যাকরণ-অনুযায়ী যিনি যে ব্যাকরণ রচনা করিতেন তাহারই নাম 'ঐন্দ্র' রাখা হইত।

স্বামী অভেদানন্দের চিঠি

দার্জ্জিলিং

১লা জুলাই

স্নেহের —

অনেকদিন পরে তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্রখানি পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইয়াছি। তুমি নববর্ষের শুভাশীর্ব্বাদ জানিবে এবং বাড়ীর সকলকে দিবে। গোপালের অসুখ শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। তাহাকে ও নীহারকে আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানাইবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট তাহার আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করিবে। সন্তান হইলে তাহার ঠিক ঠিক যত্ন লইতে না পারিলে নানাবিধ রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ছেলে পুলে মানুষ করিতে অনেক অর্থের আবশ্যক। সাধারণ লোকে এই সকল বিষয় না ভাবিয়া সংসার করিতে যায় এবং রোগ, শোক ও নানাবিধ কষ্টে পড়িয়া হাবুডুবু খায়। ইহাই মায়ার খেলা জানিবে। সংসারের সবই অনিত্য এক ভগবানই নিত্য ও সত্য। তাঁহাকে ধরিয়া থাকিলে শান্তি ও আনন্দ পাইবে। সংসারী জীবমাত্রেই স্বার্থ চরিতার্থ করিয়া থাকে। তাহারা নিজের কর্ত্তব্য না করিয়া অপরের দোষ দেখে। তাহাদের স্নেহ ভালবাসা স্বার্থের উপর নির্ভর করে। তোমার যেমন কর্ত্তব্য আছে সেইরূপ তাহাদেরও তোমার প্রতি কর্ত্তব্য আছে। কিন্তু তাহারা স্বার্থপর হইয়া তোমাকে যদি কষ্ট দেয় তাহাতে তাহাদের মঙ্গল হইতে পারে না। এ বিষয়ে অধিক লেখা বাহুল্যমাত্র। বর্ত্তমানে আমার স্বাস্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ভাল আছে। আশ্রমের সকলে ভাল আছে এবং কার্য্য বেশ চলিতেছে। তোমরা সকলে আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

অভেদানন্দ

দিছিলাম তাতে তুমী আমারে ধরা করিলায় আমী হাজির করিবার দশ মধ্যেও কহিলেক আমার হাজির করনা তবে আমী উহাক্কা লিখিয়া দিছিলাম ১০৭০ সন হাজার সত্তরি মাসের অগ্রহায়ণের ২ দুই মাস অন্ত হাজির করিমু হাজির করিতে না পারী তবে আমী তার বদল তুমার গুলাম হনে তার পীছে ১০৭১ মাস অন্ত আমারে ধরা করিলায় আমী হাজির করিবার তাতে আমার বুতে হাজির করাংনা জায় সব্ব আপনার খুস বজায়ে লিখিয়া দিতেছী আমী তুমার গুলাম হৈলাম তার বদল পরন্তু সে যে কালে তুমার নিকট আইসে তাহাতে আমারে ফারক দিবায় এই নিয়মের তুমার ঠাঁই গুলামী পং দিলাম ইতি সন ১০৭০ তারিখ ২৭ আশ্বিন লিখিতং শ্রীরঘুনাথ বিশারদেনেতি

শ্রীকাইকদা

মতং স্বতক"

"পত্র

সেবতা

স্বস্তি সকল মঙ্গলালয় শ্রীরামজীবন চৌধরী মহাশয়েষু শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্মণঃ সমর্পণ পত্র মিদং কার্য্যঞ্চ। আগে আমী তুমার স্থান হনে ৬ ছয় রুপাইয়া লইয়া আমার পিতারে দিলাম দিয়া আমার পিতা ও মাতা দুইর সম্মতি লৈয়া আপনার স্বেচ্ছাতে তুমার সঙ্গে সমর্প করিলাম তুমার সন্নিহিত থাকিয়া তুমার ইষ্টদেবের ৺পূজা করিমু আর ব্রাহ্মণে যে যে কার্য্য করে তারে করিমু তুমারে ছাড়িয়া অন্যত্র না যাইমু যদি এত আরমত কুন ও দিন করী তবে আমী ৺চরনে বিচ্ছেদ হৈ এতদার্থে তুমারে সমর্প পত্র দিলাম ইতি শন ১০৯৬ শালতে ১ পৌষস্য উভয়াবমতা লিখিত শ্রীকমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যেনদমিতি ।"

———

[৩]

"শ্রীশ্রীমতা খুলতান আওরঙ্গ সা সেব পাদশাহানা

স্বস্তি অষ্টনবত্যুত্তরোত্তর সহস্রাকে চৈত্রস্য দ্বাদশ দিবসে ৺ মমুকাদিনি রাজ্যে তদধিকারান্তর্গত লোক বক্ষাদিশকো শ্রীযুক্ত নবাব বাহাদুর খান মহাশয়ানাং ঢকাবস্থিতি কালে শ্রীহট্টাধ্যক্ষীয় শ্রীযুত ইস্ফান্দিয়ার খান মহাশয়ানামধিকারে পরগণে বানিয়াচং চতুরকান্তর্গত মছলা গ্রাম পাটকস্থ শ্রীরামজীবন চতুর্দ্ধরিণঃ শকাব্দাত ৫০ পঞ্চাশ কার্যাপনান গৃহীত্বা তৎ পরগনান্তর্গত তদ্গ্রাম নিবাসিনা শ্রীবুধিরা তৎ পত্ন্যা শ্রীরেণাই দাস্য সহ স্বেচ্ছয়া

আম্মোন বিক্রিতমিতি অত্র প্রাপ্ত দুই অঙ্ক মাল ৫০ পঞ্চাশ কাহন আর এর বাব আমার বাপ নবনির নামে যে।৶০ ছয় আনা জমা আছিল এহে তোমার তালুক সামিল সন ১০২১ সাল হনে উত্তিলায় খারিজ করি আনিবায় নিমাটিয়া ইতি সন ১০২৮ সাল তেরিখ ১২ বারই৹চৈত্র*

* উক্তআমত্তা। শ্রীমাধব রা(ম) বিষ্ণালঙ্কারেন লিখিতম"

[৪]

"শ্রীশ্রীমতা সুলতান ৺দ'সাদের পাদপদ্মান।

স্বস্তি পঞ্চোত্তর একাদশ সতাব্দে বৈসাখস্য তৃতীয় দিবসে ৺মগুন্দিনি বাজো বঙ্গাদিপতেঃ শ্রীযুত নবাব ইবহ্রাহিম্ খান মহাসয়ানামধিকারে শ্রীচৌদিকারি শ্রীযুত মীর আব্দুলা ফৌজদার মহাসয়ানাধিসাসনিক বাজুবনভাগ চম্বরকাস্তর্গত জে যে বে মণ্ডল পাঠকস্য শ্রীরামজীবন চতুর্ব্বিদঃ সকাশাত সদ্ধিবদ কাম্যপনান গৃহীত্বা ৺২ পরগণান্তর্গত এখান নিবাসী শ্রীজীবন দেবেন নিজপুত্রী শ্রীমানাই নাম্নী স্বেচ্ছয়া বিক্রীতেতি অস্য প্রাপি ২ একটী অঙ্কমাল ২॥ দুই কাহণ সাড়ে ইতি সন ১১০৫ সাল তেরিখ ৩ বৈশাখ

সাক্ষী শ্রীকৌশল্যা দাস্যা শ্রীজীবন দেবসামত্র" শ্রীমানাই দাস্যা স্বত" উভয়াসম্মতা শ্রীবসুদেব শর্ম্মণা লেখিত" সাক্ষী শ্রীমাধবরাম বিষ্ণালঙ্কার।"

[৫]

"শ্রীরাম

শ্রীমহম্মদ সাহ ৩

সিদ্ধিরস্তু। পরম ভট্টারকেত্যাদি রাজাবলী পূর্ব্বক গত লক্ষণসেন দেবীয় বিংশত্যধিক ষট্শতে লিখ্যমানে যাত্রাব্দেনাপি ৬২০ শকঃ পুনশ্চরম চট্টরকচ্ছেপতি গজপতি নরপ তি রাজত্রয়াধিপতি মহাস্বরত্রাণ শ্রীশ্রীশ্রী * পালিতে দরনিমগ্নে তৎপ্রবিষ্ট দু স্বই পুরাবস্থিত (১) শ্রীশ্রীমৎ ফকরধ্বজ খান সমুদাসিত মহারাজ শ্রীশ্রীমহা দব সিংহ দেব পালিতায়াং মিথিলায়াং কটিতর্জা (২) স্বর্গত সৌরাষ্ট্র গ্রামবাসী সো দর পুর সং শ্রীকমল নয়ন শর্ম্মা জ্যোতিষিৎ পূজ্যকীর্ত্তার্থং শ্রধনং প্রযুক্তে ধনপ্রাহকো পোহৎ শকল্যাং সৌরাষ্ট্র গ্রামবাসী স্বয়মেব দুর্জীবান পরাক্রীতাসন্ত স্বধাকে নাপি পরায়া বাসেনাঙ্গীয়েন নানা মধ্যস্থ কৃত রাজতীঃ সার্দ্ধৈকাদশ মুদ্রা" স্ব

(১) পাটনা　　(২) পরগনা

ন্য যাদাম্মাশ্বিন্ ধনিনি স্বয়মেব ভুক্কী দাসত্বাত্মানং বিক্রীতবান্
আমাত্ম্য জাতীয়ং গৌর বর্ণং তাকিত দশবর্ষ বয়স্কং তুলিয়া নামানং স্বয়মা
ত্মানং বিক্রীতবান যত্র বিক্রীত প্রাপ্তী ১ মূল্য মুদ্রা ১১। যদি কাপি প্রপলায্য গচ্ছ
তি তদা রাজসিংহাসন তলাদপ্যানীয় দাস কর্ম্মনি নিয়োজনীয় ইতি অস্যার্থে
সাক্ষিণঃ সকরাঢ়ী সং শ্রীশতজীব শর্ম্ম বলিয়ান সং শ্রীগণপতি মিশ্র সকরাঢ়ী
সং শ্রীবাসুদেব ঝা বভনিঝামনঃ শ্রীবান্ধব ঝা গঙ্গোলী সং শ্রীকৃপারাম
ঝা শতমদা সং শ্রীরামজীব শর্ম্ম ফনদহ সং মহোপাধ্যায় শ্রীরুচিপতি মিশ্র ৫
পী যাদ সং শ্রীভীষণ শর্ম্ম বুধবাল সং শ্রীপোনন শর্ম্মানঃ সৌবাষ্ট্র বাসিনঃ
লিপিত্ত মিদমুভয়ানুমত্যা সাক্ষিকাদশাত্মকী মাদায় সকরাঢ়ী সং শ্রীগাবা
পতি শর্ম্মণেতি শিবঃ চৈত্রাসিত ৩ কুজে শাকে ১৬৭১ সন ১১৫৬ সাল।
সঙ্গী ভুক্কী অসমাজক সাড়ে এগার কপেয়া নগদ বিকজনক সঙ্গী
পবানীবরিক বর্ষ মধ্যে পছাণ তজেলা হবে নিলাকবাঁধ বেইত্ত্বন

জীবন

শ্রীসচ্চিদানন্দ সান্যাল

জীবন একটা দীর্ঘশ্বাস ; তা'র মাঝে
কত যে গভীর ব্যথা অহরহঃ বাজে
গণনা কে করে তা'রে ? শুধু কল্পনার
ছায়ালোকে নদী বহে মরুভূ মাঝার।

অতীতে ও ভবিষ্যতে পরম যতনে
দূরে রাখ ঠেলি ; অশ্রু আসিলে নয়নে,
মুছি' ক্ষিপ্রকরে অলক্ষিতে, শুষ্ক হাসি
আনো ম্লান ওষ্ঠাধরে ; ক্ষুধা সর্ব্বগ্রাসী
পীড়িছে অন্তর যবে, তৃপ্তি-অভিনয়ে
ভুলাও অপরে নিত্য মিথ্যা পরিচয়ে
আবরিয়া চিরন্তন দৈন্য অন্ধকার,
যে ক'দিন আছো, বলো 'সুখের সংসার'
হাসো, নাচো রঙ্গভরে, উচ্চে গাহি' গান
ক'রে যাও এ দীর্ঘনিঃশ্বাস অবসান।

সঙ্ঘবার্ত্তা

বুদ্ধ পূর্ণিমা উৎসব

বিগত রবিবার ১১ই মে ১৯৪১ (২৮শে বৈশাখ ১৩৪৮) শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ ভবনে ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব, অভিসম্বোধি ও মহা-পরিনির্বাণ স্মরণে এক বিরাট উৎসব হইয়া গিয়াছে। শ্রীমৎ ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধ চৈতন্যজীর ঐকান্তিক চেষ্টা, উৎসাহ ও কার্য্যপটুতায় এই বুদ্ধ-উৎসব প্রতিবৎসরই সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে।

প্রভাতে যথাবিধানে ভগবানবুদ্ধ ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষপূজা, আরাত্রিক, স্তবগান, ভজন ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মধ্যাহ্নে ও রাত্রে প্রায় চারিশত ভক্ত নরনারী অন্ন প্রসাদ গ্রহণ করেন।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাননীয় শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দাস, এম-এ, পি-আর-এস, মহাশয়ের নেতৃত্বে এক জনসভা হইয়াছিল। কুমারী অসীমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হয়। তাহার পর ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধ চৈতন্য বৈদিকমন্ত্রে শান্তিপাঠ ও পূজ্যপাদ আচার্য্য স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের একটি বাণী পাঠ করেন। মহাবোধি সোসাইটি হইতে আগত দুইজন সিংহলী বৌদ্ধ ভিক্ষু পালিভাষায় ভগবান বুদ্ধের স্তবগান করেন। তাহার পর স্বামী বেদানন্দ এই উৎসব উপলক্ষে রচিত তাঁহার একটি কবিতা আবৃত্তি এবং শ্রীযুক্ত হরিদাস মুখোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধপাঠ করেন। শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ, রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন, অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্ত চিন্তামণি, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি ভদ্রবৃন্দ ভগবান বুদ্ধের অলোক সামান্য জীবন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিভিন্ন অবদান সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণে জগতের বহুদেশে ও ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে বৌদ্ধধর্ম্মের ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাব ও তাহার ঐতিহাসিক নিদর্শন উল্লেখ করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করেন। রাত্রি দশটার পর সভার কার্য্য শেষ হইয়া যায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি

অবৈতনিক প্রাথমিক ও শিল্প বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী সভা

গত ১৮ই মে সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতির অবৈতনিক প্রাথমিক ও শিল্প বিদ্যালয়ের ষোড়শ বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভা সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

বেদান্ত সমিতির সভাপতি স্বামী চিৎস্বরূপানন্দজীর প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখার্জ্জীর সমর্থনে কলিকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত জে পি আগরওয়ালা মহাশয় এই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন।

সভাক্ষেত্রে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত ভুজেন্দ্রভূষণ বসু, শ্রীযুক্ত এন্ .সি পাল, মঠের সাধুবৃন্দ ও অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রগণ কর্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হইবার পর সমিতির বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বামী সদাত্মানন্দজী বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী পাঠ করেন। তাহাতে স্কুলের ক্রমোন্নতি ও শিক্ষার পারিপাট্য ও পরীক্ষায় পারদর্শিতার ফল জানা যায়। বালকবৃন্দের কণ্ঠ সঙ্গীত, সংস্কৃত স্তোত্র, ইংরাজী কবিতা ও "শিবাজী ও শাহাজীর" অভিনয় প্রভৃতি হইবার পর বিখ্যাত ব্যায়ামক্রীড়া শিক্ষক শ্রীযুত নবীগোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরিচালনায় বালকগণ নানাবিধ ব্যায়াম কৌশল দেখাইয়া সকলকে আনন্দ দান করে। পাটকপাড়া মণীন্দ্র মেমোরিয়াল স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত হরিপদ সেন, বেদান্ত সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় ও বিদ্যাসাগর কলেজের অনৈক ছাত্র হরিদাস মুখার্জ্জী (এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র) প্রভৃতি কয়েকজন বিদ্যালয়ের কার্য্য-প্রণালীর প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় ছাত্রগণকে রৌপ্যপদক ও পুস্তকাদি পুরস্কার বিতরণ করেন। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব, স্বামী বিবেকানন্দজী ও স্বামী অভেদানন্দজীর প্রেরণা ও আশীষ মস্তকে ধারণ করিয়া বিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে ইহা নিশ্চয়ই একটি মস্তবড় বিকাশশীল প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিবে। এই বিদ্যালয়টী এই স্থানের একটী বিশেষ অভাব বিদূরিত করিয়াছে। পবিত্র স্মৃতিপূত, সমুন্নত কর্ম্মরাজির গৌরবে উজ্জ্বল এই বিদ্যালয় নিজের উপরে একটী বিশেষ গুরুভার দায়িত্ব লইয়াছে. তাহা হইতেছে জনগণের অজ্ঞানান্ধকার দূর করা, তাহাদিগকে স্বাবলম্বী করা। যে প্রকারে সুষ্ঠুভাবে ও ঐকান্তিকতার সহিত এই পবিত্র ব্রত উদ্‌যাপিত হইতেছে এই বিদ্যালয়ের ষোলো বৎসরের ইতিহাস সে সফলতার স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই জন্য যত কিছু ধন্যবাদ তাহা এই প্রতিষ্ঠানের উৎসাহী ত্যাগী সংগঠনকারীদের প্রাপ্য। নবযুগের গতিতে যে সমস্ত সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহারা অনেক পরিমাণে তাহার সমাধান করিয়াছেন। বর্ত্তমানের অর্থনৈতিক দুর্গতি ও বেকার সমস্যার যুগে কার্য্যকরী শিক্ষার দিকে বিশেষ জোর দিতে হইতেছে; আমাদের ছেলেরা যেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে বাহির হইয়াই নিজেদের পছন্দমত জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে, এই উদ্দেশ্য লইয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি ১৯২৫ সনে এই অবৈতনিক বিদ্যালয় ও কার্য্যকরী শিল্প-শিক্ষায়তন স্থাপন করিয়াছেন। এই বিদ্যালয় সাধারণ শিক্ষা ছাড়া কাঠের কাজ, দর্জ্জির কাজ প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া থাকে। এই বিদ্যালয়ের আরো একটী বিশিষ্ট দিক এই যে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীবৃন্দ শিক্ষাদানে ও গ্রহণোন্মুখ বহু ছেলেদের

জীবনকে সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিতেছেন। তিনি বলেন, ভাগ্যবান তাহারা, ধন্যবাদের পাত্র তাহারা, জ্ঞানের প্রদীপ যাহারা দীপ্যমান রাখিয়াছেন। তিনি সকলকে ধন্যবাদ দান করেন এবং প্রার্থনা করেন যেন এই বিদ্যালয়ের দীপশিখা চিরকাল উজ্জ্বল থাকে।

উপসংহারে তিনি সর্ব্বসাধারণকে এই প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থাদি সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন। স্কুল গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ও বিদ্যালয়ের অন্যান্য অভাব মোচনের জন্য তিনি নিজেও সাহায্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

কয়েকজন বালকের আবৃত্তি, সঙ্গীত ও ব্যায়াম প্রদর্শনীতে প্রীত হইয়া শ্রীযুত ভূতনাথ মুখার্জ্জী, শ্রীযুত ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুত বিমলকুমার বসু রৌপ্য পদক প্রদান করেন এবং শ্রীযুত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, 'মাসপয়লা-সম্পাদক' শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত হরিহর মজুমদার ও ভূপর্য্যটক শ্রীযুত রমানাথ বিশ্বাস পুস্তকাদি প্রদান করেন। ছাত্রগণের জলযোগাদির জন্য সভাপতি মহোদয় ২৫৲ টাকা স্কুল কর্ত্তৃপক্ষকে প্রদান করেন।

নড়াইলের জমিদার শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় সভাপতি মহোদয়কে ও বিদ্যালয়ের উন্নতিকামী সর্ব্বসাধারণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবার পর রাত্রি ১০ ঘটিকায় সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি অবৈতনিক বিদ্যালয়ের ১৯৪০ সনের কার্য্যবিবরণী

মাননীয় সভাপতি মহোদয়, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

পরমপিতা পরমেশ্বরের অশেষ করুণায় গত জানুয়ারী মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি অবৈতনিক বিদ্যালয়ের সপ্তদশ বর্ষ আরম্ভ হোয়েছে। ইহার স্থায়িত্বের জন্য যাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা, শুভেচ্ছা ও সাহায্য আমরা পেয়েছি তাদের সকলকে এই শুভমুহূর্ত্তে আমাদের আন্তরিক অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শ্রীভগবানের কৃপায় ও অকৃত্রিম বন্ধুবান্ধবের সহায়তায় আশা করি, এ বিদ্যালয় দিন দিন আরও উন্নতির পথে অগ্রসর হবে এবং শ্রীশ্রীস্বামীজী মহারাজের স্মৃতিবাহী হ'য়ে একটী মহত্তর চিরকালীন প্রতিষ্ঠান হোয়ে দাঁড়াবে।

সমিতির এই বিদ্যালয়ের প্রারম্ভের মূলে ছিল, মানবহিতৈষী মহাজ্ঞানী অভেদানন্দ স্বামিজী মহারাজের প্রেরণা। সে আজ ১৯২৪ সালের কথা, যখন তাঁহারই উপদেশ ও উৎসাহে কয়েকজন শিক্ষিত যুবক এই কলিকাতা সহরে এমন একটী বিদ্যালয় স্থাপনে বদ্ধপরিকর হন, যেখানে বিনা বেতনে কুটির-শিল্প ও লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া হবে সর্ব্বসাধারণকে, বিশেষতঃ দারিদ্র্য প্রপীড়িত গৃহস্থের সন্তানগণকে। আর ঐ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে বালকগণ নৈতিক উন্নতি সাধনে মনোযোগী হয়, শৈশবে যাহাতে তাহাদের চিত্তে

যথার্থ মানবোচিত গুণের বীজ অঙ্কুরিত ও উন্মেষিত হয়, তাহার দিকে থাকবে বিশেষ লক্ষ্য।

উল্লিখিত আশা ও আকাঙ্ক্ষা কার্য্যকরী করবার মানসে স্বদেশপ্রাণ স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি শ্রীমৎ স্বামিজী মহারাজের শুভাশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করে ১১নং উডেন হস্পিটাল রোডে একটী ভাড়াটিয়া প্রকোষ্ঠে বিদ্যালয়ের কার্য্য সুরু করেন। ভদ্রবংশীয় গৃহস্থগণের যাহারা নিজেদের অভাব অভিযোগ প্রকাশ কর্ত্তে সর্ব্বদাই সঙ্কোচ বোধ করে থাকেন, কেবল এমনতর দুরবস্থাগ্রস্ত গৃহস্থের সন্তানগণ ঐ বিদ্যালয়ে স্থান পেয়েছিল। তথাপি ছয় মাস না যেতেই দেখা গেল আর একজনকেও ভর্ত্তি করবার মত স্থান সেখানে নাই।

বেদান্ত সমিতির অনুকূলতায় আলোচ্য বর্ষে বোধ হয় পূর্ব্বাপেক্ষা ছয় গুণ জায়গা স্কুলের কাজে ব্যবহার করতে পাই। কিন্তু ছাত্রের সংখ্যা হিসাবে এ জায়গাও যথেষ্ট নয়—উপযুক্ত গৃহ নাই বলিয়া। বর্ত্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা হবে ৯৯ জন, ও শিল্প বিদ্যালয়ের ৫৬ জন। এই দেড় শতাধিক ছাত্রের মধ্যে প্রায় সকলেরই আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। মাত্র কয়েক জন মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান এখানকার ছাত্ররূপে আছে। এদের অভিভাবকগণের দৃঢ় ধারণা—কোমলমতি বালকগণের নীতিশিক্ষায় ও চরিত্রগঠনে এখানে যেরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়, এ অঞ্চলের কোন স্কুলে সেরূপ হয় না।

এক্ষণে আলোচ্য বর্ষে বিদ্যালয়ে কি কি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, সংক্ষেপে তাহার একটি বিবরণ এখানে দিচ্ছি। চারজন শিক্ষক প্রাথমিক বিভাগে—শিশুশ্রেণী হইতে ৪র্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত যথারীতি শিক্ষা দানে ব্রতী ছিলেন। তিনজন শিক্ষকের অধীনে শিল্প-বিভাগে যে সব কুটির শিল্প শিক্ষা দিয়া বেকার যুবকগণকে উপার্জ্জনক্ষম করা হয়েছে, তন্মধ্যে সূত্রধরের কাজ ও দর্জ্জির কাজ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাথমিক বিভাগের ছাত্র-গণের শারিরীক উৎকর্ষ সাধনের জন্য এ বৎসর বিভিন্ন শিশু ক্রীড়ার এবং নির্ম্মল আনন্দ দানের জন্য সঙ্গীত শিক্ষার কিছু কিছু বন্দোবস্ত ছিল। এতৎসঙ্গে নৈতিক চরিত্রগঠন, বাল্যাবধি মনে ভগবৎ প্রেম ও জনসেবার প্রতি আগ্রহ জন্মাবার জন্য মাঝে মাঝে ছাত্রদের ক'রে বরেণ্য মহাপুরুষগণের পুণ্য জীবনী আলোচনা কখন বা ছায়া চিত্র যোগে বিবিধ বিষয়ে বক্তৃতা করা হয়েছে। উপযুক্ত স্কুলগৃহের অভাবে ও টাকা পয়সার অস্বচ্ছলতার জন্য সকল শিক্ষক মহাশয়ের এ বৎসর শিক্ষাদান ব্যাপারে বহু বাধা বিপত্তি উপস্থিত হয়। কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই উৎসাহী ও মহাপ্রাণ ব্যক্তি। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও যত্ন ছিল বলেই এ বৎসর বার্ষিক পরীক্ষায় প্রাথমিক বিভাগে শতকরা ৮০ জন, শিল্প বিভাগে শতকরা ৩০ জন ও গবর্ণমেণ্ট প্রাথমিক শেষ পরীক্ষায় ৮ জনের মধ্যে ৭ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হ'তে পেরেছে।

নব বর্ষ উপলক্ষে স্থানীয় দেশবন্ধু পার্কে যে ব্যায়াম প্রদর্শনী হয়েছিল, তাহাতে Physical

Instructor শ্রীযুক্ত ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরিচালনায় আমাদের বিদ্যালয়ের ২২ জন ছাত্র-ব্যায়াম পটুতার জন্য প্রশংসালাভ করে। ইতিপূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজী ও অভেদানন্দ স্বামিজীর জন্মোৎসবে যে ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়, সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ব্যানার্জ্জী মহাশয়ের পরিচালনায় সেখানে স্বরলিপি গান গেয়ে ৭ জন ছাত্র শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেছে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও ব্রহ্মচারী অমল চৈতন্য প্রমুখ শিক্ষকগণের নেতৃত্বে বালকগণ মুসলমানের সঙ্গে সরস্বতী পূজা উৎসব সুসম্পন্ন করেছে। এ উপলক্ষে প্রায় চারশত ভক্তজনের সমাগম হয়েছিল। উৎসব দিবসের সায়াহ্নে শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র দাসের নেতৃত্বে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ গুহ ঠাকুরতার প্রিয় শিষ্যগণ, নিজেদের নানা ব্যায়াম কৌশল দেখিয়ে দর্শকমণ্ডলীকে চমৎকৃত করেন। সত্য বলতে কি, অনুষ্ঠানটি সারা দিন ধরে সমাগত সকলের চিত্তে যেন একটা আনন্দের স্রোত এনে দিয়েছিল

এইবার এই বিদ্যালয়ের ও একটী বিশেষ অভাব অনটনের বিষয় বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। প্রধান অভাব হ'ল শিক্ষাদানোপযোগী স্কুলগৃহের। উপযুক্ত গৃহ না থাকায় এবার ২০।২৫জন মেধাবী দরিদ্র ছাত্র ভর্ত্তি হতে পায় নি। ঘরের জন্য এতটা অভাব ১৩৩৯ সাল পর্যন্ত আমাদের ছিল না। কেন না তখন স্কুলের জন্য ছিল উঁচু দোতালা টিনের ঘর। দুঃখের কথা ৪০ সালের ফেব্রুয়ারীতে। কোন দৈবচক্রে কে জানে—ঐ মাসে কোন এক সন্ধ্যারাত্রে স্কুলবাড়ীর দোতালার দরজার সমস্ত ঘরগুলি আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। সে দৃশ্য স্মৃতিপটে এলে এখনও শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। সে শোক ঐ ঘটনার পর থেকে এ পর্য্যন্ত কোন সুযোগ-সুবিধা আসেনি নূতন কোন ঘর তোলবার। তাই পুরাতন ও আধপোড়া একচালা টিনের ঘরে কোন-প্রকারে স্কুলের কাজ চালিয়ে আসা হচ্ছে। গ্রীষ্মকালে ঐরূপ ঘরে শতাধিক শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করা কিরূপ কষ্টকর তা' সহজেই অনুমেয়। বস্তুতঃ কাজের সময় পুরাতন টিনের গুঁড়া ময়লা মাথার উপর পড়ে সকলকে কতনা ব্যতিব্যস্ত করছে!

আবার বর্ষার সময় টিনের নানা জায়গা থেকে ঘরের মধ্যে বৃষ্টির জল পড়ে পড়াশোনার বিশেষ বিঘ্ন ঘটায়। আশা করি স্থানীয় দানশীল মহানুভব ব্যক্তিগণ বিদ্যালয়ের এই দুঃসময়ে উদারতা ও তৎপরতার সহিত অগ্রসর হয়ে উক্ত বিশেষ অভাবটী দূর করে, তাঁদের অর্থের সদ্ব্যবহার করবেন ও আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন।

আরও কয়েকটী অভাবের বিষয়ও এখানে উল্লেখযোগ্য যথা :—

১। শিল্প বিভাগের জন্য একটি সীবন কল ও ১টী টেবিল।

২। লাইব্রেরীর জন্য একটী আলমারী ও ১০০ শত বই।

৩। বয়ন বিদ্যা শেখাবার জন্য ২টী তাঁত।

৪। প্রাথমিক বিভাগের জন্য ৬টী বেঞ্চ ও ৩টী চেয়ার।

যিনি যে কাজের জন্য যাহা দান করবেন সেই কাজের নামোল্লেখ করে তাহা সম্পাদক বা অধ্যক্ষের নিকট পাঠাবেন। সর্ববিধ সাহায্যদান অতি সাদরে গৃহীত হবে ও পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হবে। আমার মনে হয় স্কুল সম্বন্ধে মোটামুটি সব কথা আপনাদের কাছে বলা হ'ল। উপসংহারে এই বিদ্যালয়ের উন্নতিকামী সকল বন্ধু বান্ধবকে পুনরায় আমাদের গভীর প্রীতি ও অন্তরের অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে বিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণ পাঠ শেষ করা গেল।*

হরি ওঁ তৎসৎ



*১৮।৫।৪১ তারিখে বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী সভায় অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী সদাত্মানন্দজী কর্তৃক পঠিত।

The Ideal of Education

(A speech delivered by Swami Abhedananda at the "Bihar Young Men's Institute," Patna, on January 27, 1925.)

Mr. Chairman and Brethren,

It is with great pleasure that I stand before you this evening to speak on the Ideal of Education as announced by our Chairman. Before going into the subject of this evening, allow me to make a few introductory remarks about my activities in Europe and America. For the last twenty five years I was preaching India before the American public, as also in England and other parts of Europe. My object was to defend India and her culture against the unjust criticisms of the Christian missionaries and other sectarians, who wanted to convert Indians into Christianity and to raise funds for that purpose. I had the honour and privilege of representing India or rather the Indian culture, in various universities of the United States and Canada, where I met some of the greatest professors and educators of the West. I also had the privilege of talking with Professor Max Muller in Sanskrit, and of meeting Professor Paul Deussen who translated sixty of our Upanishads into German, and who was the author of "System des Vedanta" and the "Philosophy of the Upanishads." Professor Deussen once came to India and delivered a lecture in Sanskrit in Bombay. He spoke in Sanskrit to the ekka-drivers who could not understand him. The same venerable Professor Paul Deussen of Kiel University was in London when I was there, and to him I was introduced by my illustrious predecessor the world-renowned Swami Vivekananda. Swami Vivekananda called me over to London in 1896, and after giving me the charge of his work in London, he returned to India—his motherland. I stayed on and carried on the work which he had entrusted to me. Then I was asked to go over to America and make my headquarters in New York. Our Chairman has already said that the Vedanta Society of New York was started by Swami Vivekananda in 1894. This Society was in its infancy when I arrived at New York in 1897. It had only a handful of members at first, but after a hard struggle I succeeded in making it a well-established society. When I landed at New York I was penniless, and during my twenty-five years' stay in the United States I never drew a pice from India. I was entertained by the

American people, who gave me food, clothes, and a house, and took care of me. They also gave me an Ashrama measuring about 320 acres of land in a farm, and a home in the city of New York worth nearly two lakhs of rupees. Now there are four Swamis of our Mission who are working in different centres in the United States of America.

The subject of this evening makes me think of the past glory of India —our holy motherland. The civilization and culture of ancient India were grand and glorious. India has contributed her culture to the Western nations in various branches of knowledge. The world owes its first lessons in Geometry and Algebra (Vijaganita) to India The 47th proposition of Euclid —A square on the hypotenuse of a rectangular triangle is equal to the sum of the squares on the other two sides—was ascribed to Pythagoras but it was known in India centuries before Pythagoras was born. It is mentioned in the Shulvasutras of the Vedic age. Algebra was introduced into Europe by the Arabs who learnt it in India, and Leonardo da Pisa introduced it into Italy and several countries of Europe in the thirteenth century. In fact, Geometry, Algebra, Trigonometry, all these were first taught in India. The Arabs learnt these from India and carried them into the West. The world owes decimal notation to India. It was unknown to the Greeks and Romans; and Arithmetic as a practical science would have been impossible without decimal notation. The world owes its first lessons in Medicine to India. Although there is a general belief that Europe derived her knowledge of medicine from Greece, still from researches we have gathered that Hippocrates, the father of modern medicine in Europe, who lived about 400 B. C., borrowed his Materia Medica from India. In Chemistry, as also in Surgery, we know from the study of the Sushruta, the Hindus excelled other nations We know from the accounts that have been left to us by Megasthenes, the Greek ambassador, who lived in the court of Chandragupta in the fourth century before Christ, that Alexander the Great used to keep Hindu physicians in his camp because he preferred them to Greek physicians. Nearchus and Arrian spoke highly of the wonderful healing powers of the Hindu physicians.

In various branches of science, philosophy, art, and music, the Hindus were the first teachers. For instance, the Greeks had five notes of music at first, but the Hindus developed seven notes of music and had three octaves long before the Greeks had them. During the Vedic period, Sama Veda used to be sung and chanted with those notes. Wagner's music with its special 'motifs' was indebted to Indian music. Schopenhauer, the great German philosopher, had a

conversation with Wagner on this subject, from which we learn that the great German musician Wagner studied the Latin translation of the Sanskrit science of music, and that he learnt from the Sanskrit science of music those principal 'motifs,' which have made his music so original and so wonderful. In other branches of knowledge also India developed her culture to a great extent, for instance, in Astronomy, and in developing the theory of evolution of the world out of Prakriti, the eternal cosmic energy as described in the Sankhya system of philosophy. All these different branches of study were highly developed in India centuries before Christ, and even today the European scholars admit this fact. I can quote from Sir Monier Monier-Williams, who in his book entitled "Brahmanism and Hinduism" says that "the Hindus were Spinozaites more than 2,000 years before the existence of Spinoza; and Darwinians many centuries before Darwin; and Evolutionists many centuries before the doctrine of Evolution had been accepted by the Scientists of our time, and before any word like Evolution existed in any language of the world." His remarks were correct, because we learn from the philosophy of Sankhya that the whole world was not created by an extra-cosmic personal God, who is sitting on his throne above the clouds, but that there was one eternal cosmic energy which was called by the name of Prakriti (the same as the Latin 'procreatrix'), the creative energy of the universe. This energy is indestructible and uncreatable, yet changeable. It is one and eternal. Today Western science admits that there is only one eternal cosmic energy the sum total of which neither increases nor decreases. This fact was established by Kapila, the founder of the Sankhya system of philosophy in the seventh century before Christ. We had our Newton in Aryabhatta who lived about A. D 476, and who declared that the earth was moving upon its own axis round the sun. Long before the Copernican system of Astronomy was known to the Europeans, this Aryabhatta's system was taught in India, and it was Aryabhatta who first declared that the law of gravitation existed; he called it 'Madhyakarshana,' i. e. attraction towards the centre. We had our Shakespeare in Kalidasa; we had our philosopher greater than Kant and Hegel in Sankaracharya, greater than Hume and Berkeley in Vashistha; and we had materialistic philosophy in the system of Kanada. The atomic theory of Kanada is a wonder to the Western minds, because in such an early age, i. e., in the pre-Buddhistic period, Kanada proved to the world that this external universe was made up of minute particles of matter—'anu' (atoms) which were indestructible. Again, we find

that these atoms of Kanada were not the final particles of the material world, but particles finer than atoms were discovered by Kapila and he called them 'Tanmatras,' which would be similar to the 'electrons' and 'protons' of modern science The 'electrons' are the force centres of negative electricity and the 'protons' are of positive electricity. Such great advancement was made in different branches of knowledge and science in the pre-Buddhistic age, which lasted between 1500 B. C. and 600 B. C. *

Then in moral and spiritual lines the Hindus were the first teachers in the world. Centuries before the Christian era, nay, long before Moses gave the Ten Commandments to the nomadic tribes of Israel, —in that remote antiquity, when the European nations were eating raw animal flesh, living in caves and forests, tattooing their bodies, wearing animal skins, the civilization of India was in its high glory. The dawn of civilization first broke not upon the horizon of Greece, Europe, or Arabia, but upon the horizon of India. India is not a country of today, but she had the sublime teachings of Vedanta long before the time of Moses, when Krishna sang the Bhagavat Gita in the battle field of Kurukshetra. All those who came in touch with India were benefited. During the Buddhistic period, as we know from the edicts of Asoka, Buddhist preachers were sent out to different parts of the then civilized world, from Siberia to Ceylon, and from China to Egypt. Buddhist monks travelled and preached the gospel of love for all, and the highest ethics of humanitarianism in foreign countries. Those teachings of Buddha were afterwards emphasized in the teachings of Jesus the Christ. Christianity can be traced back to the Hindu ideals in many of its doctrines and dogmas The principal part of Christianity, i.e., Baptism, was not known among the Jews of that time, but it came from the banks of the Ganges as Ernest Renan has said in his "Life of Jesus."

The education of a nation depends upon its ideal of civilization. The Hindu ideal of civilization from pre-historic times was purely moral and spiritual. Consequently, the civilization of ancient India was based, not upon commercial principles of modern times, not upon the selfish ideal of political gain and power over other nations, but upon the eternal spiritual laws which govern our soul. Intellectual culture was not regarded as the highest ideal, but spiritual realization of the relation that exists between the individual soul and the Universal Spirit was the principal aim of education. "Education," as Herbert Spencer has

* See "India and Her People" by Swami Abhedananda.

said, "is the training for completeness of life." Education will bring out the perfection of the man which is already latent in his soul. Education does not mean that a lot of ideas or informations will be poured into the brain of the individual and they will run riot ; but it means the gradual growth and development of the soul from its infancy to maturity. Education should be based upon the spiritual ideal that each individual soul is potentially divine, that it possesses infinite potentiality and infinite possibilty, that knowledge cannot come from outside into inside, but that all knowledge evolves from inside out. No one can teach you, but you teach yourself. Teachers only give suggestions. This should be the principle of education. Today in our universities we find just the opposite principle. A student is allowed to study and memorize the notes of his professors and pass the examinations ; and then he comes out as a 'pash kara murkha'—a learned fool. He gets a diploma for his ignorance. That is not the ideal of education. Education does not mean intellectual culture, but it means the development and spiritual unfoldment of the soul in all the various branches of learning.

The ideal of education today, in America, is revolutionizing the ideals of the past ages. Today an infant boy or girl of four or five years of age is allowed to go into the kindergarten school-room where all kinds of toys, music-boxes, pictures for painting and drawing, are kept. The children are allowed to go inside that room and they are asked to choose what they would like, in order to know their natural inclinations. If any one is attracted to the music-box he would excel in music, and, therefore, such training should be given to him as would make him the best musician of the world ; he should not be allowed to go into a college and become a graduate in the literary line, which would mean nothing to him. Someone would be a painter and another would be an athlete. In every branch of learning one must excel. The stereotyped way of getting a degree like B.A. or M.A., and then becoming a clerk is not the ideal of education. By following this method we are ruining our young men.

Education should be according to the natural inclination of the individual soul, with the idea that wisdom cannot be drilled into the brain of the individual, that all the books give mere suggestions, and in reaction we get the knowledge of the book. In order to understand a book, our minds must vibrate or be *en rapport* with the mind of the author. Then we get knowledge by itself, for it is a process of transmission. Knowledge does not come from outside. We will have to raise the vibration of our

minds to the level of the vibration of the mind of the author, and then, like wireless telegraphy the wisdom of the author's mind will be communicated to the student's mind. That is the natural principle of proper education Are we doing that? No. But we had that system in ancient India. The present university system is going to be out of place, because in England the professors are beginning to realize the efficiency of our old Brahmacharya Vidyapitha system. A professor would have a few students around him; he would be their guardian, and he would be of pure character, spotless in his ideals; he would be a moral man; he would not be like a man who gets a large pay and lives an immoral life. Such a man is not going to be the ideal teacher And this method is going to be taken up in Europe and America in future. In that system the student will find an example, and an example is better than precept. One living example will change the whole character of the student, and it will mould his career according to the ideal which is before him Therefore the present system of education is not a perfect one

Again, the ideal of a nation should be the ideal of education. Our minds are running towards the spiritual ideal Why? Because we have learnt all these different branches of science from religion. In Europe religion was against scientific culture Christianity stood against all intellectual development, against all science and all improvements. Think of the miserable condition of Galileo who said that the earth was moving The Roman Church put him into a dungeon and tortured him, asking him to retract his statement But Galileo said: "No, you can torture me today but the earth still moves. I cannot retract it for it is the truth." That truth is an established fact of modern astronomy The warfare between science and religion in Europe was a long-standing one. It has not stopped yet. The fire of Inquisition was kindled, and hundreds were burnt alive at the stake simply because they did not submit their intellect to the dogmas of the Church. Giardano Bruno was burnt alive in the streets of Rome in A. D. 1600 because he was a believer in the one Supreme Spirit whose body was matter and whose mind was the cosmic mind. So, my friends, if religion were powerful in Europe today, there would have been no scientific culture, improvement or discovery; because their religion says of creation in six days out of nothing, while modern science teaches evolution. Religion tells them that the earth was created six thousand years ago before our sun came into existence, but modern Astronomy teaches that the sun was created before the earth; and Geology tells us that our earth is millions of years old, and that the first appearance

of man was about one hundred thousand years ago. How can we reconcile these contradictory statements ? If we accept one we shall have to reject the other. But in our country, my friends, Sanatana Dharma never stood against science or free thought. You may believe in God or you may not ; but so long as you are a moral and spiritual man, you are worshipped and honoured by the masses as the ideal of the nation. Buddha did not believe in a personal God, yet him we regard as an Avatara : Kapila did not believe in a personal God ; in his Sankhya system he says : "Iswara-siddheh" i. e., "There is no proof for the existence of a personal God who is the creator of the universe" Still Kapila was the greatest of all sages

We have hundreds of such cases, because free-thought was the watchword of the Hindus of ancient times. They had no bigotry and no sectarianism ; they did not mean by the Vedas a set of books which must be accepted as true in every letter, but they meant by Veda, 'wisdom' God is the ocean of wisdom, which is eternal and indestructible. There is only one source of wisdom which occasionally reveals itself to mortal minds, and through them the world learns something about the Eternal Truth. Who could have known anything about God if he did not reveal himself to mortal minds ? We know from the life of Mohammed that when he was praying on Mount Heerah, he had a revelation. He was living in a cave in that desert and his heart was longing for a knowledge of the Divine Being, and Truth was revealed to him. Truth is not confined to any particular individual or nation, but it is for everybody. As the sun rises and shines equally upon the heads of all nations, even so does the Sun of Eternal Truth shine and reveal itself among all nations. Whoever will long for such realization will find a way to the attainment of Truth. This conception has made the Hindu mind broad and tolerant. It does not condemn anybody. The Hindu embraces a Mohammedan because Mohammedanism is a path to the realization of Truth. He accepts Christianity because Christ revealed the Universal Truth among the Jews who had sectarian ideals Christ said : "And ye shall know the truth and the truth shall make you free" Our Vedas say the same thing. Where is then the difference ?

The essentials of all religions are one and the same, that is, God-consciousness, self-mastery, self-control and purity. These are the ideals. He is regarded as a civilized man by the Hindus who lives a pure and unselfish life, who is loving, kind and compassionate to all, who conquers avarice by generosity and hatred by love. But a man, who robs others to promote his self-interest, is not a civilized man according to the

Hindu ideal, and I do not believe that he is regarded as a civilized man according to the Mohammedan ideal either. The ideals are the same. A man must not be judged by his outside but by his inner nature, and character. The outward garb, dress, clothes, formality, etiquette, do not amount to anything ; the Lord sees the purity of the heart. "Blessed are the pure in heart : for they shall see God." Purity of heart is the *sine qua non* of God-vision. We must be pure in heart and loving to all, irrespective of caste, creed or nationality. Any education that separates mortals from mortals, that disunites brothers from brothers is not uplifting and should not be the ideal. Therefore, my brethren, I consider that the aim of education should not be mere intellectual culture with commercial ideals, to gain our livelihood in the struggle of competition, but that the ideal of education should be such as will elevate man from his ordinary selfish state into the unselfish universal ideal of God-hood. Anything that will make us kneel down before that grand ideal is uplifting.

To be Continued)



বিশ্ববাণী

তৃতীয় বর্ষ | আষাঢ়, ১৩৪৮ | পঞ্চম সংখ্যা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণে

শ্রীনির্মলকান্ত লাহিড়ী এম. এ. বি, সি, এস

মায়ার কাজলে কালিমা লিপ্ত আঁখি
আননে যাদের অবিশ্বাসের হাসি,
জড় বিজ্ঞানে জড়ায়ে ন্যায়ের ফাঁকি—
মিটাইলা দম্ভ ঠাকুর তাদের আসি।

মূর্খ বলিয়া তাঁহারে করিল ঘৃণা—
জড় প্রতিমায় চেতনা দেখিল যে না
কণ্ঠে যাহার সরস্বতীর বীণা—
বেদ বেদান্ত শিখাবে তাহারে কেবা?

যাহার কৃপায় বাচাল হয়েছে মূকে
যার করুণায় পঙ্গু উতরে গিরি,
সেই ভগবান দেখালে আপন বুকে
ভক্তের তরে কত প্রেম আছে ঘিরি।

এ কলি যুগের হিংসা লোভের যুগে
নর নারায়ণ নিত্য হতেছে বলি
তাই ভগবান শ্রীরাম কৃষ্ণ রূপে
নররূপ ধরি কাঁদিয়া গিয়াছে চলি।

ডাকিয়া গিয়াছে মুগ্ধ মানবে ভোলা
ধর্ম্মের লাগি কেনরে দ্বন্দ্ব প্রীতি
যে মতেই চল যে পথ রয়েছে খোলা
খুঁজিলে তাহারে সে যে লবে কোলে টানি।

খুঁজিতে হবে না দূর দুর্গমে ফিরে
ডাকিতে হবে না হর্ম্ম্য প্রাসাদ পুরে
জড় ও চেতনে রয়েছে যে জন ঘিরে
জীবে হের শিব যাইবে অশিব দূরে।

এ ধরার বুকে পাইনি তো মোরা আসি
ঠাকুর তোমার অমৃত পরশ খানি!
শুনেছি গিয়াছ বিলায়ে অমিয় হাসি
—মোরা তো লভিনি পতিত পাবনী বাণী।

তাই বলে কিগো রহিব ভাগ্যহত?
কেমনে লুকাবে প্রেমের প্রবহ বারি
নররূপ তুমি ধরিলে তারিলে কত?
রেখে গেলে তব নামরূপ দুখ-হারী।

তিব্বতের বৌদ্ধ-সঙ্ঘ

শ্রীঅজিত ঘোষ

[পূর্বপ্রকাশিত 'তিব্বতে বৌদ্ধ-সঙ্ঘের গোড়ার কথা' নিবন্ধের ক্রমানুবৃত্তি]

দীপঙ্কর অতীশের জীবনাবসানের পর খ্রীষ্টীয় ১১শ হইতে ১২শ শতকের মধ্যে তিব্বতের ইতিহাসে এক পরিবর্তন এসে পড়ল। এই সময়ে তিব্বতে অনেক বিহার গড়ে উঠে বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছিল। এর মূলে ছিল কয়েক জন চরমপন্থী রাজনীতিকের অভ্যুদয় ও তাঁদের দ্বিধাহীন কারসাজি। অবশ্য এ কারসাজি তাঁদের দূরদর্শিতার অনুকূল ছিল। একটা জটিল অবস্থার সুযোগ তাঁরা নিতে পেরেছিলেন। তখন কয়েক জন রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে অন্তর্কলহ লেগেই ছিল—শক্তিসঞ্চয় করে কেহই সর্বাগ্রগণ্য হতে পারেন-নি; এছাড়া সাধারণের মধ্যেও কলহপ্রিয়তা ছিল, নানা রকম সংস্কারের তারা বশীকৃত ছিল। সংস্কার ও বিশ্বাসের দিক দিয়ে বিহারগুলির নির্মাণ-ব্যাপারে তিব্বতীয় সাধারণের শ্রদ্ধা ছিল খুব বেশী, কারণ তিব্বতের কঠোর শীতে সেগুলি সাত্ত্বিক যাজক-সম্প্রদায়ের বাসের বিশেষ উপযোগী ছিল। দেশের বৃহত্তম আবাসগৃহরূপে এবং সর্বাধিক আশঙ্কাবর্জিত আশ্রয়রূপে

বেশ মজবুত করে সেগুলি নির্মাণ করা হত। এই বিহারগুলির মধ্যে বৃহত্তম ও সর্বাপেক্ষা মজবুত বিহার ছিল 'সক্যা'-বিহার। কিন্তু সক্যা-বিহারের অধিবাসী সাক্যিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা রীতিমত বৈশিষ্ট্য স্থান পেয়েছিল। এই সাক্যিকেরা ছিলেন রাজবংশীয়, একাধারে তাঁরা রাষ্ট্রপরিচালক ও ধর্মনিয়ামক ছিলেন। তবে সাধারণ সাক্যিকের মত তাঁরা অকৃতদার ছিলেন না, সুতরাং বৈষয়িক-ব্যাপারে তাঁদের উদাসীনতা না থাকাই স্বাভাবিক। এ-সমস্ত কারণে তাঁরা দেশকীয় রাজবংশে পরিণত হন। পূর্ব-এশিয়ার ইতিহাসে সর্বাধিক সঙ্কটপূর্ণ যুগে তাঁরা তিব্বতের কর্ণধার ছিলেন। ইহা চিঙ্গিস্ বা জেঙ্গিস্ খাঁর দিগ্বিজয়াভিযান এবং মোঙ্গোল-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় ও তার পরবর্তী কালের ঘটনা।

বৌদ্ধধর্মের প্রতি চিঙ্গিস্ খাঁর বিশেষ কোন পক্ষপাতিত্ব ছিল কি না জানা যায় না, বা তিনি তিব্বত আক্রমণ করেছিলেন কি না তার কোন প্রমাণ নেই। তবে পরে তিব্বতীয় ধর্ম ও রাষ্ট্রজীবন মোঙ্গোল-রাজশক্তির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল, তার প্রচুর নিদর্শন আছে। খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতকে মোঙ্গোল সম্রাট্ কুবিলাই খাঁ তিব্বতের পূর্বপ্রদেশগুলি নিজের অধীনে আনেন এবং লামা-যাজকতন্ত্রের সাহায্যে মোঙ্গোল-রাজবংশ ও তিব্বতের মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপন করেন। অবশ্য কুবিলাই খাঁর ঠিক পূর্ববর্তী সম্রাটের সময়েই এই সম্পর্কের সূচনা হয়েছিল, কারণ সক্যা বিহারের সক্যা পণ্ডিতকে ১২৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গোল-দরবারে উপস্থিত হতে দেখা যায়। তিনি মোঙ্গোল-সম্রাটকে রোগমুক্ত করেছিলেন। সক্যা পণ্ডিতের তিব্বতীয় নাম 'স স্ক পন্ চেন্'। তিনি ছিলেন এক জন বিশিষ্ট পণ্ডিত ও প্রতিপত্তিশালী লামা। সাধারণ জ্ঞান ও ধর্মনৈতিক প্রজ্ঞা, উভয়তঃই তিনি বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন, কয়েকটী বিদেশী ভাষাও তিনি জানতেন।

সক্য পণ্ডিতের অব্যবহিত পরবর্তী লামা 'পগ্ সপ'। এছাড়া পগ্ সপ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। এই পগ্ সপ এর সময়েই কুবিলাই খাঁ তিব্বতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন। পগ্ সপ-এর মোঙ্গোল অপভ্রংশ নাম 'বগ্ প'। 'পগ্ সপ' শব্দ সংস্কৃত 'আর্য' শব্দের সমার্থক। তিব্বতের একটা জনপ্রবাদে শোনা যায়, পগ্ সপ-এর জন্মের আগে তাঁর পিতাকে দেবতা গণেশ সমগ্র তিব্বতদেশ দেখিয়ে বলেছিলেন যে, তাঁর যে পুত্র জন্মগ্রহণ করবে এই তিব্বতদেশ তার রাজ্য হবে। যাই হোক, লামা হবার পর পগ্ সপ সমগ্র তিব্বতে ও তিব্বতের বাহিরে যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন।

কুবিলাই খাঁ মধ্য-এশিয়ার অপরিণত একেশ্বরবাদে বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না। মোঙ্গোলদিগকে তিনি একটা নির্দিষ্ট ধর্মের মধ্যে আনতে চেয়েছিলেন এবং তাদের আচার-ব্যবহার ও সাহিত্যের সংস্কার চেয়েছিলেন। এর জন্য তিনি তিব্বতীয় লামার সাহায্য গ্রহণ করেন। লামার সাহায্য গ্রহণ করবার একটা প্রধান কারণ এই ছিল যে, ইতঃপূর্বেই মোঙ্গোল-দরবারে লামার প্রভাব অল্পবিস্তর এসে পড়েছিল। নিজ রাজ্যে তিনি সক্যা-

বিহারের তুলানীগুন লামা পগ্‌স্‌পককে আমন্ত্রণ করলেন এবং ১২৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর কাছে অভিষেক-ক্রিয়াদ্বারা লামা-প্রভাবিত বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হলেন। পগ্‌স্‌প চীনদেশে মোঙ্গোল-দরবারে উচ্চ আসন লাভ করলেন, সেখানে তিনি অপরিমেয় প্রভাব-প্রতিপত্তি পেলেন। সুতরাং দেখা গেল, একাধারে তিনি লামা, মোঙ্গোল-দরবারের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ধর্মগুরু এবং মোঙ্গোল-সম্রাটের অধীন তিব্বত-রাষ্ট্রের কর্ণধার। মোঙ্গোল-দরবারে তিনি 'খুও-শিহ' উপাধি লাভ করেন এবং এই নামেই তিনি উত্তর-চীনে সমধিক প্রসিদ্ধ হন। 'খুও-শিহ' অর্থে জাতির শিক্ষাগুরু এবং বৌদ্ধ, লামা প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের প্রধানতম ব্যক্তি। খুবিলইকে তিনি 'হেবজ্র বসিতা'র গুহ্যতত্ত্বের শিক্ষা দেন। 'হেরুক' ও 'হেবজ্র'কে বোধিসত্ত্বের অন্যতম একই রূপ বলে ধরা হয়। 'বসিতা' অর্থে দারবীর বীজ। সুতরাং হেবজ্র ও হেরুকের মন্ত্রই তিনি খুবিলইকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। অনেকের মতে, হেবজ্রে শৈব-সংস্কৃতির যথেষ্ট প্রভাব আছে, তাই যদি হয়, তা হলে পগ্‌স্‌প তখন শৈব সংস্কৃতিকে চীনে টেনে এনেছিলেন একথা মনে করা যেতে পারে। পগ্‌স্‌পকে খুবিলই খাঁ মোঙ্গোলদের জন্য যে শুধু একটী নির্দিষ্ট ধর্ম প্রচলনের ভার দিয়েছিলেন তা নয়, একটী লিপি উদ্ভাবন করবারও ভার দিয়েছিলেন। ফলে, তিব্বতীয় লিপির সাহায্য নিয়ে পগ্‌স্‌প মোঙ্গোলদের জন্য একটী লিপির উদ্ভাবন করেন। কিন্তু ঐ লিপি মোঙ্গোলদের ব্যবহারের পক্ষে সহজসাধ্য না হয়ে জটিলতার সৃষ্টি করে এবং লেখার পক্ষে তা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। তাতে লেখবার সময় অক্ষরগুলি উপর হতে নীচের দিকে লিখতে হত এবং সেগুলি ছিল প্রায় চতুষ্কোণ। এই রকম নানা অসুবিধার জন্য এই লিপি বেশী দিন চলতে পারেনি। পগ্‌স্‌প-এর মৃত্যুর পর তা অব্যবহার্য হয়ে পড়ে। অতঃপর উইগুর লিপি তার অভাব পূরণ করে। ইতঃপূর্বেই মোঙ্গোলদের জন্য শকা পণ্ডিত ঐ লিপির প্রচলন করেছিলেন, পগ্‌স্‌প-এর উত্তরাধিকারী লামা চোস্‌-কী-হোড়-জের তাকে সংস্কৃত করে মোঙ্গোলদের উপযোগী করে তোলেন। পরে বৌদ্ধরা তাঁদের ধর্মগ্রন্থ রচনায় এই লিপি ব্যবহার করতেন। পগ্‌স্‌প-এর উপর আর একটী বিশেষ কাযভার দেওয়া হয়েছিল। সেটী ত্রিপিটকের একটী চীনা সংস্করণ রচনার ব্যবস্থা করা। সংস্কৃত, চীনা, তিব্বতীয় ও উইগুর ভাষায় অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের দ্বারা পগ্‌স্‌প ত্রিপিটকের এই নূতন সংস্করণটী সঙ্কলন করেছিলেন।

অনিকো নামে এক জন লামাকে খুবিলই মোঙ্গোল-রাজ্যে চারু-শিল্পকলা প্রবর্তনের ভার দিয়েছিলেন। অনিকো চিত্রকলা ও ভাস্কর-শিল্পে খুব দক্ষ ছিলেন। তিনি তাঁর চীনা শিষ্য লিউ য়ুয়নের সহযোগিতায় সর্বতোভাবে তিব্বতীয় শিল্পকলার প্রভাব নিয়ে পিকিঙে নানাবিধ শিল্পের প্রবর্তন করেন। বিশিষ্ট ছাঁচে বুদ্ধমূর্তির প্রবর্তন হল, এছাড়া লৌহ ও স্বর্ণের আলঙ্কারিক শিল্পও প্রচলন করা হল। তিব্বত হতে এই শিল্পকলাগুলি মোঙ্গোলরাজ্যে এলেও চীনারা কিন্তু মনে করত যে, এ-শিল্প ভারতেরই জিনিস—তিব্বতের

মধ্য দিয়ে সেগুলিকে তথাকথিত মধ্য-এশিয়ায় আনা হয়েছে। একথা সত্য যে, তিব্বতের শিল্প নেপাল হতে এসেছিল এবং নেপাল তার শিল্প নিয়েছিল বাঙলা থেকে। অবশ্য তিব্বতের ছোট ছোট চিত্র হতে তার বেশ প্রমাণও পাওয়া যায়। তিব্বতীয় লামাদের 'চিত্রগুলির সঙ্গে নেপালের চিত্রকলার বেশ একটা সামঞ্জস্য আছে। তিব্বতের চিত্রে ও চিত্রিত নিশানগুলিতে যদি চিত্রিত মানুষের চোখগুলি লক্ষ্য করা যায়, তা হলে তাতে বাঙলার বৈশিষ্ট্যের একটা ছাপ দেখা যাবে। বাঙলার এই বৈশিষ্ট্য পরবর্তী যুগে কালীঘাটের পটুয়ারা চরমভাবে রূপ দিয়েছেন।

খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত মোঙ্গোল-দরবারে তিব্বতীয় লামাদের প্রভাব ছিল। য়ুয়ন্ বংশের রাজত্বকালই ছিল মোঙ্গোল বা তথাকথিত চীনদেশে লামাদের একচ্ছত্র প্রতিষ্ঠাকাল। ঐতিহাসিকদের মতে, ১৩শ শতকে চীনে য়ুয়ন্-বংশের পৃষ্ঠপোষকতায় লামাদের প্রতিষ্ঠা হলেও ১৪শ শতকের পূর্বে তাঁদের ধর্মানুশাসন প্রসার লাভ করতে পারে নি। কিন্তু এই ১৪শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই য়ুয়ন-বংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের প্রভাবও প্রতিহত হয়। অনেক ঐতিহাসিক স্বীকার করেছেন যে, তিব্বতের প্রভাবে যে মোঙ্গোলীয় বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুদয় হয়েছিল তা পুরাপুরি রাজনৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। এজন্য তা বেশী দিন অটুট থাকতে পারে নি। যত দিন য়ুয়ন্-বংশ রাজত্ব করেছিলেন তত দিন লামাদের প্রভাব মোঙ্গোল-রাজ্যে অপ্রতিহত ছিল, কিন্তু য়ুয়েন্ বংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গে লামা-প্রভাবেরও পতন হয়। ১১৭০ হতে ১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সক্য-বিহারের লামারাই এক রকম ধর্মনিয়ন্তা ও রাষ্ট্রব্যাপারের পরিচালক ছিলেন। এমন ক্ষমতাও তাঁরা লাভ করেছিলেন যাতে তাঁরা মোঙ্গোলরাজ্যে স্বেচ্ছ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারতেন। ১৩২০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা দিক্ষুঙে তাঁদের একটী প্রতিদ্বন্দ্বী বিহারকে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। যে সমস্ত লামা মোঙ্গোল দরবারে বেশ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সক্য পণ্ডিত, ফগ্-স্প ও চোস্ কী ওড্-জের ছাড়াও আর এক জন বেশ নাম করেছিলেন, তিনি বুন্-স্তোন দো-ছে-পাগ্রু। কালচক্রতন্ত্রে দো-ছে-পাদের বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল। ঐতিহাসিক বু স্তোন তাঁর শিষ্য। এই বু স্তোনই তিব্বতীয় ধর্মশাস্ত্র সংগ্রথিত করেছিলেন। লামাদের ক্ষমতা বাড়তে আরও কয়েকটী বিহারের অভ্যুদয় সে যুগে হয়েছিল। তন্মধ্যে ফগ্-মোডু নামক স্থানের বিহার ছিল সর্বাগ্রগণ্য। বহু কাল যুদ্ধ করে এই বিহারের কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন এবং তাঁরা একটী রাজবংশও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই বংশ কর্তৃক ১৭শ শতক পর্যন্ত তিব্বতের কিয়দংশ শাসিত হয়েছিল।

১৩৬৮ খ্রীষ্টাব্দে য়ুয়ন্-বংশের পতন হয় এবং মোঙ্গোল-সাম্রাজ্য মিঙ-বংশের অধিকারে আসে। মিঙ-রাজগণ সম্পূর্ণরূপে বৌদ্ধধর্মকে স্বীকার করেন-নি, বা য়ুয়ন-রাজদের মত কেবল বৌদ্ধধর্মেই তাঁদের একমাত্র বিশ্বাস ছিল না এবং লামাদের প্রতিও তাঁদের বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল না। তবে, তিব্বতের সঙ্গে তাঁরা সদ্ভাব রাখতে চেয়েছিলেন। এজন্য তাঁরা

তিব্বতকে স্বাধীন মিত্ররাজ্যে পরিণত করলেন। ফগ্‌-মোড়ুর রাজবংশের ও অপর আটটা বিহারের কর্তৃপক্ষের উপর তাঁরা তিব্বত-পরিচালনার ভার দিলেন। ফলে, যে সক্য-বিহার কুবিলাই-এর সময় সর্বপ্রাধান্য পেয়েছিল, ৭০ বৎসর পরে তা অন্যান্য বিহারের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে।

এদিকে তিব্বতীয় লামাদের ইতিহাসে আবার এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হল। এই সময় সোঙ্‌-খ-প লামাতন্ত্রের সংস্কার করে ধর্মসঙ্ঘকে নূতন করে গড়ে তুললেন। মিঙ্‌ রাজত্বের প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে এই ঘটনা ঘটেছিল। সোঙ্‌-খ-পই লামাতন্ত্রের সর্বশেষ সংস্কারক এবং তাঁর রচিত বৌদ্ধসঙ্ঘই এখন বর্তমান। 'সোঙ্‌-খ-প' তাঁর তিব্বতীয় ডাক নাম। তাঁর প্রকৃত তিব্বতীয় নাম -'জে-রিন্‌-পো-চে লো-জাঙ্‌ দ্রগ্‌-স-প' এবং সংস্কৃত নাম - 'আর্যমহারত্ন সুমতিকীর্তি'। তিনি ছিলেন কনসু নামক চীনা প্রদেশের পশ্চিম সীমান্তের আমদো জেলার অন্তর্গত কুম্বুম্‌বিহারের (তিব্বতীয় নাম -'কুং বুম্‌'-বিহার) নিকটস্থ স্থানের অধিবাসী। মাত্র সাত বছর বয়সে কুম্বুম্‌-বিহারে তিনি দীক্ষা নেন। তাঁর জন্ম, বাল্যজীবন ও দীক্ষাকালের ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেক বিস্ময়জনক কাহিনী প্রচলিত আছে। সে কাহিনীগুলি প্রায়ই অসম্ভব ও অবাস্তব হলেও সেগুলি হতে এটুকু ধারণা করা যায় যে, বাল্যকাল হতেই তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার বিকাশ হয়েছিল। তিনি অনেক গুরুর কাছে শিক্ষা নিয়েছিলেন এবং প্রভূত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। তিনি তিব্বতে এসে সক্য, দিকুঙ ও পরিশেষে লাসায় শিক্ষা নেন। তিব্বতের শিক্ষা হতে তাঁর ধারণা জন্মে যে, বৌদ্ধ লামাদের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের সঙ্গতি নেই। এজন্য লামাপ্রভাব-বহির্ভূত রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় ও একাগ্রতার সাধনা নিয়ে তিনি ক্রমে তিব্বতীয় ধর্মসঙ্ঘে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। অতঃপর সঙ্ঘের সংস্কারে তাঁর সমগ্র শক্তি নিয়োজিত হয়। আপনার অনন্যসাধারণ প্রতিভার বলে তিনি 'গেলুগ্‌-প' সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন এবং উহার অধিনায়করূপে প্রধান লামার (Grand Lama) প্রতিষ্ঠা করেন। সাত্ত্বিক ও সাধারণ লৌকিক ব্যাপারে এই প্রধান লামা ও গেলুগ্‌-প-সম্প্রদায় এরূপ প্রতিষ্ঠা ও অভূতপূর্ব গুরুত্ব লাভ করে যে, উহাই তিব্বতের নির্দিষ্ট সুপ্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘে পরিণত হয়ে পড়ে। এই সঙ্ঘ 'পীত-সঙ্ঘ' (Yellow Church) নামেও পরিচিত হয়, কারণ পীতবর্ণকেই তার প্রধান বর্ণ করা হয়—এক রকম প্রতীকস্বরূপ বর্ণ বললেও অত্যুক্তি হয় না। লাল রঙ বিপরীত ও ধর্মবিরুদ্ধ রঙে পরিণত হয়। এরূপ নির্দিষ্ট হয় যে, যারা নূতন সংস্কৃত সঙ্ঘানুবর্তী তারা পীতবর্ণ টুপি ও কটিবন্ধ ব্যবহার করবে এবং সর্বতোভাবে পীতবর্ণকে প্রাধান্য দেবে, কিন্তু যারা নূতন ধর্মসঙ্ঘের বাহিরে থাকবে তারা লাল রঙ ব্যবহার করবে—হলুদে রঙ ব্যবহার করবার অধিকার তাদের নেই। দুটী প্রধান ধারায় সোঙ্‌-খ-পের সঙ্ঘসংস্কার প্রতিষ্ঠিত হয়, একটী কঠোর সঙ্ঘজীবন, তাতে আজীবন কৌমার্য অবলম্বন করতে হবে—নরনারীর আসঙ্গলিপ্সা তাতে থাকবে না, ভাগবত চিন্তা ও প্রার্থনাই

যেখানে প্রাধান্য লাভ করবে, এবং অপরদিকে লামাতন্ত্রের তন্ত্রসাধনার কঠোরতা প্রকৃত ভাবে হ্রাস করা হয়। এ দুটী ধারা তিব্বতীয় জীবনে বেশ খাপ খেয়েছিল এবং ফলে সে নিয়ম রীতিমত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। লাসার নিকটে গন্দন-বিহার নির্মাণ করে তিনি তার প্রথম লামা হয়েছিলেন। গন্দন ছাড়া তিনি সেরা ও ডেপুঙে দুটী ও তাশিলুম্পোয় একটী বিহার প্রতিষ্ঠা করেন।

[ক্রমশঃ

জীবন-কথা

স্বামী শঙ্করানন্দ

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ—অতঃপর একদিন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট কালী ব্রহ্মজ্ঞান প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে ভগবান আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তোর ঠিক ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান হবে।" শীঘ্রই ভগবানের বাক্য সফল হইল। একদিন ধ্যানযোগে কালী নির্বিকল্প অবস্থায় উপনীত হইয়া অদ্ভুত তত্ত্বসমূহ উপলব্ধি করিলেন। পরে তাহা পরমহংসদেবের সমীপে সমস্ত বিবৃত করিলে তিনি বলিলেন যে উহাই ঠিক ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান। তাহার সমস্ত সংশয় দূর হইল, এবং ঈশ্বর-তত্ত্বের সম্যক উপলব্ধিহেতু নাস্তিকতার অজ্ঞানাবরণ চিরদিনের জন্য কালিপ্রসাদের বুদ্ধি হইতে অপসারিত হইল।

নানাকথা—একদিন কালীপ্রসাদ একা বসিয়া পরমহংসদেবকে পাখার বাতাস করিতেছিলেন, এমন সময় ভগবান বালকভাবে হাসিতে হাসিতে তাহাকে বলিলেন "ছোকরাদের কেহ কেহ নরেনকে আমার চেয়ে বড় মনে করে, তোকে আমি বুদ্ধিমান বলিয়া জানি তুই কি বলিস?" কালীপ্রসাদ বলিলেন "যে নরেনকে আপনার চেয়ে বড় মনে করে সে কিছুই জানে না এবং আপনাকেও চিনিতে পারে নাই।"

পরমহংসদেব—"কেন?"

কালীপ্রসাদ—"নরেন আপনার হাতের বানান। আপনার শক্তিতেই নরেন যাহা কিছু শিখিয়াছে এবং আপনিই তাহার ইষ্টদেবতা। সে যদি আপনার চেয়ে বড় হয়, তবে আপনার পায়ে মাথা দিয়ে জ্ঞানভিক্ষা করবে কেন? সে যাহা জানে তাহা আপনার কৃপাতেই লাভ করেছে। নরেন আপনার অপেক্ষা বড় অথবা আপনার তুল্য কিরূপে হইতে পারে?"

শ্রীশ্রীঠাকুর কালীপ্রসাদের উত্তর শুনিয়া বলিলেন—

"তোর বুদ্ধি আছে, তুই ঠিক বলেছিস" বলিয়া তাহাকে আদর ও প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁহার 'আত্মজীবনী'র পাণ্ডুলিপিতে লিখিয়াছেন :—

"আমি কাশীপুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবায় মগ্ন আছি। একদিন বৈকালে আমি তাঁহার শুশ্রূষা করিতে গিয়াছি। তিনি আমাকে বলিলেন :

"তোর বাবা আজ এসে বল্লে যে তোর মা কেঁদে কেঁদে সারা হয়েছে। আপনি কালীকে একবার তাহার মার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বাড়ীতে যাইতে বলিবেন। আমি বলিলাম আচ্ছা, আমি তাহাকে বলিব। তাই আমি তোকে বলছি যে তুই বাড়ীতে যাইয়া থাকিবি।"

"আমি বলিলাম যে আজ্ঞা, তৎপর তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সন্ধ্যার সময় আমি পদব্রজে বাড়ীতে গমন করিলাম। পিতামাতা আমাকে পাইয়া পরমানন্দিত হইলেন, এবং বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন এবং আহারাদি করিয়া রাত্রিতে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অর্দ্ধঘণ্টাকাল তথায় থাকিতে আমার প্রাণে মহা অশান্তি উপস্থিত হইল, আমার মনে হইতে লাগিল আমি যেন নরককুণ্ডে পড়িয়াছি এবং সংসারের তাপদাহে আমার ভয়ানক যন্ত্রণা হইতে লাগিল। এই ভাব থামাইবার জন্য বহু চেষ্টা করিলাম কিন্তু কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিলাম না। কাশীপুরে ছুটিয়া যাইবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আমি একটু মিষ্টি মুখ করিয়া পিতামাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া দ্রুতবেগে বাহির হইয়া এক নিঃশ্বাসে কাশীপুরে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

"কিরে তুই বাড়ী যাস নাই ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ গিয়াছিলাম"

"বাড়ীতে থাকিবার জন্য তোর বাবা বলেছিল, থাকিস্ নাই ?"

"ছিলুম তো"

"কতক্ষণ ছিলি ?"

"আধঘণ্টা মাত্র।"

"তবে তুই ফিরে এলি কেন।"

"রাত্রিতে বাড়ীতে থাকিব বলিয়া গিয়াছিলাম এবং পিতামাতাও বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন, এবং রাত্রিতে থাকিবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার মহা যন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল, এখানে আসিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইল, মনে হইতে লাগিল যেন আমি নরকে গিয়া পড়িয়াছি। তাই একটু মিষ্টি মুখে দিয়া বিদায় লইয়া দৌড়াইয়া এখানে আসিয়া শান্তি পাইয়াছি। শ্রীশ্রীঠাকুর ঈষৎ হাসিয়া আমাকে আদর করিয়া বলিলেন 'বেশ করেছিস'। তাঁহার শান্তিময় atmosphereএ থাকিলে শান্তি পাইতাম এবং তাঁহার অপূর্ব ভালবাসার তুলনায় পিতামাতার স্নেহ অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হইত।"

শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন বৈকালে শুইয়া আছেন, নীচে Lawn-এর ঘাসের উপর একজন পদচারণ করিতেছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর কালীপ্রসাদকে বলিলেন "ভাখ, ওকে ঘাসের উপর চল্‌তে বারণ কর। আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। ও যেন আমার বুকের উপর দিয়ে মাড়িয়ে যাচ্ছে।" সেই লোকটিকে বারণ করিতে তিনি সুস্থ হইলেন। এরূপ দৃষ্টান্ত আর দ্বিতীয় কোথাও পাওয়া যায় না। যীশুখৃষ্ট সকল মানবের প্রতি প্রেম বিলাইয়াছিলেন। বুদ্ধদেব সকল প্রাণীর ভিতর আত্মবুদ্ধি করিয়া ভালবাসিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত বৃক্ষ তৃণ প্রভৃতিতে আত্মস্বরূপ অনুভূতি করিতেন।

পাগলিনী--কাশীপুরের বাগানে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিবার জন্য এক পাগলিনী আসিত। তাহার গলার স্বর অতি মধুর ছিল। সে মায়ের গান গাহিলে তাঁহার ভাব হইয়া যাইত। যখন পাগলিনী উচ্চৈঃস্বরে মধুর কণ্ঠে গাহিত

একবার এস মা এস মা এ হৃদয় রমা পরাণ পুতলি গো,
আছি জন্মাবধি তোর মুখ চেয়ে, জান গো জননী যে যাতনা সয়ে
(আমার) হৃদয়-কমল বিকাশ করিয়ে,
প্রকাশ তাহে আনন্দময়ী গো।

তখন সকলকে কাঁদাইয়া দিত। শ্রীশ্রীঠাকুরও তখন ভাবে বিভোর হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া যাইতেন। পাগলিনী কাহারও বাধা মানিত না, ফাঁক পাইলেই সে উপরে উঠিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিত। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে ঘরে আসিতে নিষেধ করিতেন, কারণ তাহার (পাগলিনীর) পরমহংসদেবের প্রতি মধুর ভাব ছিল। একদিন তিনি বিরক্ত হইয়া (কালীপ্রসাদ প্রভৃতি) সেবকগণকে বলিলেন "ঐ পাগলিনীকে বাগান হতে বার করে দে। ওকে এখানে থাকতে দিসনা। ও ঘরে এলে আমার ভয় হয়।"

কিন্তু সে পাগলিনী কিছুতেই বাগানের বাহিরে যাইবে না। যতবার তাহাকে তাহারা তাড়াইয়া দিতেন, ততবার সে ফিরিয়া আসিত। বাগানের ফটক বন্ধ করিয়া দিলে রাস্তায় বসিয়া থাকিত। কেহ ফটক খুলিলেই সে বাগানের ভিতরে আসিত এবং উপরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিত।

স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ তাঁহার 'আত্মজীবনীতে' এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন: "নিরঞ্জন লাঠি লইয়া তাড়া করিলেও সে তাহা মানিত না। আমি শ্রীশ্রীঠাকুরকে এই পাগলিনীর অবস্থা বর্ণন করিলাম। তিনি বলিলেন 'যা, ওকে পুলিশে রেখে আয়।' আমি তাহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া কাশীপুর থানায় লইয়া গেলাম। পুলিসের constable পাগলিনীকে ধমকাইয়া তাড়াইয়া দিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে পাগলিনী আবার বাগানে আসিয়া গান গাহিতে লাগিল-

মা মা ব'লে আর ডাকিব না,
তারা দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা।

ছিলাম গৃহবাসী করিলি সন্ন্যাসী
আর কি ক্ষমতা রাখিস্ এলোকেশী.
(না হয়) দ্বারে দ্বারে যাব ভিক্ষা মেগে খাব
মা বলে তো আর কোলে যাব না।

এই সুন্দর গান তাহার সুমধুর কণ্ঠে শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইলেন এবং ভক্তগণেরও হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। এই পাগলিনীকে দেখিয়া ও তাঁহার গান শুনিয়াই গিরিশচন্দ্র বিল্বমঙ্গলে পাগলিনীর চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন।

তখন নিরঞ্জন সেই পাগলিনীকে একখানি ঘরে বন্ধ করিয়া কিছুক্ষণ রাখিয়াছিল, তৎপরে দরজা খুলিয়া দিতেই সে আবার উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। নিরঞ্জন কাঁচি আনিয়া তাহার লম্বা চুল কাটিয়া দিল। সেই অবধি পাগলিনী চলিয়া গেল, আর ফিরিয়া আসে নাই।"

মুরব্বি গোপাল দাদা—মুরব্বি বৃদ্ধ গোপালচন্দ্র বসু সিঁতিতে থাকিতেন। তাহার স্ত্রী পুত্র বিয়োগের পর পঞ্চাশ বৎসর বয়সে সংসারে বৈরাগ্য আসে। সিঁতির মহেন্দ্র কবিরাজ তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া আসেন। তিনি প্রায়ই শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিতে আসিতেন। তিনি একটু ডুগি বাজাইতে জানিতেন এবং নরেন যখন তানপুরা লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে গান করিতেন তখন গোপাল দাদা ডুগিতে ঠেকা দিয়া সঙ্গত করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর গোপাল দাদাকে ভাল বাসিতেন এবং প্রবীণ বিচক্ষণ বলিয়া তাহাকে আদর করিতেন। কাশীপুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের অবস্থান সময়ে গোপালদাদা ঐ বাগানে আসিয়া তাঁহার সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

গৈরিক বস্ত্র প্রদান—পৌষ সংক্রান্তি আগত প্রায়। গঙ্গাসাগরে মেলা হইবে এবং জগন্নাথ ঘাটে (কলিকাতায়) বহু সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হইয়াছে। গোপালদাদা সাধুদিগকে শীতবস্ত্র দান করিবার জন্য ১২ খানি কাপড় কিনিয়া আনিয়াছিলেন এবং গিরি মাটি দিয়া রং করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহার সঙ্গে ১২টী রুদ্রাক্ষের মালাও ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর সংবাদ পাইয়া মুরব্বি গোপালকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"গেরুয়া কাপড় করা হচ্ছে কিসের জন্য ?"

"জগন্নাথ ঘাটে গঙ্গাসাগরে মেলায় যাইবার জন্য সাধুরা আসিয়াছে, তাঁহাদিগকে গেরুয়া বস্ত্র দান করিবার মানসে বার খানি কাপড় আনিয়া রং করিয়াছি।"

"জগন্নাথ ঘাটের সাধুদের কাপড় দিলে যে ফল হইবে তাহার হাজার গুণ বেশী ফল হইবে যদি এই ছেলেদিগকে এই গেরুয়া কাপড় দেওয়া হয়। এদের মত ত্যাগী সাধু কোথায় পাবি ? এদের এক এক জন হাজার সাধুর সমান। ইহারা হাজারী সাধু।"

ইহা শুনিয়া গোপালদাদার মনের ভাব পরিবর্ত্তন হইল। তাহা দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর গেরুয়া বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালাগুলি স্পর্শ ও মন্ত্রপূত করিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ এগারজন সেবক-

দিগকে গৈরিক বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা দান করিতে মুরুব্বি গোপাল দাদাকে আদেশ করিলেন। তখন গোপাল দাদা তাহাদিগকে গৈরিক বস্ত্রগুলি ও রুদ্রাক্ষের মালা পরাইয়া দিলেন। তাহারা গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিতে উপরে গেলেন। তিনি তাহাদিগকে সন্ন্যাসী বেশে দেখে মহানন্দে ভাসিতে লাগিলেন। সেই হইতে কালীপ্রসাদ নরেন প্রভৃতি সকলে সাদা কাপড় ত্যাগ করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষের জন্যও একখানি গেরুয়া রাখিয়া দিতে বলিলেন। পরে গিরিশ ঘোষ উহা পাইয়া মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

ভিক্ষা করিবার আদেশ:—গৃহস্থ ভক্তেরা যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের চিকিৎসার্থ তাঁহাকে কলিকাতা শ্যামপুকুরের বাসায় লইয়া আসিলেন তখন শ্রীশ্রীঠাকুর বলরাম বসুকে বলিয়াছিলেন "তুমি আমার খাবার খরচটা দিও। আমি চাঁদার খাওয়া পছন্দ করি না"। পরম ভক্ত বলরাম এই আদেশে নিজেকে কৃতার্থ ও ধন্য মনে করিয়াছিলেন, এবং সানন্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ পালন করিতে লাগিলেন। তৎপরে যখন কাশীপুরের বাগানবাটী ভাড়া করা হইল তখন তিনি শ্রীসুরেশ মিত্রকে বলিয়াছিলেন—"এই সকল গরীব ভক্তরা কেরাণী, ইহাদের ক্ষমতা নাই যে ৮০৲ টাকা এই বাগানের ভাড়া দিতে পারে। তুমি এই বাগান ভাড়াটা দিও।" শ্রীসুরেশ অবনত মস্তকে "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

এক্ষণে কাশীপুরের বাগানে যখন সেবকসংখ্যা বৃদ্ধি হইল এবং তাঁহার সেবা করিবার ও দিবারাত্র watch করিবার জন্য বেশী সেবকের আবশ্যক হইল তখন রামবাবু প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তগণ মাসিক খরচের বিষয় ভাবিয়া পরস্পরে আলোচনা করিতে লাগিলেন এবং লটুকে৷ গোপালকে খরচের হিসাব খাতায় লিখিয়া রাখিতে বলিলেন। তখন অনেক সময় বৈকুণ্ঠ সান্যাল প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তেরা কাশীপুরে আসিয়া আহারাদি করিতেন এবং রাত্রিতেও বাস করিতেন।

রামবাবু ও গৃহস্থ ভক্তেরা অতিরিক্ত খরচ হইতেছে দেখিয়া এই বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, দুইজন সেবকই পরমহংসদেবের সেবার জন্য যথেষ্ট, আর সকলে বাড়ী ফিরিয়া যাউক। এই সংবাদ শ্রীশ্রীঠাকুরের কর্ণে যখন পৌঁছিল তখন তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন—

"আমার আর এখানে থাকিবার ইচ্ছা নাই। ইন্দ্রনারায়ণ জমিদারকে টানিব নাকি? না, বড়বাজারের মাড়োয়ারীটাকে ডাকিয়া আন্"। সেই মাড়োয়াড়ী পরে অনেক টাকা লইয়া আসিয়াছিল। ঐ টাকা দেখিয়া তিনি বলিলেন, না তোমার কাঞ্চন গ্রহণ করিব না)।

ইহার পর যাহা ঘটিয়াছিল স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ তাঁহার আত্মজীবনীতে এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন—"তখন নরেন প্রভৃতি আমরা সকলে বসিয়া আছি। আমাদিগকে বলিলেন—'তোরা আমাকে অন্যত্র নিয়ে চল্। তোরা আমাকে যেখানে নিয়ে

যাবি সেখানেই যাব। তোরা আমার জন্ম ভিক্ষা কর্‌তে পার্‌বি? তোরা কেমন ভিক্ষা কর্‌তে পারিস দেখা দেখি। ভিক্ষার অন্ন বড় শুদ্ধ। গৃহস্থের অন্ন খাবার আর আমার ইচ্ছা নাই।' আমরা বলিলাম—অবশ্যই আপনার জন্য আমরা ভিক্ষা করিব।"

"পরদিন প্রাতে নরেন, নিরঞ্জন, ছট্‌কো গোপাল ও আমি শ্রীমার নিকট নীচে ভিক্ষা করিতে যাইয়া বসিলাম—

'অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে
জ্ঞান বিজ্ঞান সিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি মে পার্ব্বতি।'

"তৎপর তাঁহার হস্ত হইতে মুষ্টিভিক্ষা গ্রহণ করিয়া আমরা পথে বাহির হইলাম। আমরা কখনও ভিক্ষা করি নাই এবং কিরূপে ভিক্ষা করিতে হয় তাহাও জানিনা। নিরঞ্জন মাথায় গেরুয়া পাগড়ী বাঁধিয়া হিন্দুস্থানী সাধু সাজিয়া 'মাই থোড়া ভিচ্ছা দিজিয়ে' বলিয়া আরম্ভ করিল। আমরা বাঙ্গালাতেই আরম্ভ করিলাম। কোন কোন বাড়ীতে মেয়েরা চাউল, আলু, কাচাকলা, বেগুণ ইত্যাদি ভিক্ষা দিল। কেহ বা নানা কথা শুনাইয়া দিল। কেহ বলিল হোৎকা মিনসে চাকরী করিতে পারিস না, ভিখারী সাজিয়া বাহির হইয়াছিস। কেহ বলিল—ইহারা ডাকাতের দল সন্ধান লইতে আসিয়াছে। আবার কেহ গুণ্ডার দলের লোক বলিয়া তাড়া দিল। আমরা নীরবে এই সকল অবমাননা সহ্য করিয়া অপর বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইলাম। এইরূপে শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদিগকে নিন্দা স্তুতিতে একভাব রাখিয়া ভিক্ষা করিতে শিখাইলেন।

"অবশেষে আমরা যাহা ভিক্ষা পাইলাম তাহা তাঁহার পদতলে সমর্পণ করিলাম। তাহা দেখিয়া তাঁহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি শ্রীমাকে ঐ ভিক্ষার চাল রান্না করিতে আদেশ করিলেন।

"শ্রীশ্রীমা ঐ ভিক্ষান্নের তরল মণ্ড পাক করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে দিলেন এবং তিনি উহা মুখে দিয়া বলিলেন—'ভিক্ষান্ন অতি পবিত্র, ইহাতে কাহারো কোনও কামনা নাই। আজ আমি ভিক্ষান্ন খাইয়া পরমানন্দ পাইলাম।' তারপর আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ পাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম।"

ইহার পরে যোগীন, শরৎ, শশী, রাখাল প্রভৃতি সকলেই এক একদিন ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলেন।

কাশীপুর বাগানে যখন অনেক লোক শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিবার জন্য আসিতে লাগিল, তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলাতে তাঁহার গলার বিশ্রাম হইত না জানিয়া ডাক্তারগণ তাঁহার নিকট সেবক ভিন্ন অপর কাহাকেও যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তাহারা এই নিয়ম যথাসাধ্য পালন করিতে লাগিলেন। নিরঞ্জন এক ডাণ্ডা ঘাড়ে করিয়া দরজায় পাহারা দিতে আরম্ভ করিলেন। কোন গৃহস্থ বা ভক্তকে উপরে উঠিতে দেওয়া হইত না।

একদিন অনেকগুলি ভক্ত অনেক দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। সেবকগণ

তাহাদের ব্যাকুলতা তাঁহাকে জানাইতে তিনিও ব্যাকুল হইয়া বলিলেন—"ওরা এতদূর হইতে আমাকে দেখিতে আসিয়াছে, ওদের আমি দেখিব। তৎপরে তাহারা আসিয়া কথাবার্তা কহিল। তাহাদের সহিত অধিক্ষণ কথা বলাতে তাঁহার গলায় বেদনা সেদিন বৃদ্ধি পাইল।

কাশীপুরে শিবরাত্রি—কাশীপুর বাগানে শিবরাত্রি একটী স্মরণীয় ঘটনা। আমরা স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের স্বহস্ত লিখিত 'আত্মজীবনী'র পাণ্ডুলিপি হইতেই উক্ত ঘটনাটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তিনি লিখিয়াছেন—'শিবরাত্রির দিন আমরা (নরেন, শরৎ, নিরঞ্জন, হুটকো গোপাল ও আমি) নিরম্বু উপবাস করিয়া ও সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া চারি প্রহরে শিবপূজা ও ধ্যান করিয়াছিলাম। নরেন মধুর কণ্ঠে শিবের গান গাহিয়াছিল। রাত্রি দুই প্রহরের সময় শরৎ, নিরঞ্জন ও গোপাল যখন কার্য্যবশতঃ বাহিরে গিয়াছিল তখন নরেন ও আমি বসিয়া ধ্যান করিতেছিলাম। নরেনের সমস্ত শরীর কাঁপিতে আরম্ভ করিল। নরেন আমাকে বলিল, আমার উরুতে হাত দিয়া দেখ্‌ত কিছু অনুভব কর্‌তে পারিস্‌ কিনা। তখন আমি তাহার উরুতে হাত রাখিলাম এবং অনুভব করিলাম যেন আমি Electric Battery ধরিয়াছি এবং নরেনের শরীরকে Magnetic Current প্রবল বেগে কাঁপাইতেছে। এই Current এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে আমার হাতও কাঁপিতে লাগিল। (১) এই ঘটনাটী লীলাপ্রসঙ্গে এবং স্বামিজীর জীবনীতে অতিরঞ্জিত করিয়া বলা হইয়াছে যে, স্বামিজী আমাকে স্পর্শ করিয়া আমার ভিতর শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল। নরেনের মনে হইয়াছিল শ্রীশ্রীঠাকুর যে শক্তি সঞ্চার করেন তাহাও এইরূপ এবং তাঁহার ন্যায় তাহারও অপরের ভিতর শক্তি সঞ্চারের ক্ষমতা হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর নরেনের এই অভিমান দূর করিবার জন্য বলিয়াছিলেন 'এখন শক্তি সংগ্রহের সময়, খরচ করিবার সময় নহে।' (২)

"ঐ শিবরাত্রির দিন নরেন 'তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা' নামক গানটী মুখে মুখে রচনা করিয়া মধুর কণ্ঠে গান করিয়া তাঁহাদের সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।"

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীস্বামিজী মহারাজ আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—"শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় আমার জ্ঞানচক্ষু অগ্রেই খুলিয়াছিল এবং তাঁহার কৃপায় অতি অল্পদিনের মধ্যেই আমার আত্মসাক্ষাৎকার ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভও হয়।"

---

(১) স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ বলিতেন যে এই শরীরের কম্পন কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণেরই পরিচায়ক। তিনি যখন আমেরিকাতে রাজযোগের ক্লাস করিতেন তখন তাঁহারও এইরূপ অবস্থা হইত এবং তাঁহার শরীরের কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাড়ীটাই যেন কাঁপিতে থাকিত।

(২) স্বামী অভেদানন্দজী স্বামী সারদানন্দজী ও পরে আত্মবোধানন্দ স্বামীকে ঐ অতিরঞ্জিত ঘটনাটি বই হইতে তুলিয়া দিয়া সত্য ঘটনাটি প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই।

আমরা গত চৈত্র সংখ্যার উদ্বোধন পত্রিকায় (৩য় সংখ্যা ১৩৪৭, পৃ, ১৬২-১৬৩) দেখিলাম

শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্মাণকায় ধারণ—বাগানে একটী খেজুর গাছ আছে। মালী সেই গাছে হাড়ি লাগাইয়া প্রত্যহ খেজুর রস সংগ্রহ করে। একদিন নিরঞ্জন যুক্তি করিলেন যে, তাহারা ঐ জীয়েন রস চুরি করিয়া পান করিবে। সকলেই ইহাতে সম্মত হইল। গভীর রাত্রে নিরঞ্জন, হুটকো গোপাল প্রভৃতি সেবকেরা খেজুর গাছ খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু খেজুর গাছ দেখিতে পাওয়া গেল না। তখন তাহারা ভাবিলেন ইহা শ্রীশ্রীঠাকুরেরই খেলা। সেই সময় শ্রীশ্রীমাও জাগিয়া বাগানের দিকে জানালা দিয়া দেখেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর নিরঞ্জন প্রভৃতির সঙ্গে বাগানে বেড়াইতেছেন। এদিকে শ্রীশ্রীঠাকুর কিন্তু তখন আপন শয্যায় শুইয়া ছিলেন এবং দুইজন সেবক তাঁহার সেবা করিতেছিল।

ক্রমশঃ

সম্পাদক মহাশয় 'বাংলার ধর্ম্মগুরু' পুস্তক সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন: "আমরা অবগত আছি যে আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমনের পর স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ একদিন উদ্বোধন কার্য্যালয়ে আসিয়া স্বামী সারদানন্দ মহারাজকে এই বিবরণ লীলাপ্রসঙ্গ হইতে তুলিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন "আমরা যা জানি তা লিখেছি, তুমি সংবাদপত্রে প্রতিবাদ কর।" কিন্তু তিনি জীবিতাবস্থায় তাহা করেন নাই। স্বামী সারদানন্দের মহাসমাধি লাভের পর স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ উদ্বোধন কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বামী আত্মবোধানন্দকে একদিন ডাকাইয়া বলিয়াছিলেন, -সারদানন্দ আমার সম্বন্ধে শিবরাত্রির ঘটনা ভুল লিখেছে। এরূপ কোনও ঘটনা হয়নি। তুমি লীলাপ্রসঙ্গ হতে এ ঘটনা তুলে দাও।" কিন্তু আত্মবোধানন্দজী লীলাপ্রসঙ্গের উপর হস্তক্ষেপ করতে বিনীতভাবে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেছিলেন।"

এক্ষনে আমরা কাহার কথা সত্যবলিয়া মানিব? যাহার জীবনে ঘটনা ঘটিয়াছিল তাঁহার—না যিনি লোকমুখে শুনিয়া ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাঁহার কথা? স্বামী অভেদানন্দজীর স্বহস্তে লিখিত আত্মজীবনী হইতে এবিষয়ক তাঁহার যে উক্তি এখানে উদ্ধৃত হইল তাহাতে দেখিতেছি তিনি ছাড়া ঐ ঘটনার আর কেহ প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না। স্বামী সারদানন্দ বা অন্য সকলে তখনই ঘটনার কথা জানিতে পারেন যখন স্বামী বিবেকানন্দকে তাহার 'অভিমান' এর জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর তিরস্কার করেন। আর একটা কথা, ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য যে, শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার শিষ্যকে এক পথ দিয়া লইয়া যাইতেছেন এবং তাঁহারই অপর এক শিষ্য তাহাকে সেই পথচ্যুত করিয়া নূতন এক পথে লইয়া যাইয়া তাহার সমূহ ক্ষতিসাধন করিতে সক্ষম হইলেন?

তারপর উদ্বোধন সম্পাদক লিখিয়াছেন—"তিনি (স্বামী অভেদানন্দ) জীবিতাবস্থায় তাহা (প্রতিবাদ) করেন নাই।" কিন্তু আমরা দেখিতেছি ১৯২৬ খৃঃ অব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত "স্বামী অভেদানন্দ" শীর্ষক জীবনীর ১৪ ১৫ পৃষ্ঠায় এই ঘটনার যথার্থ স্বরূপ বর্ণনা করিয়া লীলাপ্রসঙ্গকার ও Life of Vivekananda এর সংগ্রাহকদের উক্তির প্রতিবাদ করা হইয়াছে এবং ইহা তাঁহার জীবদ্দশাতেই অর্থাৎ দেহত্যাগের ১২।১৩ বৎসর পূর্ব্বে এবং স্বামী সারদানন্দজীর জীবিত কালেই হইয়াছিল। ঐ পুস্তক নিশ্চয়ই সম্পাদক মহাশয়ের দৃষ্টি এড়ায় নাই।

মৌর্য্যযুগ

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এ, এম, (ব্রাউন) পি, এইচ্, ডি, (হামবুর্গ)

আলেকজাণ্ডার যখন সিন্ধু-প্রদেশের মধ্য দিয়া পাঞ্জাব আক্রমণ করেন, তিনি এই সব স্থানে কোথাও একজন চক্রবর্ত্তী রাজার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নাই। উত্তর-পশ্চিম ভারত তখন কৌমাবস্থাতেই ছিল, অর্থাৎ লোক বিভিন্ন জনপদে গণ্ডীভূক্ত হইয়া বাস করিত। ইহারা সেই প্রাচীন বিভিন্ন কৌমদেরই বংশধর ছিল। এই সব কৌমদের নাম আমরা সংস্কৃত সাহিত্যে পাই। বেদে আমরা কুরুবংশের উল্লেখ দেখিতে পাই। এবং পরে পৌরাণিক যুগে আমরা অশ্বক, অম্বষ্ঠ, মালব বা মল্ল, ক্ষুদ্রক, সৌবীর, গান্ধার প্রভৃতি জাতির নাম উল্লিখিত হইতে দেখি। তখন ভারতবর্ষের এই অংশ একরাটত্ব বিবর্ত্তিত করিতে পারে নাই, সেইজন্যই এই স্থলের অধিবাসীরা আলেকজাণ্ডারকে বাধাপ্রদানে বিশেষ কৃতকার্য্য হয় নাই। কিন্তু বাঙ্গলার ঐতিহাসিকের (১) কথায় বলি যে পূর্ব্ব হইতে যখন মগধ সিংহবিক্রমে গর্জ্জন করিয়া উঠে তখনই ম্যাসিডোনীয় সৈন্যদল ভয়াম্বিত হইয়া পশ্চাৎ গমন করিতে থাকে।

গ্রীক লেখকেরা বলেন যে ভারতের গ্রীষ্মের উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া সৈন্যেরা বিদ্রোহী হন এবং ইহারই ফলে আলেকজাণ্ডারকে বাধ্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। কিন্তু বহু পরে একজন রোমান্ লেখক বলিয়া গিয়াছেন যে, মগধের একরাট মহাপদ্ম নন্দের প্রতাপ শুনিয়াই ম্যাসিডোনীয় যোদ্ধারা ভীত হয়। একেইত পাঞ্জাবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদের বীরদের শৌর্য্য দেখিয়া তাঁহারা চমকিত হয়। তৎপর এই জাতীয় এক প্রবল প্রতাপ সম্রাটের সম্মুখীন হওয়া তাঁহাদের পক্ষে শক্ত ছিল। এই সময় ম্যাসিডোনীয় স্কন্ধাবারে (camp) চন্দ্রগুপ্ত নামে মগধের একজন পলাতক যুবক আসিয়া জুটিয়াছিল। সে নন্দের শত্রু ছিল এবং তাঁহার সৈন্যের বহর আলেকজাণ্ডারের নিকট বিবৃত করিয়াছিল।

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ ও প্রত্যাগমনের সংবাদ আমরা ভারতের ইতিহাস বা সাহিত্যে পাই না। যথার্থই ঐতিহাসিক নারং (২) বলেছেন যে, তিনি আঁধির মত আসিয়াছিলেন এবং ঝড়ের মত চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার অভিযান ভারতে কোন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে নাই; কিন্তু এতদ্বারা ভারতবর্ষ ও হেলেনিষ্টিক দেশসমূহের সহিত একটা সংযোগ স্থাপিত হয়, এবং হয়ত হেলেনিষ্টিক সংস্কৃতির সহিত ভারতীয় সংস্কৃতির বিনিময় হইতে আরম্ভ হয়।

(১) ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গ্রন্থাবলী ১খণ্ড দ্রষ্টব্য।

(২) ভারতীয় ইতিহাসকি রূপরেখা—জয়চন্দ্র নারং।

এই বৈদেশিক অভিযানকালে আমরা প্রবল প্রতাপ একরাট মহাপদ্ম-নন্দের নাম উল্লিখিত হইতে দেখি। পুরাণে তাঁহাকে শূদ্র বংশীয় বলা হইয়াছে। ইহারা মগধে শিশুনাগ বংশের পর রাজত্ব করেন। আজকালকার অনুসন্ধানকারীরা বলেন যে তাঁহার রাজত্ব বঙ্গোপসাগর হইতে জলন্ধর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লিখিত আছে যে, মগধ বড় হইয়া কোশল ও লিচ্ছবিদের দেশ গ্রাস করে, এবং নন্দের সময় আমরা উপরোক্ত সংবাদ পাই। ইহার অর্থ যে প্রাচ্যে মগধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৌমগুলির স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট করিয়া একচ্ছত্র শাসনের বিবর্ত্তন করিয়াছে এবং এই বিবর্ত্তনই অশোকের সময় পূর্ণতা লাভ করে। তখন সমগ্র ভারত একচ্ছত্রাধীন হইয়া একজাতীয়ত্ব লাভ করে।

নন্দের পর আমরা চন্দ্রগুপ্তকে উত্তরভারতের সম্রাটরূপে সাহিত্যে উল্লিখিত হইতে দেখি। পুরাণে তাহাকে শূদ্র বলা হইয়াছে। গ্রীক লেখকগণ বলেন তাহার সহিত পশ্চিম এশিয়ার ম্যাসিডোনীয় রাজা সেলকুসের এক বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। একদলের মত, ইহার অর্থ চন্দ্রগুপ্ত সেলুকুসের কন্যার পানিগ্রহণ করেন। কিন্তু এই সংবাদের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। ঐতিহাসিক নারং ভবিষ্য পুরাণ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এই সংবাদের সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু ভবিষ্য পুরাণ নামটাই একটি সন্দেহ স্থল। এই সংবাদ যে হালের কোন লেখকের দ্বারা তাহার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হয় নাই তাহারই বা প্রমাণ কি? শোনা যায় যে বর্ত্তমান যুগের অনেক নূতন সংবাদও তাহার মধ্যে লিখিত আছে!

চন্দ্রগুপ্ত হইতেই ভারতবর্ষের সঠিক ঐতিহাসিক সংবাদ আমরা পাইতে থাকি, এবং মগধেই সর্ব্বপ্রথম একচ্ছত্র অখণ্ড সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। কেন সুদূর গান্ধার ও পাঞ্জাবের বৈদিক আর্য্যদের দুর্দ্ধর্ষ সন্তানেরা ইহা করিতে পারিল না এবং বৈদিক ঋষিদের ঘৃণার স্থল বঙ্গ, মগধ, চের জনপদে ইহা স্থাপিত হইল ইহা এখন সমাজতাত্ত্বিকদের অনুসন্ধানের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহাই হউক এই ঘৃণ্য বঙ্গ মগধের লোকেরাই ভারতকে একত্রিত করিয়া এক আইন ও এক রাষ্ট্রের অন্তর্গত করিয়াছিল।

পুরাণে উল্লিখিত আছে যে নন্দেরা ক্ষত্রিয়কুল সব ধ্বংস করেন এবং নন্দবংশের পর আর ক্ষত্রিয় বংশ দেশে ছিল না। অন্য দিকে নবাবিষ্কৃত বৌদ্ধ পুস্তক আর্য্য-মঞ্জুশ্রীমূলকল্প বলিতেছে যে বররুচি নন্দের সভায় থাকিতেন এবং পাণিনি তাঁহার সমসাময়িক লোক ছিলেন। ইহার ব্রাহ্মণদের সহিত বেশ সম্প্রীতি ছিল। নন্দবংশের পর আমরা মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তকে উত্তর ভারতের সম্রাটরূপে দেখি। পুরাণে কথিত হয় ব্রাহ্মণ কৌটিল্য নন্দবংশের প্রতি বিরূপ থাকায় চন্দ্রগুপ্তকে যন্ত্র স্বরূপ ব্যবহার করিয়া নন্দবংশ ধ্বংস করেন এবং চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। পুরাণে কথিত হয় যে কৌটিল্য, চাণক্য এবং বিষ্ণুশর্ম্মা নামেও পরিচিত ছিলেন—তিনি গান্ধারবাসী ছিলেন। কিন্তু হালের কেহ কেহ তাহাকে দক্ষিণাপথ

বাসী (৩) বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু কৌটিল্যের বিখ্যাত পুস্তক অর্থশাস্ত্রে অথর্ব্ব বেদকে বেদ বলিয়া গ্রহণ করা এবং অথর্ব্ব বেদের তুক তাক মন্ত্রকে বিশ্বাস করায় তাহাকে গান্ধার দেশীয় লোক বলিয়া সন্দেহ হয়। ভারতের এই অঞ্চলেই ইরাণী মাগী (Magi) ও অথরবানদের তুকতাক্ ও ম্যাজিক ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ছিল বলিয়া অনুমিত হয়; অর্থশাস্ত্রে তাহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মৌর্য্যযুগের প্রকৃষ্ট সাহিত্য হইতেছে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র। ইহা ভারতীয় সভ্যতার যুগ প্রদর্শক। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের লিখিত খানকতক ধর্ম্মপুস্তক হাতে পাইয়া বলিলেন যে হিন্দুরা জগৎ মিথ্যা বলিয়া চোখ বুজিয়া গাছের তলায় বসিয়া থাকে, আর একদল সমাজে থাকিয়া জাত-'মারা-মারি' করেন—ইহাই হইতেছে হিন্দু সভ্যতা! আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরাও এই ধারণাকে অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং নিজেদের পূর্ব্ব পুরুষদের কার্য্য সম্বন্ধে ভুল ধারণা পোষণ করিতেন। এই জন্যই সুদূর দক্ষিণ হইতে যখন অর্থশাস্ত্রের দুই খণ্ড পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয় তখন পণ্ডিত মহলে একটা হৈচৈ পড়িয়া গেল। কেহ বলিলেন ইহা একটা দক্ষিণী জালিয়াতি—কেহ বলিলেন ইহা অপেক্ষাকৃত হালের লেখা—কেহ বলিলেন ইহাতে অনেক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে; কিন্তু Meyer বলেন ইহাতে কমই প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। কেহ বলিলেন যে কৌটিল্য এত বড় সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হইয়া এত বড় পুস্তক কি করিয়া লিখিলেন! ইহা নিশ্চয়ই তাহার নহে—অন্যপক্ষে জয়সোয়াল (৪) বলেন যে ইহা মৌর্য্য সাম্রাজ্যের রাজকীয় আইন পুস্তক ছিল। এই অর্থশাস্ত্র পুস্তক আবিষ্কৃত হইবার পর পণ্ডিতেরা দেখিলেন যে অনেক অর্থশাস্ত্রের পুস্তক সংস্কৃতে লিখিত হইয়াছিল। অর্থশাস্ত্রের অর্থ হইতেছে—রাজনীতি-বিজ্ঞান (Political Economy)। ইহা রাষ্ট্রনীতি—অর্থনীতি এবং সমাজনীতি বিষয়ে আলোচনা করিয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্র বা স্মৃতিসমূহ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আলোচনা করিয়াছেন এবং সেই চক্ষু দিয়াই সমাজ ও রাষ্ট্রকে দেখিয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা বলেন যে ধর্ম্ম শাস্ত্রই হইতেছে বলবৎ অর্থাৎ রাজার নিকট তাহাই একমাত্র আইন বলিয়া গ্রাহ্য। অন্য পক্ষে জয়সোয়াল বলেন—অর্থশাস্ত্র হইতেছে রাজার আইন সেই জন্য রাষ্ট্রে তাহাই বলবৎ। আবার বহু পরে শুক্রনীতিতে বলা হইয়াছে দেশাচারই বলবৎ—অর্থাৎ রাজার নিকট তাহাই গ্রাহ্য। যাহাই হউক অর্থশাস্ত্র সমূহে আমরা প্রাচীন হিন্দুদের রাজনৈতিক সংবাদ পাই। এই জন্যই কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র আমাদের নিকট এত চিত্তাকর্ষক (Interesting) পুস্তক। এই পুস্তকে এমন অনেক কথা আছে যাহা স্মৃতি সমূহে এবং হালের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে অজ্ঞাত যথা:—একজন ব্রাহ্মণের 'অনন্তর' পুত্র অর্থাৎ একজন ব্রাহ্মণের তাঁহার ঠিক নীচের বর্ণের রমণীর গর্ভজাত পুত্র যদি 'মানুষোপেত' হয় অর্থাৎ যদি মানবোচিত গুণ সমূহের অধিকারী হয় তবে তাহার

(৩) J. J. Meyer কৃত অর্থশাস্ত্রের জার্মান অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

(৪) Jayswal Age of Manu and Yajnavalka.

অপকৃষ্ট গুণ সমূহের অধিকারী ছেলেদের সহিত বিষয়ের সমান বখরা পাইবে ;' এই প্রকারে ক্ষত্রিয় বৈশ্যদের 'অনন্তর' পুত্রেরাও বিষয়ের বখরা পাইবে। ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ানীর গর্ভজাত পুত্রদের সবর্ণ বলা হইয়াছে। শ্লোকটী হইতেছে—"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়য়োরনন্তরা পুত্রাঃসবর্ণা একান্তরা অসবর্ণাঃ।" (৫) (৬৫ প্রকরণ পুত্র বিভাগ).

শ্যামা শাস্ত্রী এই পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদের প্রথম সংস্করণে (1915-Ed). এই শ্লোকের অর্থ করিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ কিম্বা ক্ষত্রিয়ের পরবর্ত্তী বর্ণের স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র (অনন্তর পুত্র) সবর্ণ"(৬) কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে (1923-Ed). তাহা উঠাইয়া দিয়া বলিয়াছেন সবর্ণ (এক) বর্ণের মধ্যে বিবাহজাত পুত্রদের সবর্ণ বলা হয় (৭) অন্য পক্ষে Dr. Meyerএর জার্ম্মাণ অনুবাদ শাস্ত্রীর প্রথম অনুবাদের সঙ্গে মেলে। লেখক উপরোক্ত দুইখানি সংস্কৃত পুঁথি মিলাইয়া এই শ্লোকের এই অর্থ পাইয়াছেন যে ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভজাত পুত্র সবর্ণ। এতদ্বারা এই অনুমিত হয় যে বর্ত্তমানের পৌরহিত্যতন্ত্র (Priest-craft) পরিচালিত আধুনিক সমাজ পদ্ধতির সহিত মিল রাখিবার জন্যই এই দ্বিতীয় সংস্করণে বোধ হয় এইরূপ বিকৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে 'ব্রহ্মজায়া' ও 'ব্রহ্মগাভী' শ্লোক সম্বন্ধে তিনি এক অতি বিকৃত ব্যাখ্যা লোক সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন।

কৌটিল্যের ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াজাত পুত্রদের সবর্ণ বলার সহিত উসনস্ স্মৃতির মত মিলিয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন,—ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়ায়াং জাতোব্রাহ্মণ এব সঃ (৮) (Ch iii. folio 3a) ইহার অর্থ হইতেছে যে ব্রাহ্মণ কিম্বা ক্ষত্রিয়ের কিম্বা বৈশ্যের পরবর্ত্তী বর্ণের স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র পিতার বর্ণ প্রাপ্ত হয়।*

কৌটিল্য অবস্থানুসারে স্ত্রীকে তাঁহার স্বামীর সহিত বনিবনা না হইলে তাঁহার বিবাহ বিচ্ছেদের (Divorce) ব্যবস্থা দিয়াছেন (Ch iii, sloka 155) (৯)। তারপর তিনি স্ত্রীলোকের পুনর্ব্বিবাহেরও ব্যবস্থা দিয়াছেন, (Book iii ; Ch ii, pp 152) (১০)। তৎপর তিনি শূদ্রদের আর্য্যপ্রাণ বলিয়াছেন. (Ch viii Sloka 184) ; (১১)।

(৫) Shyama Sastri—Kautilya Arthasastra Chapter—
vi—200—201 p. p.
vii—202—203 p. p.

(৬) "Sons begotten by Brahmins of next lower caste 'Annantar putras' are called Sabarna !'

(৭) Sons begotten by Brahmins and Khattrias on women of same caste are called Sabarna.

(৮) Kane—History of Dharmasastra pp 112.

* এতদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে প্রাচীনকালের বাস্তবকে আধুনিক পদ্ধতির সহিত মিলাইবার জন্য শ্যামা শাস্ত্রী দ্বিতীয় সংস্করণে শ্লোকের কি ভুল অর্থ করিয়াছেন।

(৯) শ্যামা শাস্ত্রী—English Translation of Kautilya pp 191.

(১০) Ibid— Ditto pp 187.
(১১) Ibid— Ditto pp 187.

তিনি বলিতেছেন, যে শূদ্র জন্মজাত গোলাম নয় এবং প্রাপ্ত বয়স্ক হয় নাই কিন্তু আর্য্যপ্রাণ (আর্য্যত্ব প্রাপ্ত) তাহাকে যদি তাঁহার আত্মীয় বন্ধক দেয় (mortgage), তাহা হইলে তাহাদের ১২ পণ অর্থদণ্ড হইবে ;—

"উদরদাসবর্জমপ্রাপ্তব্যবহারং আর্য্যপ্রাণং শূদ্রং
বিক্রয়াধানং নয়তস্বজনস্ত দ্বাদশপণো দণ্ডঃ ; (৬৫ দাসকল্প)।"

কারণ কোন আর্য্য গোলামীত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না (১২)। পুনরায় একজন গোলামের অর্থ ঠকাইয়া লইলে কিম্বা আর্য্য বলিয়া যে সুবিধাগুলি সে পায় তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিলে (আর্য্যভাব অপহরস্ত : Sloke 182) তাহা লইলে তাহাকে জরিমানা দিতে হয় (১৩)। পুনরায় যে লোক নিজেকে গোলামীত্বে বিক্রি করিয়া ফেলে তাহার পুত্র আর্য্য হইবে—Sloka 182 (১৪)। তৎপর আবার বলা হইতেছে যে একজন গোলাম স্বকৃত রোজগার উপভোগ করিতে পারিবে এবং পিতার অর্থের উত্তরাধিকারী (Inheritor) হইতে পারিবে ; (Sloka 182) (১৫)। পুনরায় একজন গোলামের দেহান্ত হইলে তাহার বিষয় তাহার জ্ঞাতিরা পাইবে (Sloka 183) (১৬)। আবার একজন যে টাকার বিনিময়ে নিজের গোলামীত্ব বিক্রি করিয়াছে সেই টাকা ফিরাইয়া দিলে তাঁহার আর্য্যত্ব ফিরাইয়া পাইবে ; Sloka 182 (১৭)। এতদ্বারা ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, শূদ্র—মৌর্য্য শাসনকালে শূদ্রেরা আর্য্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল অর্থাৎ তাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের স্থায় পূর্ণ-নাগরিকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। আর্য্য শব্দের অর্থ লইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র নানা বিতর্ক আছে ; এই স্থলে আর্য্য শব্দর অর্থ স্পষ্টই ধরা পরে। আর্য্য শব্দের অর্থ যিনি নাগরিকের পূর্ণ সুখ সুবিধা (Privileges) ভোগ করেন। এই স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে আর্য্যপ্রাণ ও আর্য্যভাব শব্দের জয়সোয়াল্ এক অদ্ভুত ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যে শূদ্রের যত 'আর্য্য' রক্ত আছে সে তত আর্য্যপ্রাণ এবং তত আর্য্যের সুবিধা ভোগকারী (১৮)। এতদ্বারা ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে তিনি হালের ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীর Race Theory দ্বারা ভারতীয় ইতিহাস ও ধর্ম্মপুস্তক সমূহ ব্যাখ্যা করিতে গিয়াছেন। কিন্তু শ্যামা শাস্ত্রী আর্য্যপ্রাণ অর্থে Aryan by birth বলিয়াছেন এবং আর্যভাব অর্থে 'Privileges he can exercise as an Aryan' বলিয়াছেন। কৌটিল্যের অভিপ্রায় অতি প্রাঞ্জল। মৌর্য্যযুগে রাজমন্ত্রী কৌটিল্য ভারত হইতে গোলামী প্রথা (Slavery) পরোক্ষ উপায়ে (Indirectly) দূর করিবার

(১২) Shyama Sasri—222—223 pp. (১৩) Shyama Sasri—223 pp.
(১৪) „ —224 pp. (১৫) —224 pp.
(১৬) Shyama Sastri—285 pp.
(১৭)—Shyama Sastri—224 pp.
(১৮) Jayswal—Age of Manu and yajnavalka দ্রষ্টব্য।

চেষ্টা করিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালের প্রধান দুইটী কৃতিত্ব হইতেছে শূদ্রকে আর্য্যত্ব প্রদান করা ও গোলামীপ্রথা উঠাইয়া দিবার চেষ্টা। এই যুগে পৃথিবীর কোথায়ও কেহই গোলামী প্রথা বিনষ্ট করার চেষ্টা করেন নাই। কৌটিল্যের সমসাময়িক Aristotle এই প্রথা সমর্থন করিয়াছেন। তৎপর তিনি রাজকর্মচারী নিযুক্ত করিবার বেলায় বলিয়াছেন ;—

"Native born of high family, influential, well-educated in arts—these are the qualifications of a ministerial officer." (অমাত্য সম্পত) book I. Ch IX. Sloka 15 ; (১৯)।

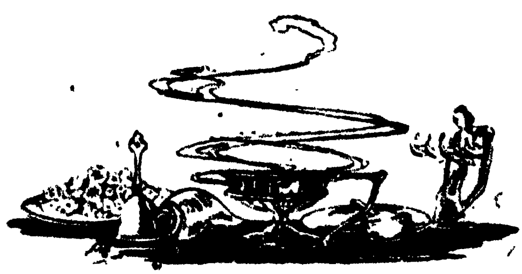
প্রতিপত্তিশালী, বিভিন্ন কলায় সুপণ্ডিত, উচ্চবংশজাত স্বদেশবাসী ব্যক্তিই মন্ত্রিত্বাদি পদ লাভের যোগ্য অধিকারী। তিনি আরও বলিতেছেন : "He whose family and character are highly spoken of, is well-educated in Vedas and six Angsa···. him shall king employ as high Priest (২০)।

যাহার বংশ এবং চরিত্র মর্য্যাদা সর্ব্বমুখে প্রশংসিত, যে বেদ ও বেদাঙ্গে পারদর্শী রাজা তাহাকেই প্রধান পুরোহিতের পদে নিযুক্ত করিবে।

পুনরায় তিনি বলিতেছেন : "The king shall dismiss the priest who when ordered, refuse to teach the vedas to an outcaste person or refuse to officiate in a sacrificial performance (apparently) undertaken by an outcaste person" (Ajaya Book I, Ch. XX) (২১)।

রাজা কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়াও যে পুরোহিত একটী নীচবর্ণের ব্যক্তিকে বেদ পড়াইতে অস্বীকার করে অথবা একটী নীচবর্ণের 'অজাজা' ব্যক্তি কর্তৃক (আপাতভাবে) প্রবৃত্ত যজ্ঞে পৌরহিত্য করিতে অস্বীকার করে তাহাকে রাজা পদচ্যুত করিবেন।

আগামী সংখ্যায় প্রকাশিতব্য প্রবন্ধে লেখক এ সম্বন্ধে বিস্তারিত সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন।



(১৯) Shyama Sastri 15 p.p.
(২০) Ibid 16 p.p.
(২১) Shyama Sastri p.p. 16

যুগমানব স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বেদানন্দ

নব্যভারতের স্রষ্টা দিব্যদ্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দের মহাজীবন সত্যসত্যই অপরূপ ও অতুলনীয়। সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে যাঁরা চিরস্মরণীয়, নমস্য ও চিরবরেণ্য হয়ে আছেন স্বামী বিবেকানন্দ সেইসব অসাধারণ মহামানবদের সমান পর্য্যায়ে স্বগৌরবে সমাসীন। বর্ত্তমান ভারতের যুগাদর্শ স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যেই জীবন্ত ও জাগ্রত হয়েছে। বিবেকানন্দের এই আশ্চর্য্য জীবনের পরিচয় দেওয়া সহজ সাধ্য নয়। তাঁর বিরাট জীবনে নানা আশ্চর্য্য ঘটনা, গৌরবময় বহু আখ্যান এবং বিচিত্র বহুমুখী ও বিপুল কর্ম্মশীলতার সমাবেশ। বিরাট ব্যক্তিত্ব, সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, অপরিমেয় আধ্যাত্মিকতা, সুগভীর জ্ঞান, সুনির্ম্মল চরিত্র, বহুবিদ্যায় নিপুণতা, জীবন্ত জাতীয়তা, জলন্ত স্বদেশপ্রেম, জাতিনির্ব্বিশেষে নিখিল মানবের জন্য নিঃস্বার্থ ও অবিশ্রান্ত ভালবাসা এই সমস্ত সুদুর্ল্লভ সম্পদের সম্মিলনে স্বামী বিবেকানন্দ আপনাতে আপনিই পরিপূর্ণ। প্রকৃতই তাঁর জীবন যেন স্বর্গের কোন সুরভিময় সহস্রদল পদ্মের মতন আপনার অনবদ্য সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব সুন্দর। এই বিচিত্র-কর্ম্মবহুল, অসাধারণ জীবনকে যথাযথ ভাবে পরিচিত করাতে হলে চাই সুদূর প্রসারিত পরিপ্রেক্ষণী, অব্যর্থ অন্তর্দৃষ্টি, অপক্ষপাত ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী, অনুভূতির তীব্রতা অবধারণশক্তি, মমত্ব বোধ ও বিশ্লেষণ নৈপুণ্য এবং সর্ব্বোপরি তাঁর ভাবধারা চিন্তাসম্পদ ও কর্ম্মজীবনের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান। কেননা বিবেকানন্দের মতন কোন অসাধারণ প্রতিভাশালী যুগস্রষ্টা মহামানবের সম্যক পরিচয় প্রদান শুধু তাঁর অসাধারণ জীবনের বিস্ময়কর ঘটনাবলীর কালানুক্রমিক বর্ণনা দ্বারাতেই সম্ভব হয় না। এই কার্য্য সম্পাদন করতে হলে লেখককে দেখাতে হবে যে যেসময়ে সেই মহামানব জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই সময়ে তাঁর দেশের অবস্থা ও সমাজের পরিস্থিতি কী ছিল? কোন্ কোন্ আন্দোলনের তরঙ্গ সেই সময়ে দেশে বয়ে চলেছিল—সেই সময়ে দেশের শিক্ষিত সমাজের আশা আকাঙ্খা, আগ্রহ, রুচি কোন বিষয়ে ও কোন পথে প্রবাহিত—পাশ্চাত্যদেশের কোন প্রচলিত আন্দোলন দেশের সমাজে কোন পরিবর্ত্তন ও প্রভাব এনেছিল কিনা—সে সময়ে দেশের অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক অবস্থা কী প্রকার? তার পরে আরও প্রয়োজন যে এই মহামানবের অভ্যুদয় তাঁর দেশের ও জাতির গতিকে কোন পথে নিয়ে গেলো এবং তাতে দেশে কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নতিমূলক কী পরিবর্ত্তন এসেছিলো? তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে কোন অপূর্ব্বতা আছে কি না? এবং তাঁর দেশীয় পূর্ব্ববর্ত্তী মহামানবদের সঙ্গে তাঁর চিন্তাধারা ও কর্ম্মপদ্ধতির কোন্ সংযোগ, সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ বর্ত্তমান কিনা। দেখাতে

হবে এই মহামানবের চিন্তাধারা, মনীষা, বহুমুখী কর্মশক্তি, ও বিরাট ব্যক্তিত্ব জাতির ইতিহাসে কী নূতনত্ব এনেছে—কোন কার্য্যে তাঁর শ্রেষ্ঠতা ও বিশেষত্ব নিহিত? এছাড়া আরও দেখানো প্রয়োজন তাঁর প্রতিভার অবদান সমগ্র মানবসভ্যতাকে কোন অভিনব সাংস্কৃতিক ও চিন্তাসম্পদে সমৃদ্ধ করেছে—আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তাঁর জীবনাদর্শের শ্রেষ্ঠতা, উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা কোথায়? এই সমস্ত দিক ঠিক ঠিক ভাবে পাশাপাশি দেখাতে না পারলে কোন মহামানবের জীবনচরিত সম্বন্ধে পরিচয় প্রদান করা বিড়ম্বনা হয়ে ওঠে। অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে যে এই কার্য্য যথাযথভাবে সম্পন্ন করবার অধিকার নিয়ে অতি অল্প লোকেই জন্মগ্রহণ করে। যেহেতু একার্য্য অতীব দুঃসাধ্য। তথাপি কোনও মহামানবের সম্বন্ধে আলোচনা যতই অসম্পূর্ণ হোক সে কার্য্যে মানুষের মানসিক উৎকর্ষ অন্ততঃ কিছু পরিমাণেও সাধন করে। সেই কারণে স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় বিশ্ববিখ্যাত যুগস্রষ্টা মহামানব সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা একান্ত অসম্পূর্ণ এবং অস্পষ্ট হবে জেনেও তাঁর উদ্দেশে এখানে নিতান্ত সঙ্কোচের সহিত কিছু অবতারণা করছি।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে তাঁর নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা বহুমুখী হয়ে আশ্চর্য্যভাবে প্রকাশিত। তাঁর কর্মক্ষেত্রের কোন সীমা ছিল না। শুধু ধর্ম্মসাধনা অথবা দার্শনিকতায় নয়—শিক্ষানীতি, সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য, সঙ্গীত, ললিতকলা প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি দেশবাসীকে নিজের স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তাধারা বহু নির্দ্দেশ দিয়ে গেছেন। সেই কারণে তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবনের মূলসূত্র কী এই নিয়ে সুধী ও চিন্তাশীল সমাজের মধ্যে নানা প্রকার মত বর্ত্তমান। কেউ তাঁকে বলেছেন আদর্শ ধর্ম্মশিক্ষক, কেউ বলেছেন আদর্শ স্বদেশপ্রেমিক, কেউ বলেছেন মহাকর্ম্মী এই প্রকার আরও কত কি। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ শুধু ধর্ম্মশিক্ষক সিদ্ধযোগী, দার্শনিক স্বদেশপ্রেমিক অথবা মহাকর্ম্মী মাত্রই ছিলেন না। এই সমস্ত এবং আরও বহু সদগুণের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য ও সমাবেশেই তাঁর জীবন বিচিত্রিত। অতএব কোন বিশেষ গুণটি স্বামী বিবেকানন্দের অপূর্ব্ব জীবনের মূলসূত্র তা বলা সহজসাধ্য নয়। বিবেকানন্দের জীবনের বিচিত্রতা ও বিশেষত্ব দেখাতে গিয়ে তাঁর অন্যতম জীবন-চরিতকার ফরাসী মনীষী রোমাঁ্যা রোলাঁ লিখেছেন :—

"Equilibrium and synthesis in these two words Vivekananda's constructive genius may be summed up. He embraced all the paths of the spirit; the four Yôgas in their entirety, renunciation and service, art and science, religion and action from the most spiritual to the most practical……He was the personification of the harmony of all human energy."

ভারতকে সর্ব্ববিধ গ্লানি থেকে মুক্ত ক'রে জগতের সমস্ত জাতির কাছে তার সভ্যতা

Romain Rolland, Life of Vivekananda, Civitas Dei.

সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের একমাত্র স্বপ্ন। তিনি দেখেছিলেন এদেশে প্রকৃত শিক্ষার অভাবে দেশবাসী অজ্ঞানতা, সঙ্কীর্ণতা, গোঁড়ামী, অস্বাস্থ্য, দারিদ্র্য ও দুর্গতির চরমে এসে পড়েছে। প্রথমবার আমেরিকা যাত্রার (১৮৯৩) পূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দ আসমুদ্রহিমাচল ভারতের প্রত্যেক স্থান পরিভ্রমণ ক'রে অভিজাত বংশীয় রাজা-মহারাজা থেকে কুটীরবাসী নিরন্ন দরিদ্র পর্য্যন্ত এদেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হয়ে দেখেছিলেন জাতির বর্ত্তমান অবনতির কারণ কী? এবং কী ভাবে সেই অবনতি থেকে ভারতকে রক্ষা করা যায়। তিনি বুঝেছিলেন, "আমাদের উন্নতির পথে কতকগুলি দারুণ অন্তরায় আছে। তার মধ্যে 'আমরাই পৃথিবীর একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি,' এই মিথ্যা-শ্রেষ্ঠতার অভিমান একটি। ভারতের বাহিরে অন্য যে সব জাতি আছে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে এখন আর আমাদের চলবে না। আমরা যে এক সময় তা করেছিলুম সে আমাদের নির্বুদ্ধিতা এবং তার বিষময় ফল এখন আমরা ভোগ করছি।" "যেদিন থেকে ভারতে 'ম্লেচ্ছ' শব্দটার উৎপত্তি এবং জগতের অন্য সব জাতিদের সঙ্গে তার আদান প্রদান বন্ধ হলো সেই দিন থেকে ভারতের অধঃপতনেরও সূচনা হলো।" "পৃথিবীর অনেক দেশে ঘুরে ঘুরে তাদের সর্ব্ববিষয়ে আশ্চর্য্য রকম উন্নতি এবং আমাদের এই রকম অবনতির কারণ কি তা আমি অনেক চিন্তার পর উপলব্ধি করলুম যে যথার্থ শিক্ষাই তাদের সঙ্গে আমাদের এতখানি পার্থক্যের কারণ। শিক্ষা—শিক্ষা—শিক্ষা—একমাত্র শিক্ষার বিস্তারেই আমাদের সমস্ত জাতীয় ব্যাধি দূর হয়ে যাবে।"

ভারতের বর্ত্তমান অবনতির কারণ কি? এ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত যে জাতিভেদ, পুরোহিতপ্রথা ও অস্পৃশ্যতার আধিক্য এবং জীবনসংগ্রামে উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক প্রতিভা, শ্রমশিল্পজ্ঞান ও অর্থনৈতিক অভ্যুদয় লাভের কলাকৌশল না জানা থাকায় বর্ত্তমানে ভারত জগতের অন্য সব জাতির চেয়ে এত অবনত। এদেশে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্ণেরা চিরকাল দেশের নিম্ন জাতিদের ঘৃণা অবজ্ঞা ও নির্য্যাতন ক'রে আসছে। উচ্চবর্ণের কাছ থেকে বহুশত বৎসর ধ'রে প্রতিপদে অমানুষিক ঘৃণা লাঞ্ছনা আর সহ্য করতে না পেরে নিম্নজাতির অনেকে হিন্দু সমাজ ত্যাগ ক'রে মুসলমান খৃষ্টান হয়ে যাচ্ছে! এদের প্রতি কারুরই সহানুভূতি দয়া অথবা মমতা নেই বরং হিন্দুসমাজে এদের কুকুর শিয়ালের চেয়েও হীন শোচনীয় অবস্থা। ধনী, উচ্চবর্ণ ও পুরোহিতদের অত্যাচারে নির্য্যাতনে অবজ্ঞায় ভারতের নিম্নজাতিরা নিষ্পেষিত ও জর্জ্জরিত। অথচ দেশের লোকসংখ্যার মধ্যে এরাই কোটী কোটী—এদের সংখ্যার তুলনায় উচ্চবর্ণেরা মুষ্টিমেয় মাত্র। মানুষের যে ন্যায্য অধিকার তাই থেকে ভারতের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি দরিদ্র নরনারী প্রবঞ্চিত—অন্নহীন বস্ত্রহীন স্বাস্থ্যহীন চরম দুর্গতি ও দুর্দ্দশায় তাদের জীবন অতিবাহিত হয়ে চলেছে। ধনিকের নির্ম্মম অত্যাচারে শোষিত এই সব লক্ষ লক্ষ নির্য্যাতিত ও উচ্চ-

বর্ণের দ্বারা লাঞ্ছিত নিরীহ নরনারীর দুঃখ, ব্যথা, মনোকষ্ট, দারিদ্র্যের তীব্র অভাব মহাপ্রাণ বিবেকানন্দের বিশাল হৃদয়ে পুঞ্জীকৃত হয়ে অগ্নিগিরির ভীষণ নিঃস্রাব সৃষ্টি করতো। কী করে তাদের উন্নতি হবে এই দারুণ চিন্তায় অস্থির ও বিনিদ্র হয়ে শত শত রাত্রি তাঁর কেটে গেছে। মুষ্টিমেয় ধনী ও মদান্ধ ব্যক্তির বিলাসিতা ও আরাম স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে দেশের কোটি কোটি লোক দুর্দ্দশার নিম্নতম স্তরে প'ড়ে থাকবে—এ কল্পনা বিবেকানন্দের চক্ষে বীভৎস বিভীষিকার সৃষ্টি করতো। তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন, "সমাজ কে? লক্ষ লক্ষ তারা?—না তুমি আমি দু' দশজন বড়ো জাত?" "যতদিন না ভারতের এই কোটি কোটি দরিদ্র উপযুক্ত শিক্ষা পায়, ভাল খেতে পায়, ভালরকম বাসস্থান পায় ততদিন যত বড়ই রাজনৈতিক আন্দোলন করা হোক না কেন তার কোনই ফল হবে না।" দেশের এই উপেক্ষিত চিরদরিদ্র জনসাধারণের দুঃখব্যথা স্বামিজীর বিশাল হৃদয়ে যে কী মর্ম্মঘাতী বেদনা ও ব্যথার দাবানল সৃষ্টি করেছিল তা তাঁর বহু পত্রে ও প্রবন্ধে দেখা যায়। এসম্বন্ধে আমেরিকা থেকে এক শিষ্যকে তিনি লিখেছিলেন, "আমি এই দেশে এসেছি, দেশ দেখতে নয়—তামাসা দেখতে নয়—এসেছি আমার দেশের লক্ষ লক্ষ দরিদ্রের জন্যে একটা উপায় করতে। সে উপায় কি পরে জানবে যদি ভগবান সহায় হন।" অন্য এক স্থানে লিখেছিলেন, "আমার মতে, জনসাধারণকে অবজ্ঞা করাই ভারতের জাতীয় মহাপাপ এবং আমাদের অধঃপতনের অন্যতম কারণ।" "...এসো প্রত্যেকে দিবারাত্র দারিদ্র্য, পৌরহিত্য-শক্তি এবং প্রবলের অত্যাচারে নিপীড়িত ভারতের লক্ষ লক্ষ পদদলিতের জন্যে আমরা প্রার্থনা করি। বড়লোক ও ধনীদের কাছে আমি ধর্ম্ম প্রচার করতে চাই না। আমি তত্ত্বজিজ্ঞাসু নই, দার্শনিকও নই, না না আমি সাধুও নই। আমি গরীব—গরীবদের ভালবাসি। তাদের জন্যে ভাবো, তাদের জন্যে কাজ কর, তাদের জন্যে সদা-সর্ব্বদা প্রার্থনা কর। এরাই তোমাদের ঈশ্বর—এরাই তোমাদের দেবতা হোক, এরাই তোমাদের ইষ্ট হোক।" স্বামিজীর দেশপ্রেম শুধু একটা কথার কথা মাত্রই ছিল না—তাঁর স্বদেশপ্রেম ওজস্বী বক্তৃতা প্রদান, অথবা জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ নিবন্ধের রচনার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। সেই জীবন্ত স্বদেশপ্রেম তাঁর প্রবর্ত্তিত বহু বিভিন্ন কর্ম্মের মধ্যে জাহ্নবীধারার মতন প্রবাহিত হয়ে নানা-ভাবে দেশের উপেক্ষিত নির্য্যাতিত নিঃস্ব জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করে আসছে। আজ যে ভারতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে জনসেবার এতো প্রসার ও প্রচলন হয়েছে তার প্রকৃত প্রেরণা দেশবাসী পেয়েছে ভারতপ্রাণ বিবেকানন্দের জীবন, প্রচণ্ড কর্ম্মপ্রচেষ্টা ও অগ্নিময়ী বাণী থেকে। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব এক সময় লিখেছিলেন, "যদি দেশের জন্য মানবের ব্যথা ও ব্যাকুলতা কোনদিন শরীরিণী হইয়া উঠে তবেই বিবেকানন্দকে বুঝা যাইবে।"

দেশের সেবা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে ধর্ম্মসাধনারই নামান্তর ছিল। কারণ এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ স্বামী বিবেকানন্দের চক্ষে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি শস্যবহুল নদী-বহুল এক বিরাট ভৌগোলিক সংস্থান মাত্রই ছিল না। ভারতের প্রত্যেকটি ধূলিকণা ছিল

স্বামী বিবেকানন্দের কাছে স্বর্গের মহিমায় মহিমান্বিত। সমগ্র দেশ—সমগ্র দেশবাসীর মধ্যেই বিবেকানন্দ দেখেছিলেন তাঁর ইষ্ট দেবতার অনবদ্য চিন্ময় প্রকাশ। দেশ ও দেশবাসীর সঙ্গে তাঁর সমস্ত সত্তা অবিচ্ছিন্ন ও ওতপ্রোত হয়ে জড়ানো ছিল। সেইজন্যই দেশের যুবকদের কাছে বিবেকানন্দের বাণী, "আগামী পঞ্চাশ বৎসর ধ'রে দেশ জননী ভারতমাতাই যেন তোমাদের একমাত্র উপাস্যা হন। অন্য সব দেবদেবীকে এখন ভুললে চলবে—এখন একমাত্র ইনিই জাগ্রতা। তোমরা কোন নিষ্ফল দেবতার অন্বেষণে ঘুরে বেড়াচ্ছ? একমাত্র ভারতমাতারই সেবা কর।" একবার লাহোরে দু'জন বৈদান্তিক পণ্ডিত স্বামিজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে তাঁর কাছ থেকে ধর্ম্মপ্রসঙ্গের পরিবর্ত্তে শুধু দেশের দুঃখ অভাব ও দারিদ্র্য ও তার প্রতিকারের কথাই শুনে স্বামিজীকে অনুযোগ করেন যে সেদিন তাঁরা ধর্ম্মের কোন তত্ত্ব শুনতে পেলেন না। তার উত্তরে মানবপ্রেমিক ভারতপ্রাণ স্বামীজি ব্যথিত হয়ে বলেছিলেন, "প্রত্যেক মানুষ জীবজন্তুর মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করাই বেদান্তের সার কথা—যতদিন ভারতের একটা কুকুরও অভুক্ত থাকবে ততদিন বিবেকানন্দের ধর্ম্ম নেই।"

স্বামী বিবেকানন্দ যে ধর্ম্ম প্রচার করেছিলেন তা কোন সম্প্রদায়গত, দেশগত বা আচারগত ধর্ম্ম নয়। তাঁর প্রচারিত ধর্ম্ম কোন ব্যক্তিবিশেষ, পুস্তকবিশেষ বা মতবাদেই আবদ্ধ নয়। সার্ব্বজনীন ও সনাতন সত্যই স্বামী বিবেকানন্দের প্রচারিত ধর্ম্মভাবের ভিত্তি। হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব এই যে কোন ঈশ্বরদ্রষ্টা সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষের জীবনকে মাত্র অবলম্বন ক'রেই হিন্দুধর্ম্ম গড়ে ওঠেনি। পরন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলকারণ যে অনাদি অনন্ত শাশ্বত সত্য, যা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিন কালেই অবাধিত অপরিবর্ত্তনীয়, সেই সনাতন সত্যের উপরই হিন্দুধর্ম্মের মূলনীতি স্থাপিত। এই কারণে হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত নাম সনাতন ধর্ম্ম। সেই কারণেই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম কোন সম্প্রদায়ে আবদ্ধ থাকতে পারে না—তার ধর্ম্মশাস্ত্র সেই কারণে কখনও মনুষ্য হস্ত রচিত গ্রন্থ হতে পারে না। বেদ অর্থে কোন পুস্তকবিশেষ নয়—পরন্তু অনাদি অনন্ত অসীম অলৌকিক জ্ঞানরাশিকেই বোঝায়। হিন্দুধর্ম্মের যা মূলনীতি তা কোন বিশেষ দেশ, জাতি বা সম্প্রদায়ে আবদ্ধ নয়, তা একেবারে বিশ্বজনীন, সেইজন্য তা সম্পূর্ণভাবে সমগ্র মানবজাতির। এই বিশ্বজনীন ধর্ম্মকে প্রাচীন ভারতের আর্য্যঋষিরা বহু শতাব্দী পূর্ব্বে উপলব্ধি করেছিলেন। আধুনিক যুগে এই বিশ্বজনীন ধর্ম্ম আপনাকে এক অপরূপ মহিমা ও অপার্থিব সৌন্দর্য্যে যাঁর অলোকসামান্য মহাজীবনের মধ্যে রূপায়িত করেছিল তিনি সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়কারী বিশ্বগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণের অলোকসামান্য সর্ব্বভাবময় দিব্যজীবনের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসেই স্বামী বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন যা প্রকৃত ধর্ম্ম তার স্বরূপ কতো মহিমময়—তার আদর্শ কী সার্ব্বভৌম ও বিশ্বজনীন। শ্রীরামকৃষ্ণের অপার করুণা এবং দিব্যস্পর্শেই মহাজ্ঞান মহাশক্তি লাভ ক'রেই সমগ্র সভ্য জগতের সমক্ষে বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা সপ্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্বামিজী স্বীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনের আধ্যাত্মিক আলোকে উপলব্ধি করেছিলেন

যে নিম্নাজের মূর্তিপূজা থেকে সর্বোচ্চস্তরের অদ্বৈতবাদ পর্য্যন্ত সমস্ত সাধনাই সত্য, কোনটিই মিথ্যা নয়। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈত এসব মতবাদ কেউই কারুর বিরোধী নয় পরন্তু একে অন্যের পরিপূরক। সাধকের আধ্যাত্মিক অবস্থা অনুযায়ী সাকার নিরাকার প্রত্যেকটি ভাবই সত্য। জ্ঞান ভক্তি কর্ম এই ত্রিতত্ত্বের সমন্বয়মূলক এই উদার অসাম্প্রদায়িক ধর্মই বিবেকানন্দ সাধন উপলব্ধি ও প্রচার করেছিলেন। সেইজন্ত তাঁর প্রচারিত ধর্ম জাতিনির্ব্বিশেষে মুক্তিকামী মাত্রেরই গ্রহণীয় ও বরণীয়।

ধর্মের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করতে গিয়ে বিবেকানন্দ বলেছেন, "Religion is the manifestation of Divinity already in man,"—মানুষের মধ্যে যে ঈশ্বরত্ব আছে তার বহির্বিকাশ সাধন করাই ধর্ম। 'মদীয় আচার্য্যদেব' নামক বক্তৃতায় এ সম্বন্ধে স্বামিজী বলেছেন, "ধর্ম শুধু বাক্যের আড়ম্বর নয়—ধর্ম মতবাদ অথবা সাম্প্রদায়িকতা নয়। সম্প্রদায় বা সমাজে ধর্ম থাকতে পারে না। আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্বন্ধ উপলব্ধি করাই ধর্মের কার্য্য। * * * মন্দির বা গির্জ্জা তৈরী কিম্বা সমবেত উপাসনায় যোগ দিলেই ধর্ম হয় না। কিম্বা কোন গ্রন্থবিশেষে, কারুর উক্তির মধ্যে অথবা সঙ্ঘে ধর্ম নেই। ধর্মের আসল তত্ত্ব অপরোক্ষানুভূতি। ঈশ্বরকে সাক্ষাৎকার করা, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া—ঈশ্বরের মধ্যে স্থিতিলাভ করা, ঈশ্বর হয়ে যাওয়া এ-ই হলো ধর্ম।"

কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ আপনার পরমারাধ্য ধর্মগুরু শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে ধর্মের যে পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখেছিলেন সমস্ত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করবার সময় কোথাও সেই প্রকৃত ধর্মের চিহ্নও দেখতে পাননি। ধর্মের সারতত্ত্বের পরিবর্ত্তে তিনি দেখেছিলেন সারা ভারত জুড়ে নানাপ্রকার যুক্তিহীন কদর্য্য প্রথা, অলীক ও অলৌকিক বিশ্বাস, অস্পৃশ্যতা এবং বাহ্য আচার অনুষ্ঠানের আতিশয্য। যুক্তি বিচারের চেয়ে অনর্থ আচার হয়ে উঠেছে প্রবল। তাই এ সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, "হিন্দুর ধর্ম এখন বেদ তন্ত্র পুরাণ কোথাও নেই—হিন্দুর ধর্ম এখন ঢুকেছে ভাতের হাঁড়িতে।..."শাস্ত্রোক্ত দশবিধ সংস্কার কোথায় চলছে? আমি তো ভারতবর্ষটা সব ঘুরে দেখেছি, সর্ব্বত্রই শ্রুতিস্মৃতিবিগর্হিত দেশাচারে সমাজ শাসিত হচ্ছে। লোকাচার দেশাচার ও স্ত্রী-আচার, এ-ই এখন সর্ব্বত্র স্মৃতিশাস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। কে কার কথা শুনছে? টাকা দিতে পারলেই ভট্টচার্য্যের দল যা তা বিধিনিষেধ লিখে দিতে রাজী আছেন।...শাস্ত্র ফাস্ত্র কি কেউ প'ড়ে—না, প'ড়ে সেইমত সমাজকে চালাতে চায়?"

স্বামিজী দেখেছিলেন এদেশের লোকের বাহিরে ধর্মভাব থাকলেও ভেতরে ধর্মভাবের নামে শুধু আলস্য, মানসিক জড়তা, ভাবপ্রবণতা ও তমোগুণের আধিক্য বর্ত্তমান।" সেজন্ত তিনি বার বার বলেছিলেন, "আমি দুনিয়া ঘুরে দেখলুম্—এদেশের মতন অধিক তামসিক প্রকৃতির লোক পৃথিবীর আর কোথাও নেই। বাহিরে সাত্ত্বিকতার ভাণ, ভিতরে একেবারে ইট্‌পাটকেলের মতো জড়ত্ব—এদের দ্বারা জগতের কী কাজ হবে? আমি তাই এদের ভিতর রজোগুণ বাড়িয়ে কর্মতৎপরতা দ্বারা এদেশের লোকগুলোকে আগে ঐহিক

জীবনসংগ্রামে সমর্থ করতে চাই। শরীরে বল নাই, উৎসাহ নাই—মস্তিষ্কে প্রতিভা নাই! কি হবে রে এই জড়পিণ্ডগুলো দ্বারা ?···আগে ভিতরের শক্তি জাগ্রত ক'রে দেশের লোককে নিজের পায়ের ওপর দাঁড় করা. উত্তম অশন বসন—উত্তম ভোগ—আগে করতে শিখুক—তারপর সর্বপ্রকার ভোগের বন্ধন থেকে কি ক'রে মুক্ত হতে পারবে, তা বলে দে।···দেশের লোককে আগে অন্ন সংস্থান করবার উপায় শিখিয়ে দে, তারপর ভাগবত পড়ে শোনাস্। কর্মতৎপরতার দ্বারা ঐহিক অভাব দূর না হলে ধর্মকথায় কেউ কাণ দেবে না।"

অনেকের মনে এই এক ভ্রান্ত ধারণা আছে যে যেহেতু স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের বিজয়ী প্রচারক—অতএব পাশ্চাত্য সভ্যতাকে ভারতে প্রচলন করা তাঁর জীবনের অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু স্বামিজীর গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে স্বামিজী পাশ্চাত্য সভ্যতার যে দিকটা আসুরিকভাবপূর্ণ, পরস্বশোষক অথবা স্বার্থান্ধ ও ইন্দ্রিয়পরতাপূর্ণ সেই দিকটার তীব্র ও প্রবল প্রতিবাদ করলেও পাশ্চাত্য সভ্যতার যে দিকটা শিক্ষণীয় গ্রহণীয় সুন্দর শাশ্বত ও মহান সেই দিকটার শুধু তিনি পক্ষপাতীই ছিলেন না, বরং তা গ্রহণ করবার জন্য দেশবাসীকে প্রবলভাবেই অনুরোধ করে বলেছেন, "শুধু সেকেলে পাজিপুঁথির দোহাই দিলে এখন আর চলবে না। পাশ্চাত্য সভ্যতার উদ্বেল প্রবাহ এখন ভারতের উপর বন্যার মতন বয়ে যাচ্ছে। এখন এই সম্বন্ধে কার্য্যকরী জ্ঞান অর্জন না করলে শুধু ধ্যান ধারণায় বিশেষ কিছু ফল হবে না।" "আমরা বৃথাই পাশ্চাত্যের ঐহিক সভ্যতার (material civilization) সম্বন্ধে অনর্থক নির্বোধের মতন মন্তব্য করে থাকি। এ ঠিক যেন শিয়ালের আঙুর ফল না পাওয়ার জন্য আঙুরকে টক বলার মতন। ধরেই নেওয়া যাক ধর্ম নিয়েই ভারতবাসী থাকলো এবং তার দ্বারা বড় জোড় এক লক্ষ লোক ধর্মলাভ করলে। কিন্তু এই এক লক্ষ লোকের ধর্মলাভ করবার জন্যে দেশের ত্রিশ কোটী লোককে অজ্ঞানতা ও অনাহারের গর্ত্তে ডুবতে হবে? কিসের জন্যে লোকে অভুক্ত হয়ে থাকবে? তোমরা কি জানো কিসের জন্যে মুসলমানদের কাছে হিন্দুদের পরাজয় হয়েছিল? তার কারণ জড়বাদমূলক সভ্যতা সম্বন্ধে হিন্দুদের অজ্ঞতা। Material civilization, nay, even luxury is necessary to create works for the poor!"

স্বামিজী ছিলেন একজন প্রকৃত সংস্কারক। রক্ষণশীলতা বা 'প্রাচীন আদর্শ' নিষ্ঠার নামে অমানুষিক ও যুক্তিহীন সামাজিক প্রথা ও কুসংস্কারের অচলায়তনে নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে থাকা সম্পূর্ণ তাঁর প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল। তিনি জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, অবরোধ-প্রথা ধনতান্ত্রিকতা প্রভৃতি কুপ্রথাকে ভয়ানক ঘৃণা করতেন। সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে লিখেছিলেন, "Can you not make a European society with India's religion? I think it is possible and it must be. পুরোহিত-প্রথাকে তোমাদের ধর্ম থেকে উপড়ে ফেলে দাও—আর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ধর্মের অধিকারী হও।" সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে

বলেছিলেন, "Reforms we should have in many ways, and who will be there such fool as to deny it ?"

যুগস্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দের এই বিরাট বিপুল কর্মসাধনা, এই জ্বলন্ত সর্বত্যাগ ব্রত—উদ্দীপ্ত স্বদেশপ্রেম আত্মহারা জনসেবার ভাব ভারতবর্ষ বিশেষতঃ বাঙলার যুবকদের মনকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপিত করেছে। স্বামিজীর জীবন ও বজ্রবাণী শুধু বাঙলা অথবা ভারতের যুবকবৃন্দের প্রাণে মুক্তি ও মহত্বলাভের অগ্নিপ্রেরণাই জাগায়নি—পরন্তু স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের যুবকদের কাছে নবজাগ্রত জাতির বিশ্ববিজয়ী যৌবন মূর্তিরূপে অভিনন্দিত। "বাঙলা দেশের যুবকদের মধ্যে যে সব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে, আঙুলকে নয়—" বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য। স্বর্গীয় স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দেশের যুবকদের উপর স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব সম্বন্ধে বলেছিলেন, "His (Swami Vivekananda's) glowing self-sacrifice should inspire the youngmen of our country." ধর্মভূমি ভারতবর্ষে যুগে যুগে বহু বার বহু উচ্চ আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন মহাযোগী সিদ্ধপুরুষ আবির্ভূত হয়েছেন এবং এখনও হচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা আজ একেবারে বিস্মৃত। জাতির ইতিহাসে জাতির চিত্তে ভগবান বুদ্ধ, সমর্থ রামদাস স্বামী, গুরুগোবিন্দ সিংহ অথবা স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতিই শুধু চিরস্মরণীয় স্থান অধিকার ক'রে আছেন। তার কারণ স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ মহাপ্রাণ মহামানবেরা নিজেদের দেহ মন প্রাণ সামর্থ্য শক্তি প্রতিভা দুর্গতিগ্রস্ত কোটী কোটী দেশবাসীর উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। নিজেদের ব্যক্তিগত সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আরাম আয়াস সবই তাঁরা বলি দিয়েছিলেন দেশবাসীর জন্য—সমগ্র দেশের জন্য। এই কারণেই যতদিন ভারতবাসীর অস্তিত্ব থাকবে ততদিন ভারতবাসী কিছুতেই ভুলতে পারবে না স্বামী বিবেকানন্দকে। কারণ ভারতের যুবকবৃন্দ—ভারতের কোটী কোটী নরনারী জানে তাদের কঠোর জীবন সংগ্রামে—দুঃখে বিষাদে দৈন্যে সমস্ত সংকট থেকে উদ্ধার করবার শক্তি দেবে বিবেকানন্দের অগ্নিজীবন, আর তাঁর প্রচণ্ড বজ্রবাণী। আর এই জন্যই ভারতীয় যুবকবৃন্দের কাছে বিবেকানন্দ একমাত্র যুগনায়ক ও জীবন্ত আদর্শ হয়ে থাকবেন।

